এই জীবনের সত্য

এই জীবনের সত্য

সমকাল প্রকাশনী

৮।২এ গোয়ালটুলি লেন
কলকাতা-৭০০০১৩

ফেরা

ট্রেনের জানলার ফ্রেম জুড়ে সমুদ্রের ছবি। দিগন্তের ক্যানভাসে জল চলমান পটভূমি। সেখানে ঢেউয়ের শব্দ। নির্মেঘ আকাশ, রোদ, জল হাওয়ার মাতামাতি। ডানার ঝাপট। বাতাসে অসংখ্য জলকণা।

ট্রেন অ্যাটলন্টিকের পাড় ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলেছে। প্লিমাথের আগে পর্যন্ত সমুদ্র তবু দূরে ছিল। এখন তীর আরও কাছাকাছি। যেন কর্নওয়ালের শেষ স্টেশন মহাসমুদ্রে মিশে যাবে।

কাচের এপারে ট্রেন চলার মৃদু যান্ত্রিক শব্দ। কিউবিক্‌ল থেকে করিডোর পর্যন্ত কফি, কোলন, পারফিউমের সুগন্ধ ছড়িয়ে আছে। অনেকক্ষণ যাত্রীদের কথার আওয়াজ নেই। হয়ত সমুদ্র দেখছে। বই পড়ছে। সুজাতা ঘড়ি দেখল। এখনও প্রায় দু'ঘন্টা। ট্রুরো পৌঁছতে সাড়ে বারোটা বাজবে। প্যাডিংটন স্টেশন থেকে ট্রেনে আসতে এতক্ষণ লাগবে জেনেও প্ল্যান বদলানো গেল না।

রূপেনদা ফোনে বলেছিল—'লন্ডন থেকে অনেকটা দূরে থাকি। জাস্ট একদিনের জন্যে আসছ কেন শিনটু? কয়েকদিন থাকা যায় না?'

তখন সুজাতা ভেবেছিল একদিন বোধহয় খুব কম সময় নয়। রূপেনদার বউ ওদের চেনেই না। অর্ণব আর সোমাকেও রূপেনদা এই প্রথম দেখবে। এত কম পরিচয়ে কয়েকদিন থাকা যায় না। অর্ণব তো কোথাও থাকতে চায় না। তবু এখন মনে হচ্ছে, আসা যাওয়া নিয়ে অন্তত আর একটা দিন হাতে পেলে ভাল হত। পরশু বস্টনের ফ্লাইট। কালকের মধ্যে লন্ডনে ফিরতে হবে। ইচ্ছে করলেও একরাতের বেশি ট্রুরোয় থাকার উপায় নেই।

বই থেকে চোখ তুলে অর্ণব সমুদ্র দেখছিল। সুজাতাকে আর একবার ঘড়ি দেখতে দেখে বলল—'দিনটা ট্রেনেই কেটে গেল। ডিসটেন্স কিছু কম নয়।'

সোমা জানলার দিক থেকে ঘাড় ফিরিয়ে হাসল।

—'মাকে কে যেন বলেছিল লন্ডন থেকে বেশি দূরে নয়?'

—'মার বিউটি পিসি।'

—'আর তোমার দাদুর বন্ধু? কেনেডি এয়ারপোর্টে রিসিভ করতে লেখেননি?'

সোমার সব মনে থাকে। সুজাতা বলল—'নিউ ইয়র্ক থেকে কনকর্ড কতদূরে বুঝতে পারেনি। আমরাই কি জানতাম কর্ণওয়াল কতটা সাউথে?'

পকেট থেকে চিরুণি বার করে অর্ণব বলল—'সাউথ ওয়েস্ট ইংল্যান্ডের এদিকটা এত সুন্দর! আগে থেকে প্ল্যান করলে একটু ঘুরে দেখা যেত।'

সোমা এইরকম। পথে বেরিয়ে সারাক্ষণ নিয়মের বাঁধাবাঁধি ওর ভাল লাগে না। ছুটিতে বেড়াতে গিয়ে কেবল বিখ্যাত জায়গাগুলো ঘড়ি ধরে ধরে দেখা, আর রাত বেশি হবার আগেই হোটেলে ফিরে শুয়ে পড়া—সুজাতার এই রুটিন ও ছোটবেলা থেকে অনেক মেনেছে। তিনদিনে প্যারিস, দুদিনে রোম, একদিনে আমস্টারডাম দেখেছে। সকাল থেকে শুধু তাড়াহুড়ো। একবার এলিভেটরের সামনে লম্বা লাইন দিয়ে ইফেল টাওয়ারে ওঠা। নেমেই মিউজিয়ামে দৌড়নো। সুজাতা দেখাতে দেখাতে যাচ্ছে 'ম্যাডোনা, ভাল করে দ্যাখো সুমি।' একটু দূরে গিয়েই—'মোনালিসা, দা-ভিঞ্চির পেইন্টিং।'

ছবি দেখে দেখে সোমার পা ব্যথা। পরদিন ল্যাটিন কোয়ার্টারের ব্যাকগ্রাউন্ড। অর্ণব ছবি তুলছে। সোমা দু হাত কোমরে রেখে হেসে 'চী...ই...ই...স' বলছে। সামনের দুটো দাঁত ফাঁকা। বুকে 'সরবন' লেখা লাল টুকটুকে সোয়েট শার্ট। এত বছর পরেও অ্যালব্যাম খুলে 'ইউরোপ সেভেনটি এইট' দেখে সোমা ভীষণ মজা পায়।

সেইসব ঘোড় দৌড়ের দিন আর নেই। ছুটি কিংবা বাজেট নিয়ে আজকাল আর ওঁরা তেমন ভাবে না। এবার সামারে দু সপ্তাহ স্ক্যান্ডিনেভিয়ায় থেকেছে। এক সপ্তাহে জুরিখ আর জেনিভায়। ফেরার পথে তিনদিন লন্ডনে না কাটিয়ে রূপেনদার কাছে যাওয়াই ঠিক হল।

প্রায় কুড়ি বছর দেখা হয় না। তবু কোথাও কখনও পাটনার লোক দেখলে নীলুদা, রূপেনদার কথা মনে পড়ে। একথা সে কথার পরে সুজাতা জিজ্ঞেস করে—'পাটনায় ব্রজমাধব লাহিড়ীকে চিনতেন? আমার জ্যাঠামশাই।'

—'মাধব লাহিড়ী আপনার জ্যাঠামশাই? আপনি পাটনার মেয়ে?'

—'আমরা কলকাতার। মাধব জ্যাঠামশাই বাবার পিসতুতো দাদা।'

—'তার মানে নীলুদা, রূপেন ওরা...'

—'জ্যাঠতুত দাদা। আমরা খুব ক্লোসড ছিলাম। নীলুদারা তো কলকাতাতেই পড়ত।'

বি ই কলেজের সিনিয়র যারা, তারা অনেকেই নীলুদাকে চিনতে পারে। সেন্ট জেভিয়ার্স কিংবা মেডিকেল কলেজ হলে রূপেনদাকে। নীলুদা মিলন সমিতিতে খেলত। রূপেনদা হকি আর ক্রিকেটে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ব্লু ছিল। ওই সময় খেলার সঙ্গে ওদের দু'ভাইকে বহু ছাত্ররা চিনত। অর্ণবও ওদের ম্যাচ দেখেছে।

রূপেনদা যে বছর এফ আর সি এস পড়তে চলে এল, সুজাতা সে বছর কলেজে ভর্তি হয়েছে। তিন বছর পরে মাধব জ্যাঠামশাই এর স্ট্রোকের খবর পেয়ে রূপেনদা দেশে পাটনা থেকে কলকাতায় ফিরে ফ্লাইটের আগের দিনটা সুজাতাদের বাড়িতে ছিল।

ওই অল্প সময়েই সুজাতার ধারণা হয়েছিল, রূপেনদা যেন আগের তুলনায় চুপচাপ হয়ে গেছে। ওদের সঙ্গে ব্যবহারও অন্যরকম। তুমি তুমি করে কথা বলছিল। বড়দের সঙ্গে সময় কাটাতেই বেশি ব্যস্ত। হয়ত জ্যাঠামশাইয়ের জন্যে চিন্তা করছিল। এও হতে পারে , দীর্ঘদিন দেখা না হলে মানুষে মানুষে এরকম দূরত্ব সৃষ্টি হয়। নিজের ভাইবোন তো নয়, দূরে গেলেও টান থাকবে!

অথচ সুজাতার স্মৃতিতে তখনও নীলুদা, রূপেনদা মানেই খেলার মাঠ থেকে শিল্ড জিতে ফেরা। ব্লেজার্স, কেডস, কিড ব্যাগ ফেলে রেখে শীতের সন্ধেবেলায় ঠান্ডা জলে হুড়মুড়িয়ে চান। নীলুদা, রূপেনদা মানে রবিবারে দারুণ আড্ডা। হেমন্ত, মান্না দে, প্যাট বুন, ন্যাট কিং কোল, ডিন মার্টিনের গান। নীলুদা থাকলে বাড়ি শুদ্ধু বাটানগরে পিকনিক। বিশ্বকর্মা

পুজোয় ছাতে উঠে ঘুড়ির লড়াই। পুজোর আগে পাটনা থেকে মাধব জ্যাঠামশাই আসতেন। দশমীর রাতে ভাসানের পর ঘট মাথায় নিয়ে পুজোর দালানে ফিরত নীলুদা। কালীপুজোর সময় রূপেনদা এলে বাগানে তিনতলা সমান ইলেকট্রিক তুবড়ি জ্বলত। ভাইফোঁটার বিকেলে সবাই মিলে সিনেমায় যাওয়া।

সেইসব দিনের জন্য রূপেনদা আর কখনও ফিরবে না। সুজাতা যেন বুঝতে পারছিল জীবনের উচ্ছ্বসিত প্রথম অধ্যায় শেষ হয়ে আসছে। সে নিজেও আর হারানো সময়ের গণ্ডির মধ্যে বাঁধা পড়ে নেই। পৃথিবীর অদৃশ্য জানলা, কপাটগুলো একে একে খুলে যাচ্ছে। বৃহত্তর সেই পটভূমিতে অপেক্ষমান বিস্ময়ের মতো কত ঘটনা, কত অভিঘাত। সেখানে নিঃশর্ত বন্ধুত্ব হয়, নির্বিচার প্রেম। অর্ণব অপেক্ষা করে। সুজাতার দিনরাত্রি আবর্তিত হয়ে চলেছে বড় হওয়ার ঘোরের মধ্যে দিয়ে। বন্ধুবান্ধব, ইউনিভার্সিটি, কফি হাউস—বাড়িতে থাকার সময়ই নেই।

বাইরের ব্যস্ত জীবনের আর্কষণ সত্ত্বেও বাড়িতে রূপেনদা আসবে ভেবে সুজাতা খুশী হয়েছিল। অথচ যখন দেখা হলো, রূপেনদার যেন বলার মতো বিশেষ কথাই নেই। এ ঘরে, ও ঘরে ঘুরছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেওয়ালের পুরনো ছবিগুলো দেখছে।

বিকেলে চায়ের টেবিল সুজাতার মা, সেজকাকিমা সবাই ছিলেন। ভবানীপুর থেকে পিসিমা এসেছেন। পাটনা থেকে বিউটি পিসি। সুজাতার মুখোমুখি রূপেনদা। এপাশে মেজকাকীমার মেয়ে রিন্টু, মিতুল, পিসির ছেলে বাবু। বড়দের গল্পের মাঝখানে রূপেনদা জিজ্ঞেস করল—"শীন্টু এত চুপচাপ! চ্যাটারবক্স এর মুখে কথা নেই? কী ব্যাপার?"

'আমাদের তো তোমাকেই বেশি সিরিয়াস মনে হচ্ছে। এসে থেকে পাত্তাই দিচ্ছ না।'

রূপেনদা হাসল—পাত্তা দিচ্ছি না মানে!

বাবু সিঙ্গাড়ার প্লেট টেনে নিয়ে বলল— 'পাত্তা না দেবার ডেফিনিশনগুলো জেনে নাও। এবার তুই, টুই বলোনি বলে শীন্টুদি আফসেট। কার কি অ্যাফেয়ার, ট্যাফেয়ার চলছে জানতে চাওনি বলে রিন্টু ভীষণ ইনসালটেড।'

টিপট থেকে চা ঢালতে ঢালতে মা বললেন— 'তুই থামবি? সিঙ্গাড়াগুলো দে না ওকে। ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে।'

রিন্টু ভুরু কুঁচকে বলল—'আর রূপেনদা ওল্ডস্পাইস এনে দেয়নি বলে তুই তো সবচেয়ে বেশি আপসেট।'

বাবু তখনও হাসাচ্ছে—'যাঃ! আ মোস্ট ডিসাপয়েন্টড হচ্ছে মিতুল। ভীষণ খেপেছে। ওর নামটাই ভুলে মেরে দিলে রূপেনদা? মিতুল পনি টেল্ নেড়ে উঠল—'অ্যাই! একদম মনে করাবি না। না গো রূপেনদা, তুমিটাই আমার বেটার। ঘন্টি আর যশোদার মা ছাড়া এ বাড়িতে আমাকে একটুও রেসপেক্ট দেয়? সামনে খালি যাসনি, খাসনি, অসহ্য!

—'তাহলে গন্ধেশ্বরীকে আমার আপনি বলা উচিত।' সবাই হেসে উঠল। মিতুলের নাম আসলে নীলুদা দিয়েছিল। সে দু-চার বার ওদের কোলে হিসিটিসি করে ফেলায় ওই বদনাম।

সেদিন চায়ের টেবিলে রূপেনদা কথা খুব বেশি বলেনি। ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ডের ছবি-টবিও দেখায়নি। পিসিরা গল্প জুড়েছিলেন। সুজাতার মা একবার জিজ্ঞেস করেছিলেন—'এর পরে আবার কবে? একেবারে বিয়ে করতে?'

প্রশ্নটা রূপেনদা এড়িয়ে গিয়ে ম্যাগাজিনে চোখ রেখে উত্তর দিলো 'দেখি কবে আসা হয়?'

বিকেলের রোদ পড়ে আসছিল। মা গা ধুতে গেলেন। মেজ কাকিমা এল। সুজাতা ভাবছিল মেজকাকিমার কথা শেষ হলে অর্ণবকে ফোন করবে। সন্ধেয় বেরনোর কথা। চায়ের পর্ব শেষ হতে দেরি হয়ে গেল। এরপর বেরতে চাইলে মা বারণ করবেন। রূপেনদা এতদিন পরে এসেছে। সুজাতা বাড়িতে না থাকলে বাবা, মেজকাকা বিরক্ত হবেন। অর্ণবকে ফোন করা ছাড়া উপায় নেই।

রূপেনদা কখন পশ্চিমের বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল। আকাশে সূর্যাস্তের রং ছড়িয়ে যাচ্ছে। মেঘের ফাঁকে আলোর ভাঙা ভাঙা রেখা। লাল তুলিতে মোটা আঁচড়ে দিগন্তের বিমূর্ত ছবি।

বিকেলের শেষ রং মুছে যাওয়ার কোথায় ট্রেনের বাঁশি শোনা গেল। মাথার ওপর টিয়ার ঝাঁক উড়ে যাচ্ছিল। বিষণ্ণ সন্ধ্যার ম্লান আলোয় দাঁড়িয়ে রূপেনদা প্রশ্ন করল—'আমার মাকে তোরা এখনও ভয় পাস শিণ্টু?'

—'তখন ছোট ছিলাম। বুঝতাম না। এখন তো জানি।'

—মা আমাকে চিনতে পারলেন। চলে আসার সময় জানলার ধারে বসেছিলেন। চোখে জল দেখলাম।'

—'এখন তো শুনি অনেক ভাল আছেন। জ্যাঠামশাইয়ের অসুখের পরে ওঁর কাছে এসে বসেন। নীলুদা বলছিল।'

—'কোনওদিন ঠিকমতো ট্রিটমেন্ট হয়নি। ওপর ওপর ওষুধ খান। মোস্টলি ট্র্যাংকুইলাইজার। আর মাদুলি! যা হয় এদেশে।'

সুজাতা বুঝতে পারছিল রূপেনদা ক্রমশ সেন্টিমেন্টাল হয়ে পড়েছে। হয়ত ভাবছে অল্পদিনের জন্যে জ্যাঠামশাইকে শুধু চোখের দেখা দেখে গেল। নিজে ডাক্তার, তবু বাবা, মার জন্যে কিছু করতে পারছে না। আবার কবে আসবে, কার সাথে দেখা হবে, কার সাথে হবে না—চলে যাবার আগের দিন এইসবই মনে হচ্ছে ওর। কোনও সূক্ষ্ম অপরাধবোধ, অকর্তব্যের যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছে রূপেনদা। সুজাতা কথা খুঁজে পেল না।

রিন্টু ডাকতে এসেছিল। বাবা, মেজকাকা কোর্ট থেকে ফিরেছেন। রূপেনদা আর রিন্টু নীচে চলে গেল। সুজাতা অর্ণবকে ফোন করতে গিয়ে ভাবছিল ওকে একবার চলে আসতে বলবে কিনা। রূপেনদার খেলার মাঠের ফ্যান ছিল অর্ণব। এবার দেখা হয়ে যেত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর বাড়িতে আসতে বলল না। রূপেনদা যখন সুজাতার পড়াশোনার খবর ছাড়া আর কিছু জানতেই চায়নি, তখন নিজে থেকেই বলার তো দরকার নেই। এই একটা ব্যাপারে রূপেনদাকে ও ঠিক বুঝতে পারে না। এত ইনডিফারেন্স লক্ষ্য করছে এবার। রিন্টুও বারণ করেছে।

পরদিন সন্ধ্যের ফ্লাইটে যাওয়া। রূপেনদা গোছগাছ করছিল। রিন্টু, সুজাতা দু'জনেই ওর ঘরে। শার্ট ভাঁজ করে দিতে দিতে সুজাতা হঠাৎ বলল—'পূর্বাদির সঙ্গে দেখা করলে না?' রূপেনদা ঘুরে তাকাল। উত্তর দিল না।

রিন্টু জিজ্ঞেস করল—'পূর্বাদিকে চিঠি দাও না কেন রূপেনদা? ফোন করো না। এতদিন পরে এলে তাও দেখা করলে না?'

—'তোমাদের সঙ্গে পূর্বার দেখা হয়?'

সুজাতা উত্তর দিল—'মাঝে মাঝে। ইন্দ্রানীদের বাড়িতে।'

—'ও কিছু বলেনি?'

—'না। পূর্বাদি কোনও কথা তোলে না। ইন্দ্রানীর কাছে শুনেছি। মাসীমাও বলেছেন তুমি আর পূর্বাদির সঙ্গে কোনও কনট্যাক্ট রাখ না।'

রূপেনদা যেন একটু বিরক্ত হল—'কী শুনতে চাইছো? ইউ নিড সাম এক্সপ্ল্যানেশন?'

আহত গলায় রিন্টু বলল—'এক্সপ্ল্যানেশন চাইব কেন রূপেনদা? এটা তোমাদের পার্সোনাল অ্যাফেয়ার। কিন্তু আমরাই এখন ফলস পজিশনে পড়ে গেছি। মাসীমাকে, ইন্দ্রানীদিদের কী বলব বুঝতে পারি না।'

রূপেনদা ওদের দুই বোনকে লক্ষ করছিল। হয়ত ভাবছিল তিনবছরে ওরা বেশ মতামত দিতে শিখেছে। ব্যক্তিগত প্রশ্ন করতেও দ্বিধা করছে না। শান্তভাবে উত্তর দিল—'পূর্বা জানে। চিঠিতে লিখেছিলাম। দূরে থেকে ওকে আর আনসার্টেনিটির মধ্যে রাখতে চাই না। এভাবে রিলেশনশিপ রাখা যায় না।'

সুজাতা ক্ষুব্ধভাবে বলল—'পূর্বাদি খুব হার্ট হয়েছে রূপেনদা। তোমার আনসার্টেনিটির ব্যাপারটাই বুঝতে পারছে না। একবার দেখা করে গেলে পারতে।

রূপেনদা স্যুটকেসের ডালা বন্ধ করল। টেবিল থেকে চাবির রিং তুলে নিয়ে সুজাতার কাছে এসে বলল—'দ্যাট ওন্ট মেক এনি ডিফারেন্স।'

সেদিন রূপেনদাকে খুব নিষ্ঠুর মনে হয়েছিল। যেন বড় বেশি প্র্যাকটিক্যাল। অনিশ্চয়তার দোহাই দিয়ে এতদিনের ভালবাসার সম্পর্ক ভেঙে দিয়ে যাচ্ছে।

রাতের ফ্লাইটে রূপেনদা লন্ডন চলে গেল। তারপর আর দেখা হয়নি।

আজ বহু বছর পরে কর্নওয়ালের ট্রেনে বসে, সারাটা পথ পুরনো দিনের কথা ভাবতে ভাবতে চলে এল সুজাতা। ট্রেন আবার ট্রুরোয় পৌঁছোচ্ছে। সমুদ্র খানিক দূরে সরে গেছে। জানলা দিয়ে মেঘলা আকাশ, বৃষ্টি ভেজা মাঠ চোখে পড়ল। স্টেশনের অনেকটা, বৃষ্টি ভেজা মাঠ চোখে পড়ল। স্টেশনের অনেক নীচে পাথরের আড়ালে আড়ালে ঢেউ ভাঙছে। সমুদ্র এই সীমান্তের শহরকে বেড় দিয়ে রেখেছে।

স্টেশনে ভালই ভিড়। সুজাতাদের আগে পরে কিছু ট্যুরিস্ট নামল। প্ল্যাটফর্মের ওধার থেকে রূপেনদা আসছে। অচেনা শহরে একমাত্র চেনা মানুষ। চেহারা বিশেষ বদলায়নি। সেই অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ধাঁচের সাহেব সাহেব চেহারা। সামান্য মোটা হয়েছে। সঙ্গে একটি কমবয়েসি ছেলে।

রূপেনদা এসে জড়িয়ে ধরল—'একদম ইরা কাকিমার মতো দেখতে হয়ে গেছিস। অর্ণবের হাত ঝাঁকিয়ে হেসে বলল—'আই শুড বি রিয়েলি থ্যাঙ্কফুল টু ইউ! আমার জন্যে এত দূরে এলে অর্ণব!!'

ছেলেটা স্যুটকেস নেবার আগে হ্যান্ড শেক করল—'হ্যালো, আ য়্যাম রায়ান্'। রূপেনদা বলল 'আওয়ার এল্ডেস্ট ওয়ান।'

স্টেশন থেকে বেরিয়ে ওরা গাড়িতে উঠল। পথ বেশিক্ষণের নয়। ঢালু রাস্তার শেষে ট্রুরোর বাড়িঘর চোখে পড়ল। দূরে সমুদ্রের নীল রেখা। রূপেনদা সোমার সঙ্গে কথা বলছিল। সোমার ল্যান্ডস এন্ড দেখতে যাওয়ার ইচ্ছা, সময় হবে কিনা জানতে চাওয়ার রায়ান বলল—'দ্যাট্স নট টু ফার। উই ক্যান মেক ইট বিফোর ডিনার।'

চার্চ, স্কুল, ক্রিকেট ফিল্ড পার হয়ে বড় বড় কম্পাউন্ড ঘেরা বাড়ি। রূপেনদার গাড়ি যে গেটে ঢুকল, সে বাড়ির নাম 'ডিউনস'। ড্রাইভওয়েের দুধারে অভ্যর্থনার ভঙ্গিতে দাঁড়ানো

সারি সারি ঝাউগাছ। আইভির গাঢ় সবুজ লতা দোতলার জানলা ছুঁয়েছে। নীচে কাচ ঘেরা বারান্দায় কয়েকজন মানুষ।

বেলা দুটো নাগাদ ওরা লাঞ্চে বসল। রূপেনদার বউ মরীন স্কুল টিচার। গরমের ছুটি বলে বাড়িতে আছে। বলছিল সুজাতারা কয়েকদিন থাকলে কাছাকাছি অনেক কিছু দেখাতে পারত। কর্নিশ কালচার বলতে এখনও যা আছে, সে এখানেই। মরীন সোমাকে সামনের কোনও ছুটিতে আবার কর্নওয়ালে চলে আসতে বলল।

লাঞ্চের পরে কিচেনের টুকিটাকি কাজ সেরে মরীন ওদের কাছে ফ্যামিলি রুমে এসে বসল। রূপেনদা কলকাতার বাড়ির খবর নিচ্ছিল। কাকে কতবছর দেখেনি, এইসব কথা। এক সময় সুজাতা আলোচনার মোড় ফেরাতে চেষ্টা করল। ওর ইচ্ছে মরীনের সঙ্গেই ভাল করে আলাপ করে। শুধু দু'যুগের পুরনো কথা বলে নতুন মানুষকে গল্পের বাইরে রাখতে চায় না। যে জীবন মরীন দেখেনি, যে বাড়িকে ঘিরে তার ছেলেমেয়ের কোনও অনুষঙ্গ গড়ে ওঠেনি, যে পরিবারের সঙ্গে তাদের কখনও পরিচয়ই হয়নি, শুধু সেই গল্পের জের টেনে যাওয়ার মধ্যে অনিচ্ছাকৃত এক ধরনের উপেক্ষা থাকে। সুজাতা মরীনের কাছে ওদের কথা শুনতে চাইছিল। অর্ণব তখন রূপেনদার সঙ্গে নিউরোসার্জারি নিয়ে আলোচনা করছে। রূপেনদার নিজের ফিল্ড।

মরীনের বাড়ি আয়ারল্যান্ড। দাদা চার্চের প্রিস্ট। ওরা ক্যাথলিক। মরীন ছেলেদের নাম রেখেছে—রায়ান, প্যাট্রিক, শন। মেয়ে ছোট। নাম জেনে। রূপেনদা বলেছে—রঞ্জন, প্রতীক, সঞ্জয়। মেয়ের নাম জেন উমা লাহিড়ী। প্রত্যেকের দু সেট নাম। মরীন ছেলেমেয়ে নিয়ে রবিবারে ট্রুরোর ক্যাথলিক চার্চে যায়। ওদের নিয়েই চার্চের ভলানটারি কাজ কর্ম করে। ঘরের দেয়ালে রায়নের ব্যাপটিজম-এর ছবি।

রূপেনদার ইচ্ছে পাটনায় নিয়ে গিয়ে প্যাট্রিক আর শনের পৈতে দেবে। মরীন এ কথার কোনও উত্তর দিল না। ওর শান্ত, সংযত ব্যবহারের তুলনায় রূপেনদাকে একটু অধৈর্য, আবেগপ্রবণ মনে হয়। সুজাতা জানে না ওদের এই সহাবস্থানের আড়ালে কোথাও এক সূক্ষ্ম টানাপোড়েন শুরু হয়েছে কিনা। ইন্টাররিলিজিয়াস ফ্যামিলি বলেও নয়, এই সংঘাত এদেশে, ওদেশে বহু সংসারেই ঘটছে। উপলক্ষ কোথাও ধর্ম, কোথাও কালচার, কোথাও অন্যকিছু। বয়সের এক আশ্চর্য ক্ষমতা! প্রথম জীবনে সে মানুষকে যুদ্ধ করতে বলে। স্বধর্ম রক্ষার নামে সে যুদ্ধ কখনও সমাজের বিরুদ্ধে, কখনও স্বজনের বিরুদ্ধে। পারিপার্শ্বিকের অসহযোগিতায় ক্লান্ত, ক্ষুব্ধ, মানুষের প্রতিবাদ। যার নাম গৃহযুদ্ধ।

সুজাতার অনুমান রূপেনদার জীবনে সে বিরোধ নেই। মরীনকে এই প্রথম দেখলেও ওর সম্পর্কে পাটনার আত্মীয়স্বজনদের কাছে অনেক প্রশংসা শুনেছে। মাধব জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে কলকাতায় দেখা হতে বলেছিলেন— 'রিলিজিয়াস আপব্রিংগিং ছাড়া এমন শিক্ষা হয় না।' ওঁকে অসুস্থ অবস্থায় ট্রুরোয় নিয়ে এসেছিল রূপেনদা। মরীন দেড়বছর খুব সেবা, যত্ন করেছিল। মাধব জ্যাঠামশাই অভিভূত। সারা জীবন উন্মাদ স্ত্রী নিয়ে বাস করেছেন। একা হাতে ছেলে-মেয়ে মানুষ করেছেন। সেবা, যত্ন পাওয়ার ভাগ্যই ছিল না। মরীন কিছু ফিরিয়ে দিয়েছিল।

নীলুদার বউ ঝর্ণাবউদি বলেছে—'মরীনের জন্যে আমাদের অত ভাল করে ইংল্যান্ড ঘোরা হল। খরচপত্র নিয়ে পর্যন্ত ভাবতে দিল না।'

মরীনের জন্যে রূপেনদা পূর্বাদিকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। মরীনের জন্যেই এই সযত্নের সংসার। ছেলে, মেয়ের ব্যবহারে ঔদ্ধত্য নেই, অসৌজন্য নেই। পড়াশোনা, ক্রিকেট, পিয়ানো, চার্চ, সমাজসেবা— ওরা সবকিছুর মধ্যেই আছে। বাবা, মা আর কী আশা করে? প্রফেশনের দিক থেকে নিউরোসার্জন হিসেবে রূপেনদার যথেষ্ট মান সম্মান। ঘরে, বাইরে এমন প্রভাব, প্রতিপত্তি নিয়ে, জীবনের এতগুলো প্লাস পয়েন্ট শুদ্ধু রূপেনদা অসুখী হবে কেন? তার তো ভাল থাকারই কথা। একান্ত অনুগত ছেলে মেয়ে, বউ নিয়ে পাটনায় গিয়েও একই ধারণা দিয়ে এসেছিল রূপেনদা।

পরে বিউটি পিসি সুজাতাকে বলেছিল—'বাচ্চারাই দেখলাম বেশি অ্যাডজাস্ট করে। ওদের জন্যে রূপেন কিছুতেই আলাদা ব্যবস্থা করতে বলবে না। যা রান্না হচ্ছে, তাই খাচ্ছে। পাটনার বাড়ির খাওয়া তো তেমনি! মাংস, মুরগীর বালাই নেই। বাবাজীর হাতের ওই অখাদ্য রান্না। তাই খাচ্ছে ছেলেগুলো। যেখানে সেখানে ঘুমিয়ে পড়ছে। সন্ধে থেকে পাড়ায় মাইকের হল্লা আর মশার রাজত্ব।'

সুজাতা বলেছিল— 'দুদিনের জন্যে এসে কী ব্যবস্থাই বা করবে ওরা?' বিউটি পিসি বলেই যাচ্ছিল—'রূপেনের কেবল এক কথা। দেশে এসে দেশের মতো থাকবে। আমি একদিন খুব বকেছি। তোর বউ ভালমানুষ বলে ওই অব্যবস্থার মধ্যে থাকতে রাজি হয়। অন্য মেয়ে হলে ছেলেপুলে নিয়ে হোটেলে গিয়ে উঠত। নিজেরা রইলি বিলেতে, ওদের দেশভক্তি শেখাচ্ছিস! তোর আদিখ্যেতার জন্যে কচি ছেলেগুলো পিঁড়িতে বসে মুলোর পরোটা চিবোবে?'

এককথা থেকে কত কথা মনে পড়ে। পাঁচটা বাজার আগেই রূপেনদা তাড়া দিল। ল্যান্ডস এন্ড দেখতে নিয়ে যাবে। স্টেশন ওয়াগন বার করল। ইচ্ছে ছিল সবাই মিলে যাবে। মরীনের কাজকর্ম বাকি ছিল। জেন-এর পিয়ানো টিচার আসবে। মা, মেয়ে থেকে গেল।

এবার রায়ান গাড়ি চালাচ্ছে। পথে গাছপালা কমে আসছিল। দূরের টিলার মাথায় সূর্যের লাল আভা। হাওয়ার বেগ ক্রমশ বাড়ছে। সমুদ্রের কাছাকাছি পৌঁছে বালিয়াড়ির এপারে উঁচু জমিতে রায়ান গাড়ি রাখল। খানিক নেমে যেতেই নোনা ধরা পাথর, উঁচু-নিচু বালির স্তম্ভ পার হয়ে যাওয়া। সামনে মহাসমুদ্রের শেষ সীমারেখা জুড়ে আস্তাবলের অলৌকিক ছবি। উথালপাথাল ঢেউ। বাতাসে হাহা শব্দ। সোমার চুল উড়ছে। পায়ের পাতা ভিজে যাচ্ছে। চোখে, মুখে বালি, জলের কণা। রায়ান কখন সমুদ্রে নেমে গেছে। দেখাদেখি শন, প্যাট, সোমা ঢেউয়ের মাথায় ভেসে উঠল। এই ক্ষণস্থায়ী মুহূর্তে সূর্যাস্তের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সুজাতা অনুভব করল— জীবন খুব সুন্দর।

ফেরার পথে অর্ণব বলল—'ল্যান্ডস এন্ড-এর মতো এক্সট্রিম কোস্টাল পয়েন্টও দেখেছি। সিনিক্যালি কিছুটা আলাদা। ক্লাইমেন্ট ওয়াইজ সামারের পক্ষে এ জায়গাটা আরও ঠান্ডা মনে হল। সব সময় এত ক্লাউডি থাকে?'

রূপেনদার ছেলেরা অর্ণবের অনেক প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিল। কর্নওয়ালের ইতিহাস, কর্নিশ কালচার, নানা কথা হচ্ছিল। প্যাট বলছিল কর্নিশ ল্যাঙ্গোয়েজের ব্যবহার বন্ধ হয়ে গেছে।

সাউথ ওয়েস্ট ইংল্যান্ডের এই সীমান্ত শহরে যা যা দেখার আছে, সময় অভাবে বাইরে থেকেই দেখে নিতে হল। চার্চ, সিটি হল, ওল্ড কোর্ট হাউস, থিয়েটার হল, কলেজ, হসপিট্যাল ছাড়িয়ে আবার ওরা বাড়ির দিকে যাচ্ছে। শন সোমাকে বলল—'সো? ফ্রম নিউ ইংল্যান্ড টু ওল্ড ইংল্যান্ড। পিলগ্রিমস রিভার্স জার্নি!'

সোমা মাথা নাড়ল— 'ইয়া, ফাইন্যালি'। ওর গায়ে, মাথায় কালি। চুল খড়খড়ে হয়ে আছে। দেরি হয়ে যাবে বলে ওদের আর বীচ এর বার্থ হাউসে স্নান করার সময় হয়নি। সুজাতা বলল— তোর গা চটচট করছে।'— 'গিয়েই শাওয়ার নিয়ে নেব।'

বাড়ি এসে স্নান সেরে ছেলেমেয়েরা নীচে এল। সোমা একদিনেই বেশ মিশে গেছে। অর্ণব মেয়েকে বলল— 'কিরে? ওয়ান ডে ভেকেশন কেমন হচ্ছে? একবেলায় ট্রুরো, ল্যান্ডস এ মামারবাড়ি! নেক্সট টাইম মাকে নিয়ে আর হাসবি না।'

মরীন, জেন পাশে বসেছিল। এক ফাঁকে সোমা চাপা গলায় উপদেশ দিল—'ইংলিশে গল্প কর বাবা।'

ডিনার টেবিলে মরীন অবাক করল যতগুলো নর্থ ইন্ডিয়ান ডিশ রেঁধেছে রেস্টোরেন্টের ভাষায় প্রত্যেকটা 'অথেন্টিক'। অর্ণব পালক পনীর খেয়ে বলল—'ইট ক্যানট বী রূপেন দাস রেসিপি, মরীন খুশি হল—'কুকিং ইজ নট দ্যাট হার্ড। জাস্ট ফলো সাম গুড কুক বুকস অ্যান্ড ইউজ প্রপার ইনগ্রীডিয়েন্টস।'

রূপেনদা সায় দিল। —'ইয়েস, ইভন ধনেপাতা, মেক এ উইকলি ট্রিপ টু লানডান।

সুজাতা মাথা নাড়ল। — 'শুধু বই ফলো করলে একরকম রান্না হয় না। নিজের কুকিং সেন্স থাকা চাই।'

সুজাতা দেখেছে, রান্নার ব্যাপারে ব্রিটিস আইরিশ মেয়েরা শেখে একেবারে বই পড়ে পড়ে। একটি মশলা বাদ দেয় না। আমেরিকার মেয়েদের ইন্ডিয়ান রান্না শেখার তেমন আগ্রহ নেই। আমেরিকান বউ কালেভদ্রে অন্য দেশের রান্না যদি বা করে, এরকম তেলমশলা রেসিপিতে যাবে না। ওর মনে পড়ে না এত বছরে কোনও ভদ্রলোকের আমেরিকান বউ-এর হাতে এরকম রান্না খেয়েছে। সোমা, অর্ণব দুজনেই স্বীকার করল বস্টনের ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টের মতো ল্যাম্ব ভিন্ডালু রেঁধেছে মরীন। রূপেনদা বলল 'কুকিং সেন্স! কথাটা ভাল বলেছ শিন্টু।

হঠাৎ সোমার হাসি শুরু হল। জল খেয়ে মুখের খাবার শেষ করে আবার হাসি। পাশে বসে কিছু না বুঝেই ফিক ফিক করে হাসছে দেখে রায়ান চোখ কুঁচকে শনের দিকে তাকাল। সোমা বলে উঠল—'আই হ্যাড টেল দি স্টোরি। কনকর্ডে একজন ইন্ডিয়ান বুক লিখেছিল। নিজেই পাবলিশার। সবাইকে পুশ সেল করল। মাকেও। তারপরে বাড়িতে কুকিং ডিস্যাসটার।'...সোমার হাসি বন্ধ হচ্ছে না দেখে অর্ণব চালিয়ে গেল 'ডিস্যাসটার মানে? বারো ডলার দিয়ে 'কুকিং ফ্রম বেঙ্গল' কিনে সুজাতা লাল দই বানাতে গিয়েছিল। আভন টেমপারেচারের জায়গায় নাকি প্রিন্টিং মিসটেক ছিল। টু হানড্রেড ফারেনহাইটকে ছেপেছে ফাইভ হানড্রেড। গরম কাল। চার ঘন্টার মাথায় গামলা ফেটে উড়ে গেল। আভন থেকে গলগল করে ধোঁয়া বেরচ্ছে। স্মোক অ্যালার্ম বাজছে! সে যা এক্সপেরিয়েন্স...।

টেবিলে ওরা হেসে অস্থির। ইংরেজিতেই বলছিল অর্ণব। নয়তো সোমা চোখ পাকাবে। শন বলল—'এ রিয়েলি অ্যামিউসিং স্টোরি অ্যাবাউট কুকিং সেন্স!'

রাত দশটা নাগাদ আইসক্রিম খেয়ে ফিরে এসে সোমা শুতে চলে গেল। সারাদিন ধরে ঘোরাঘুরি হয়েছে। সমুদ্রে নেমেছে। ঘুমে ওর চোখের পাতা বুঁজে আসছিল। একটা-আধটা হাই উঠছে দেখে নিজেই গুডনাইট বলে উঠে পড়ল। সুজাতারও ঘুম পাচ্ছিল। কোন সকালে লন্ডন থেকে বেরিয়েছে। আবার কাল ফেরা। ভেবেই ক্লান্তি আসছে। কিন্তু অর্ণব আর

রূপেনদা সমানে কথা বলে যাচ্ছে। টপিক এখন আমেরিকা, ইংল্যান্ড ছেড়ে থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি। এরপরেই কলকাতায় আসবে।

বাইরে হাওয়ার ঝড় উঠেছে। কাচের জানলার ওপারে অন্ধকার বাগানে অস্পষ্ট চাঁদের আলো। ঘরের ভেতরে একটি মাত্র স্ট্যান্ড ল্যাম্প জ্বলছে। মরীন কখন এসে অন্য আলো নিভিয়ে দিয়ে গেছে। খানিকক্ষণ সকলেই চুপচাপ। রূপেনদা স্টিরিওতে বাংলা গান দিয়েছে। অর্ণব আফটার ডিনার লিকিওর নিয়েছিল। রূপেনদা ডিনারের আগে, পরে কয়েকবার ড্রিংক নিয়েছে। সুজাতা লক্ষ করছিল, মরীন এ ঘরে বিশেষ আসছে না। এত রাতে রান্নাঘরে কি করছে কে জানে? রূপেনদা বরফ আনতে গেল। অর্ণব সোফায় মাথা হেলিয়ে চোখ বন্ধ করে আছে। ঘুমোচ্ছে না মন দিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনছে বোঝা যাচ্ছে না। সুজাতা বলল 'তোমার ঘুম পাচ্ছে? শুয়ে পড়বে তো চলো।'

অর্ণব চোখ খুলল—'হুঁ। কটা বাজলো?'

—'সাড়ে এগারোটা প্রায়। কাল আবার যাওয়া। মনটা খারাপ লাগছে।'

—'নিজেই বলেছিলে একদিনের বেশি থাকবো না। অথচ তোমার রূপেনদারা যা করছেন, মনে হচ্ছে ওঁর নিজের বোন এসেছে।'

—'বুঝতে পারিনি। এখনও আমাদের জন্য ওর এত টান রয়ে গেছে। কত বছর যোগাযোগ নেই।'

—রূপেনদা কি শুয়ে পড়লেন? নিজেও তো টায়ার্ড।'

—'না বলে শুয়ে পড়বে না। কিচেনে কথার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি।'

—ড্রিংকটা বোধহয় বেশি হয়ে গেছে। গ্র্যাজুয়্যালি 'হাই হয়ে যাচ্ছিলেন। লিটল বিট ইমোশন্যাল।'

ফায়ার প্লেসের ওপর রূপেনদাদের ফ্যমিলি পিকচারের দিকে তাকিয়ে ছিল সুজাতা। জীবনের সব অনুকূল অবস্থা। যাকে আমেরিকানরা্ বলে 'পিকচার পারফেক্ট', মনে মনে সেই দুটো শব্দ নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল। মানুষের যে কিসে সুখ, সে নিজেই জানে না।

অর্ণব বলল— 'পাটনার বাড়িটা ওঁর অবসেশনের মতো মনে হল।'

—'অথচ কত বছরই বা থেকেছে পাটনায়? তার চেয়ে বেশি দিন তো বাইরে বাইরেই কেটে গেল।'

ঘড়ি দেখে অর্ণব উঠে দাঁড়াল—'রূপেনদা ডেফিনিটলি শুয়ে পড়েছে। মরীন এখনও কিচেনে আছে বলছ? আমরা শুতে যাইনি বলে ওয়েট করছে না তো?'

—'আমি দেখছি।' সুজাতা হলওয়ে পার হয়ে রান্নাঘরের দিকে গেল। অর্ণবের ভীষণ ঘুম পাচ্ছিল। গেস্টরুমে গিয়ে শুয়ে পড়লেই হয়। সুজাতা গুডনাইট টাইট সেরে যখন আসে আসবে। অর্ণব ওদের শোবার ঘরের লাগোয়া বাথরুমে ঢুকে গেল।

কিচেনে ঢোকার মুখে মরীনের কথা শুনে সুজাতা একটু দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। খুব ক্লান্ত ভাবে কথা বলছিল।

মরীন—'বইটা পড়তে দিচ্ছ না। ওরা কতক্ষণ বসে আছে, শুতে যেতে পারছে না। কেন এরকম করছ?'

—'তুমি একবারও এলে না। ওরা এক্সপেক্ট করছিল।'

'তোমাদের কত কথা থাকে। আমি তো চাই রূপেন, তুমি একটু ভাল থাক। নিজের

লোকেদের সঙ্গে নিজের ভাষায় গল্প কর।' রূপেনদা ধীরে ধীরে, যেন নিজের মনেই বলছে—'এত ভাব মরীন, তবু জয়েন করতে পার না। আমাদের পুরনো সময়ের মধ্যে তুমি কোথাও নেই...কখনও ছিলে না।'

মরীনের গলা ভেঙে আসছিল—'রূপেন প্লিজ! আর ড্রিংক নিও না, ওরা অপেক্ষা করছে। কি ভাবছে?

—'মাঝে মাঝে তোমার আইসোলেশনকে কত কনভিনিয়েন্ট ভাবি। তুমি এসে বসলে মনে হয় কিছু তো রি-লেট করতে পারছ না, গল্পের খেই হারিয়ে যায়। এত দূরত্ব কেন হয় মরীন '

এই ব্যক্তিগত মুহূর্তে সুজাতা ভেতরে এল। ওর পক্ষে আর বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব হল না। কোনও কথা না শোনার ভান করতেও কষ্ট হচ্ছিল। তবু জিজ্ঞেস করল—' তোমরা শুতে যাবে না? আমার খুব টায়ার্ড লাগছে। এবার শুয়ে পড়ব।

রূপেনদার হাত ছাড়িয়ে মরীন সুজাতার কাছে এল। হাতে তখনও 'গসপেলস অফ সেন্ট জনস' ধরা। একটু হাসির চেষ্টা করে বলল, রোজ একটু বই পড়ে শুতে যাই। ওঘরে গিয়ে বসিনি বলে মাইন্ড করেছো শিন্টু?'

'মাইন্ড তো তোমার করার কথা। আমরা সারাক্ষণ ইন্ডিয়ার গল্প করছিলাম...।

রূপেনদা সহজ হবার চেষ্টা করছিল— 'ইন্ডিয়ার গল্প বাদ দিলে তোর সঙ্গে আমার আর কত কথা থাকে শিন্টু?'

—'অনেক কথা থাকে। লাস্ট কুড়ি বছর আমরা স্টেটসে। তোমরা এখানে। অথচ তুমি কেবল পাটনা আর কলকাতা করে যাচ্ছ। অবসেসড্ হয়ে যাচ্ছ রূপেনদা।

মরীন হঠাৎ বলল—নস্ট্যালজিয়া আর অবসেশনের ফাইল লাইনটা ড্র করা বোধহয় খুব শক্ত। সবাই পারে না'। যেন গোপন দুঃখের উৎস থেকে কথাগুলো উঠে এল।

হাওয়ার ঝড় থেমে গেছে। বাগানে নিঝুম অন্ধকার। স্কাই-লাইটের ফাঁকে রাতের মেঘলা আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ। চাঁদ ভেসে যাচ্ছে। অসংখ্য তারার বিন্দু বিন্দু আলো। নৈঃশব্দ থেকে কখনও হৃদয়ে নিরুচ্চার শব্দ ওঠে। সুজাতা 'এলিয়েনেশন' কথাটার অর্থ খুঁজছিল। একাকিত্বের বৃত্ত রচনায় মগ্ন এক মানুষ। কখনও সে বৃত্ত রচনা করে বিলাসে, কখনও বিষাদে। স্মৃতিসর্বস্ব অতীত, স্মৃতি আক্রান্ত বর্তমান...এ জীবনে অন্ধ আবেগের মতো বড় প্রতিবন্ধক কিছু নেই।

মরীন তাড়া দিল—'আজ আর রাত কোরো না। শুতে যাও শিন্টু। হ্যাঁ, কাল কখন চা দিয়ে ডাকব? রূপেনদা ফ্যামিলি রুমের দরজার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল— 'সত্যি শুতে যাচ্ছিস? তাহলে একটা কথার উত্তর দিয়ে যা।'

—'কি কথা?'

—'মরীন যে ফাইন লাইনের কথা বলল, তুই ড্র করতে পেরেছিস?

—'তোমার কি মনে হয় পারিনি?'

—'তোর পক্ষে অনেক সহজ। সব বাঙালি এখন আমেরিকায়। তোর কোনও সোশ্যাল আইসোলেশনই নেই! নস্ট্যালজিয়া নিয়ে পড়ে থাকবি কেন?

মরীন যোগ দিল—' সোশ্যাল আর কালচারাল আইসোলেশন ছাড়াও জীবনে অন্য অ্যাসপেক্ট আছে। শিন্টুর সে দুঃখও নেই।'

—'কোন দুঃখের কথা বলছ তুমি?'

সুজাতা বুঝেশুনেও প্রশ্ন করল।

—মরীন ম্লান হাসল—'তোমার ফ্যামিলি ইন্ডিয়ান। কোথায় তোমার প্রবলেম শিন্টু?'

—'মরীন, তোমার কাছে এত সাধারণ সলিউশন আশা করিনি! আমার প্রবলেম যদি না থাকে, সে অন্য কারণে। বিকজ, হি ইজ আ গুড ম্যান। শুধু ইন্ডিয়ান বলেই অর্ণবের সঙ্গে আমার সব চিন্তা ভাবনা মেলে না কি?'

কথায় কথায় রাত বাড়ছিল। মরীনের কি মনে হল, ওদের দু'জনের ঘুম হোক না হোক, ওর আর জেগে থাকার দরকার নেই। কাল সকালে উঠতে হবে। কাজকর্ম আছে। ও রূপেনকে বলে গেল—'অ্যানাদর হাফ্-আওয়ার গ্র্যান্টেড। দেন ইউ লেট হার স্লিপ। শিন্টু, গুড নাইট।'

ফ্যামিলি রুমের স্টিরিওতে ডিনারের পরে কয়েকটা ক্যাসেট চলেছিল। তখন অর্ণব আর রূপেনদার গল্পের মধ্যে, ছেলে, মেয়েদের কথার আওয়াজ, টিভি-র শব্দে কোনও গানই কান করে শোনা হয়নি। এখন এই মাঝরাতে রূপেনদা গান শুনতে বসল।

ভলিউম কমিয়ে দিয়ে সুজাতাকে বলল—'কেন যে তোরা একদিনের জন্যে এলি? কী ভেবেছিলি? খুব সাহেব হয়ে গেছি? এসে খুব বোর হবি?'

—'ভুলে যাচ্ছ, সাহেবদের মধ্যেই থাকি। সে জন্যে নয়। ইনফ্যাক্ট বুঝতে পারিনি, জায়গাটা এত দূরে।'

—বাবা এসেছিলেন জানিস তো? হি হ্যাড আ গুড টাইম। জেন তখন ছোট্ট। কিছুতেই উমা বলতে দেবেন না।'

—'তুমি মেয়েকে জেঠিমার নাম ধরে ডাকছ! মার নাম ধরে ডাকাডাকি আমাদের দেশে চলে না কি?'

—'তুই ভাবছিস সেজন্যে পাটনার বাড়ির সবাইকার আপত্তি? তা নয়রে শিন্টু। পাগলের নামে নাম রেখেছি বলে পিসিরা খুশি হয়নি!'

'ও সব কথা থাকরূপেনদা। ভাবলেই কষ্ট হয়।'

—'জেনকে একজ্যাক্ট আমার মার মতো দেখতে না? মাঝে মাঝে চোখ কুঁচকে তাকায়, নিজের মনে জানলার ধারে বসে থাকে। মনে হয় মা বসে আছে।' পাটনার জেঠিমার কথা ভাবছিল সুজাতা। জেনের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে ঠিকই। রূপেনদারও তো মার মতো চেহারা। জেঠিমাকে শেষ কবে দেখেছে মনে পড়ে না। পাটনার বাড়ির ছাদের ঘরে সেই দুঃখী মানুষ জানলার শিক ধরে বসে থাকতেন।

কখনও আপনমনে কথা বলতেন, হাসতেন। চান করতে গেছেন তো গেছেনই। অনেক ডাকাডাকি, দরজায় ধাক্কা দেবার পরে বেরিয়ে এলেন। হয়তো চানই হয়নি। রুক্ষ খোলা চুল, দূর্গাপ্রতিমার মতো রূপ, আধময়লা শাড়ি পরে বিছানায় বসে বসে কি সব সেলাই করতেন। রাগ ছিল না। মেজাজ ছিল না। তবু পাগল বলে জেঠিমাকে ভয় করত। জ্যাঠামশাই কাঁকের হসপিট্যালে দিয়েছিলেন। কিছুই হয়নি। ঠাকুমা বলতেন— 'রূপ দেখিয়ে পাগল মেয়ে গছিয়ে দিল। আমরা তো আর রংপুরে যাইনি। তোমার দাদুরা মেয়ে দেখে কথা দিয়ে এলেন। মাধবের মতো ছেলে বলে চিরকাল ওই পাগলের সঙ্গে ঘর করে গেল।'

রূপেনদার ক্যাসেট চিন্ময়ের গান বাজছিল—

'হায় গো, ব্যথায় কথা যায় ডুবে যায় যায়গো
সুর হারালেম অশ্রুধারে হায় গো'

রূপেনদা সোফায় আধশোয়া হয়ে সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে কিছু ভাবছিলেন। সুজাতাও

অন্যমনস্ক। রূপেনদা এক সময় বলল—'মাঝে মাঝে মার কথা ভাবি। আমার উমার মতো একটা ছোট্ট মেয়ে বিয়ে হয়ে দূর দেশে চলে গেল। শ্বশুরবাড়িতে অতগুলো রাগী রাগী লোক। বয়সে বড়। অচেনা একজন লোকের সঙ্গে ইনটিমেট ফিজিক্যাল রিলেশন— সিচুয়েশনটা চিন্তা করে দ্যাখ।'

—'তবু তো মেয়েরা হ্যান্ডল করত।'

—'মার তো সে মেন্টাল স্টেবিলিটি ছিল না। ডিসেপ্রেশন এর কোনও ট্রিটমেন্টও হতো না। তারই মধ্যে আমরা সব জন্মে গেলাম। হর্মোন্যাল চেঞ্জ, প্রি-নেটাল ব্লু, পোস্ট নেটাল ব্লু—সাইক্ল চলতেই থাকল।'

—'তোমাদের ছোটবেলায় আদর-টাদর করতেন না?'

— 'আমি তো ইয়ংগেস্ট। অন্যদের কথা জানি না। তবে এটুকু মনে আছে জানলা দিয়ে ডাকতেন। হঠাৎ এসে কোলে নিতে যেতেন, পিসিরা ছাড়িয়ে নিত। একটু বড় হয়ে দেখলাম আর তেমন খেয়াল করতেন না। আবার শেষ বয়সে কত নর্মালি বিহেভ করেছেন। ম্যানিব ডিপ্রেশনের কেস বলে মনে হয়নি।'

কত বছর আগের ঘটনা। তবু রূপেনদার ঘরের দেওয়ালে লাল সোয়েটার পরা জেনের ছবি দেখতে দেখতে সুজাতার চোখে জল এল। পাটনার জেঠিমার ছাদের ঘরে ছোট্ট সোমা আধময়লা কাপড় পরে শূন্য চোখে চেয়ে আছে—এই ছবি কল্পনা করে ওর গলার কাছে সূঁচ ফোটার অনুভূতি হল।

আমার ঘুম আসছে। চোখের পাতা বন্ধ হলে শুধু স্মৃতি আর স্মৃতি। ক্যাসেট থেমে গেছে, রূপেনদা তখনও গাইছে

যে ঘরে ওই প্রদীপ জ্বলে
তার ঠিকানা কেউ না বলে
বসে থাকি পথের নিরালায় গো

পরদিন সবাই ট্রুরো স্টেশনে এসেছিল। মরীনকে সোমা কথা দিয়েছে এবার একাই চলে আসবে। ওদের উপহারে এদের বাক্স ভরে গেছে। অর্ণব বলেছে— 'এরপর কিন্তু আপনারা আসছেন রূপেনদা। বস্টনের দিকে মেডিকেল কলেজের অ্যালামনাই আছে ক'জন। দেখা হয়ে যাবে।'

রায়ান, শন, পাটের ইচ্ছে ওয়ার্ল্ড কাপ সকারের বছরে আসবে। জেন আসতে চায় ক্রিসমাসে। মুহূর্তের আবেগ, মুহূর্তের প্রতিশ্রুতি।

ট্রেন ছাড়ার সময় হল। রূপেনদা হাত নাড়ছে। কিছু বলতে চাইছে অর্ণবকে। কাঁচের আড়াল থেকে শোনা যাচ্ছে না। ট্রেন চলতে শুরু করেছে। সুজাতার মনে হল, মানচিত্রের শেষ প্রান্তে, সমুদ্রের উপকূলে একাই বিষণ্ন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। সুজাতা তাকে অথবা নিজেকে কথা দিল—দেখা হবে।

আবার সেই সমান্তরাল পথ। মহাসমুদ্রে জলে আকাশের ঘন নীল ছায়া। সাদা পাল তোলা নৌকো ভেসে চলেছে। লবণাক্ত জলরাশি, অশান্ত ঢেউয়ের শব্দ বুকের ভেতরটা অনুভব করে ফেরার মুহূর্তে সুজাতার চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে। ও জানে কোথাও ফেরা হয় না। সেই সব হারানো পথের ধুলোয়, সবুজ ঘাসে, শুকনো পাতায়, আর কখনও হেঁটে ফেরা যায় না।

এই জীবনের সত্য

আ অ্যাম্ হিয়ার বিকজ্ অফ্ ইউ
আই সারভাইভড় বিকজ্ অফ্ ইউ
স্টিল,দিস ইজ নো ওয়ে টু লিভ
নো ওয়ে টু সারভাইভ্

সাদা কাগজে দুটো চারটে লাইন। টেবিল থেকে বইপত্র তুলতে গিয়ে শমীকের চোখে পড়ল। দূরে কপিমেশিনের সামনে ক্যারেন তখন কাগজগুলো সাজিয়ে নিচ্ছিল। টেবিলে ওর ব্যাগের পাশে ম্যাগাজিনের ওপর ফ্যাক্সের কাগজটা রাখা।

ক্যারেন ফিরে আসতে শমীক বলল—"সরি, তোমার মেসেজটা চোখে পড়ে গেল"। ক্যারেন লেখাটা তুলে নিল। কাগজপত্রের সঙ্গে রাখতে রাখতে বলল—"ঠিক আছে। ব্যক্তিগত কিছু নয়"।

শমীক কৌতূহল দেখাল না। হতে পারে কেউ কবিতা লেখার চেষ্টা করেছে। ক্যারেনের ফ্যাক্স নাম্বারে দু চার লাইন পাঠিয়ে দিয়েছে। নীচে অবশ্য নামটাম নেই। হয়তো মেসেজের প্রথম পাতাটা ক্যারেন্ রাখেনি।

শমীক মাইক্রো-ফিল্ম সেক্শনে যাচ্ছিল। ওঠার আগে ক্যারেন্ বলল—"আমার বন্ধুর লেখা। মাদার্স-ডের পরের দিন পাঠিয়েছে। কাল ডে-অফ্ ছিল। আজ এসে পেলাম।"

—"মাদার্স-ডের জন্য লেখা? কিন্তু তোমাকে কেন?"

ক্যারেন একটু হাসল—"দেখছোই তো, পাঠিয়েছে।" শমীক কাঁধ ঝাঁকিয়ে চলে যাচ্ছে দেখে ক্যারেন বলল—"সকলের মার কি ফ্যাক্স নাম্বার থাকে ? "

—"ঠিকানা থাকে"।

ক্যারেন মাথা নাড়ল—"না থাকতেও পারে। মার বদলে তার হয়তো একজন বন্ধু থাকে। তাকে মার কথা লেখা যায়।"

শমীকের ধারণা মেয়েদের বন্ধুত্বের মধ্যে আবেগ-টাবেগ একটু বেশি থাকে। ক্যারেনের কথার ভাবেও তা ধরা পড়ছে।

শমীক জিজ্ঞেস করল—"তুমি সেই বন্ধু?"

চশমার ফ্রেমের ওপর আঙুল রেখে ক্যারেন উত্তর দিল—"মনে হয়।"

শমীকের আর কথা বাড়ানর সময় নেই। জানারও কিছু নেই। ক্যারেন নিজের থেকে

যেটুকু বলার বলেছে। হয়তো কোনও দুঃখের ঘটনা আছে। কিংবা দুঃখের কবিতা দিয়েই মহিলা লেখা শুরু করেছে। নরম্যাল ট্রেন্ড। বিষাদের লাইনটা ধরে থাকতে পারলে একরকম উৎরে যায়।

শমীক যাওয়ার সময় বলল—"লাঞ্চে দেখা হবে। আজ দুটো অ্যাসাইনমেন্ট শেষ করার কথা। কে জানে কখন উঠতে পারব"।

শুক্রবার অনেকক্ষণ শমীক অফিসে থাকল। "এমপায়ার নিউজের" মেট্রো সেক্শনের জন্যে দুটো রাইট- আপ তৈরি করল। আমেরিকার মেমোরিয়াল ডে নিয়ে সরু সরু দু কলম লেখার জন্যেও খাটতে হচ্ছে। ইন্-ডেপ্থ রাইটিং এর ভূত ঘাড়ে চেপে এই অবস্থা। আমেরিকার আর্মির কে কোথায় যুদ্ধে গিয়ে মারা গেছে তার হিসাব নাও। লেখো, না লেখো, ব্যাক্গ্রাউন্ড জানো। ভিয়েতনাম ভেটারেনদের দু-চারটে ডায়লগ্। এ বছর কাছাকাছি কোথায় কোথায় প্যারেড হচ্ছে, বুড়োরা ফ্ল্যাগ হাতে করে কখন জড়ো হচ্ছে ,একটু একটু করে সব ছুঁয়ে যাও।

অন্য লেখাটা শেষ মুর্হূতে ঘাড়ে এসে পড়েছে। গ্যাসস্টেশনের পাঞ্জাবী মালিকের ছ'টা খুনের মামলার ফলো-আপ। বব স্মিথ্ ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টিং করছিল। হঠাৎ হানিমুনে গিয়ে বসে আছে। এখন ধীলন্ মামলার ফলো-আপ করছে শমীক। পুলিস রিপোর্ট, কোর্ট হিয়ারিং, খুন হওয়া লোকগুলোর বাড়ির লোকজনদের স্টেট্মেন্ট , সব দেখে শুনে লেখাটা তৈরি করতে হচ্ছে। আগের দিন স্যানফোর্ডের গুর্দোয়ারায় গিয়েছিল। ধীলন সম্পর্কেভয়ে কেউ কিছু বলতে চাইছে না। সুখ্বিন্দর আর যশপাল সিং নামে যে দুজন গ্যাসস্টেশন অ্যাটেনডেন্ট খুন হয়েছে, ওরা ওই গুরদোয়ারে যেত। ধীলনের গ্যাসস্টেশনে ওরা আর কাজ করতে চাইছিল না। কিছুদিন ধরে কেউ ওদের থ্রেট্ন করছিল। ধীলন সম্পর্কে শমীকের কাছে আরও খবর আছে। দু'কলাম জায়গা পাওয়াতে স্টোরিটা সাজিয়ে নিল।

মাঝে সুদেষ্ণার ফোন এল। শমীক তখনও ওঠেনি দেখে তাড়া দিল —উঠে পড়ো। এত বৃষ্টির মধ্যে রাত করো না।" শমীক ঘড়ি দেখল। দশটা বেজে গেছে। বলল—"হয়ে গেছে। আর মিনিট কুড়ি।

—তার মানে বাড়ি ফিরতে সাড়ে এগারোটা।"

—"তুমি ওয়েট কোরো না। শুয়ে পড়ো।"

—নীলও এখনও ফেরেনি। এই ওয়েদারে গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছে। উইক-এন্ড এলেই হুজুগ।"

শমীক হাসল —"গেছে কোথাও পার্টি করতে!"

সুদেষ্ণার বিরক্তি প্রকাশ পেল—"কে জানে? বলল তো মুভিতে যাওয়ার প্ল্যান।"

—"তাহলে কাছাকাছি মল্-এই গেছে। এসে যাবে একটু বাদে।

—"ভয় করে । নতুন লাইসেন্স পেয়ে এত বাড়াবাড়ি করছে।"

—"তুমি বাড়ি বসে চিন্তা করে কিছু করতে পারবে? শুধু শুধু টেন্শন কোরো না। আই থিংক হি ইজ্ কাইন্ড অফ রেসপন্সিবল।"

একটু চুপ করে থেকে সুদেষ্ণা বলল— " সেই। চিন্তা করে লাভ নেই। আসলে অভ্যেস, ছাড়তে পারি না। তোমার ব্যাপারেও তাই। কল্ করব না ভেবেও করলাম।

শমীক হেসে ফেলল—"বেশ করেছ। তবে এখন দেরি করিয়ে দিচ্ছ। আর কথা বললে কাজ শেষ করতে পারব না।"

সুদেষ্ণা ফোন রেখে দিল।

শমীক যখন বাড়ি ফিরল তখনও বৃষ্টি থামেনি। নীল গ্যারেজে গাড়ি তুলে দিয়েছে। বোধহয় খানিক আগেই ফিরেছে। বেস্‌মেন্টে ওর ঘরে আলো জ্বলছে। দোতলা অন্ধকার। শমীক ওপরে উঠল। প্যাসেজের আলো নেভানো। সুদেষ্ণার ঘরের দরজা বন্ধ। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে শমীক নিজের ঘরের দিকে গেল। জামাকাপড় বদলে শুতে যাওয়ার আগে ওর মনে হল সুদেষ্ণা জেগে আছে।

সুদেষ্ণার দরজায় হাত রাখতে দরজা খুলে গেল। বাইরে রিমঝিম বৃষ্টির শব্দ। নিভে যাওয়া মোমবাতির মৃদু গন্ধে ঘর ভরে আছে। অন্ধকারে অস্পষ্ট অবয়ব। শমীক দরজায় দাঁড়িয়ে। সুদেষ্ণা আলো জ্বালল না। শমীককে ঘরে ডাকল না। শুধু জিজ্ঞাসা করল—কিছু খুঁজছ?"

—"জেগে আছ কিনা দেখতে এলাম।"

শমীক বিছানার কাছে যেতে সুদেষ্ণা উঠে বসল। অন্ধকারে তার হাতের স্পর্শ। শমীক তাকে চুম্বন করছিল। বাসনার সেই তীব্র আবেগ, উষ্ণ শ্বাস, উত্তপ্ত চুম্বনে আচ্ছন্ন সুদেষ্ণার বুকের মধ্যে নিরন্তর শব্দহীন এক গোপন কান্না অনুভব করছিল। এই সান্নিধ্য তাকে স্থির থাকতে দেয় না। কেন মনে হয়, শমীক তাকে ছেড়ে চলে যাবে। ক্রমশ যেন দূরে সরে যাচ্ছে। অথচ আজ এই মুহূর্তে কী গভীর আশ্লেষে বেঁধে রেখেছে। গ্রহণ আর প্রত্যাখানের এই খেলায়, নিরন্তর টানাপোড়েনে সুদেষ্ণা ক্লান্ত। সে আজ নিজেকে স্থির রাখতে চেষ্টা করছিল।

হঠাৎ শমীক ওকে ছেড়ে দিল। কয়েক মুহূর্তে চেয়ে থেকে বলল—"আজ তোমার কী হয়েছে?"

সুদেষ্ণা ঝড়ের আভাস পেল। ভাঙনের শব্দ শোনা যাচ্ছে। দুর্বার দেহবাসনার পুনরাবর্তে ভেসে যাওয়ার মুহূর্তে দুর্বল প্রতিরোধের মতো গায়ের চাদরটা টেনে নিল।

ছুটির দিনে সকালে শমীক দেরিতে ঘুম থেকে ওঠে। আজ আর বেশিক্ষণ ঘুমনো গেল না। মাঝে মাঝে গাড়ির আওয়াজ। লোকজনের গলা। শমীক উঠে পড়ল। জানলার ব্লাইন্ড্‌স্ সরাতে সামনে দু তিনটে গাড়ি দেখতে পেল। উল্টোদিকের রাস্তায় লোকজন ঘুরছে। ডরোথিরা গ্যারাজ সেল্ দিয়েছে।

নীচে এসে সুদেষ্ণার সাড়াশব্দ পেল না। নীলও নেই। শমীক কফি নিয়ে ফ্যামিলি রুমে এল। সুদেষ্ণা নিশ্চয়ই উল্টোদিকের ড্রাইভ-ওয়েতেই গেছে। শমীক জানলা দিয়ে দেখছিল। ডরোথি ওর বুড়ো মাকে নিয়ে পুরোনো জিনিসপত্র সাজিয়ে বসেছে। বেশ কয়েকটা ফার্নিচার। ওপাশে টেবিলের ওপর ফুলদানি, ল্যাম্প, আরও কি সব রয়েছে। হ্যাঙারে ঝোলানো জামাকাপড়। কারা পরে কে জানে? দুটো একটা গাড়ি এসে থামছে।

শর্ট্‌স পরা মোটামতো দুই মহিলা একটা চেস্ট অফ-ড্রয়ার্স কিনে ধরাধরি করে ভ্যানে তুলছিল। ডরোথির বর এসে হাত লাগাল। শমীকের আজকাল রিচি নামটা চট্ করে মনে পড়ে যায়। আগে ভুলে যেত। দেখা হলে একদিন রিকি একদিন বিলি বলে ডাকত। সুদেষ্ণা রেগে যেত। ডরোথি ওর এতদিনের বন্ধু। অসময়ে কত দেখেছে। শমীক তার বরের নামটাও ঠিকমতো বলতে পারে না। এগুলো হচ্ছে মানুষকে ইগনোর করা।

শমীক শেষে দেবুর টেকনিক ধরেছে। থিওরি অফ অ্যাসোসিয়েশন। ডরোথি রিচি রোড, ডরোথি রিচি রোড করতে করতে ওর বরের নামটা মাথায় ঢুকিয়ে নিয়েছে। আজ দেখেই মনে পড়ে গেল।

শমীক ঠিক ধরেছে। সুদেষ্ণা ওখানে। ফুল ফুল ছাপ দেওয়া লং স্কার্ট আর সাদা হ্যাট পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

চোখে সানগ্লাস, ঠোঁটে তামাটে লিপস্টিক। আজকাল একটু ওজন বেড়েছে। গাল চিবুক ভারী দেখায়। গলায় সূক্ষ্ম খাঁজ। এক জেনারেশন আগের ইটালিয়ান মেয়েদের মতো চেহারা। হাবভাবটাও মেলে।

শমীককে বাইরের দরজায় দেখতে পেয়ে সুদেষ্ণা দূর থেকে হাসল। ডরোথিদের হ্যাঙারে ঝোলানো জামাকাপড়ের পাশ দিয়ে ওদিকে চলে গেল। ফার্নিচারের পেছন থেকে রঙচঙে একটা টেবিল ল্যাম্প তুলে আনছে। গ্যারেজ সেল্-এ গেছে মানেই কিছু কিনেছে।

আকাশে মেঘ জমছিল। বৃষ্টি হবে বোধহয়। কালকের বৃষ্টির পর ঘাস এখন ভেজা রয়েছে। ম্যাগনোলিয়ার পাতায় পাতায় জল। এল্মট্রি থেকে বৃষ্টির ফোঁটার মতো জল ঝরছে।

রঙিন কাচের ওপর কারুকার্য করা আলো হাতে নিয়ে সুদেষ্ণা এল। সানগ্লাস খুলে রেখে বলল—"কখন উঠলে? আমি তো নটার পরে গেলাম।"

—"ওই রকমই উঠেছি।"

—"ব্রেকফাস্ট দিচ্ছি। দাঁড়াও, আগে এটা দেখাই।"

সুদেষ্ণা কিচেন টেবিলের ওপর ল্যাম্পটা নামিয়ে রাখল। স্টেইন্ড গ্লাসের তৈরি ছ-কোণা শেড্। ছাতার মতো দেখতে। শেডের ওপর ফুল। লতাপাতা আঁকা। শমীককে জিজ্ঞাসা করল—

—"দেখতে সুন্দর না? কতোয় পেলাম বলো তো?"

শমীক আড়মোড়া ভাঙল—"কতো আর ? পাঁচ ফাঁচ হবে।"

"পাঁচ ডলারে টিফ্যানী ল্যাম্প? দোকানে এগুলোর কতো দাম জানো?"

—"হু কেয়ার্স? পুরোন জিনিস তুলে এনেছ। তাও আবার ওদের গ্যারাজ সেল্ থেকে। বিকেলের দিকে গেলে এম্‌নিতেই দিয়ে দিত।"

শমীক হাসছে দেখে সুদেষ্ণা ল্যাম্পটা ওর দিকে ঘুরিয়ে দিল। —"ডিজাইনটা ভালো করে দ্যাখো। এ জিনিস গ্যারেজ সেল-এ পেতে না। ডরোথির গ্র্যান্ডমাদারের বাড়িতে ছিল। অ্যান্টিক শপে এগুলোর কতো দাম।"

—"তুমি কতো দিলে?"

—"ট্যাগে লেখা ছিল পঁচিশ। পনেরোয় পেয়ে গেলাম।"

শমীক মজা পাচ্ছে—"পনের ডলারে অ্যান্টিক ল্যাম্প! জ্বললে হয় এখন!"

—"জ্বলবে না কেন?"

—"তার ফার ঠিক আছে? দেখে নিয়েছিলে?"

সুদেষ্ণা মাথা নাড়ল—"অতো দেখিনি । ঠিক আছে নিশ্চই।"

শমীক ক্যাবিনেট খুলতে খুলতে বলল—"কে জানে কার দিদিমার লাইট! আমাদের নাইটে জ্বললে হয় শেষ পর্যন্ত!"

সুদেষ্ণা হেসে উঠল। শমীক নতুন বাল্ব বার করে এনে লাগাল। সুইচ-অন্ করতেই আলো জ্বলল।

—"মেঘলা দিনের ছায়াচ্ছন্ন ঘরে সেই মায়াময় উজ্জ্বলতার দিকে চেয়ে থেকে সুদেষ্ণা বলল—"আলো জ্বলল তো।"

—"না জ্বললেও তুমি রেখে দিতে।"

সুদেষ্ণা হাসছিল। শমীক বলল—"কী হবে এত জিনিসপত্র জমিয়ে? নীল কোনও দিন কিছু নেবে? সব ফেলে দেবে।"

সুদেষ্ণা আলোর দিকে মুখ ফেরাল—"তার জন্য এখনই বাড়ি খালি করে দেব? তোমার কি ধারণা নীলও বড় হয়ে এখানেই থাকবে?"

—"সেই, আমারও এসব বলার কোনও মানে হয় না।"

সুদেষ্ণার গলার স্বর বিষণ্ণ শোনাল—"আসলে তোমার নিজেরই আর ভালো লাগে না। বাড়িটা সাফোকেটিং মনে হয়।"

শমীক হঠাৎ জিজ্ঞেস করল—"তোমার কখনও সেরকম মনে হয় না? কতদিন ধরে সব কিছু নিয়ে বসে আছ। মাঝে মাঝে মনে হয় না অনেক জিনিস ফেলে দেওয়া যায়? ফেলে দেওয়া উচিত?

সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে সুদেষ্ণা বলল—"ফেলে দেওয়া তিনটে মানুষ আর তাদের জিনিসপত্র নিয়ে এই সংসার ধরে রেখেছিলাম বলে আছে। তুমি কোনগুলো ফেলে দিতে বলো শমীক? লীনার জিনিসগুলো?"

শমীক কাছে এল। সুদেষ্ণার পিঠে হাত রেখে বলল—"প্লিজ, কথাগুলো এভাবে নিও না। আমি তোমাকে হার্ট করতে চাইনি। গ্যারাজ সেল নিয়ে ঠাট্টা করতে করতে বলেছিলাম।"

সুদেষ্ণা সহজ হতে চেষ্টা করল—"সেই। আমিও সকাল থেকে এক টিফ্যানী ল্যাম্প নিয়ে পড়েছি। এনিওয়ে সকালে নীলের সঙ্গে কথা হয়েছে?"

শমীক মাথা নাড়ল—"না। নীচে দেখলাম না তো। এখনও ওঠেনি নাকি?"

সুদেষ্ণার মুখে প্রসন্নতা ফিরে এল—"তিনি লাস্ট উইক থেকে চাকরি নিয়েছেন। শনিবার সকাল আর দুদিন আফটার স্কুল।"

"—কাল বলো নি তো। কোথায় কাজ করছে?"

"—বার্নস্ অ্যান্ড নোবল এ। বই পড়ছে। কফি খাচ্ছে। যে কদিন করতে চায় করুক।"

সুদেষ্ণার মেজাজ বুঝে শমীক স্বস্তি পেল। ওপর থেকে ঘুরে এসে সুদেষ্ণা লাঞ্চ তৈরি করছিল। শমীক ভাবছিল আজই লিজ্ সাইনিং এর কথাটা বলবে। এক মাসের মধ্যে মুভ করতে হবে। সুদেষ্ণাকে জানানো দরকার। ও হয়তো এখনও আশা করে আছে শমীক শেষ অবধি থেকে যাবে। আগেও এ রকম হয়েছে। কিন্তু শমীক এবার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে। বুঝতে পারছে আর এভাবে থাকা সম্ভব না। ভেতর ভেতর ক্রমশই এক দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে। কৃতজ্ঞতা, মোহ, সান্নিধ্যর সুখ এখন শুধু অবশিষ্ট আবেগের মতো। ফেলে আসা প্রত্যহের জন্য তাদের কিছু স্মৃতি আছে। তবু, শুধুমাত্র অনুষঙ্গ নিয়ে জীবন কাটে না। শমীক আর এই সংসারের সঙ্গে নিজেকে জড়াতে চায় না। এক সময়ের প্রয়োজন, আবেগ সর্বস্ব অভ্যাসের পুরনো বিন্যাস থেকে মুক্ত হতে চায়। সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার এই মুহূর্তে শমীক সুদেষ্ণার

জন্য দুঃখ বোধ করছে। সুদেষ্ণার প্রচ্ছন্ন অভিযোগও মেনে নিয়েছে। শমীকের মনে হয় সমস্ত জীবন ধরে বিবেকমুক্ত থাকার মতো কাজ করে যাওয়া খুব কঠিন।

রবিবার ব্রেকফাস্ট খেতে বসে নীলের সঙ্গে কথা হল। শমীক জিজ্ঞেস করল—"কাজ কেমন লাগছে?"

নীল মাথা নাড়ল—'ইটস্ ও কে। দে হ্যাভ গুড্ আওয়ার্স।"

—"অনেকদিন ওই দোকানটায় যাওয়া হয়নি।"

—"কাম্ ওভার সাম্ ডে। বাই মি আ বুক্। হ্যাভ আ কাপ্ অফ্ গুড কফি। দ্যাটস অফ কোর্স অন মি।"

নীল চোখ কুঁচকে হাসছিল। শমীক নিউইয়র্কের "বার্নস অ্যান্ড নোবে্ল"-এই যায়। মাঝে মাঝে বুক সাইনিং ডে থাকে। কভার করতে যেতে হয়। অরুন্ধতী রায়ের বইটার দিনও গিয়েছিল। এখন বড় বড় শহরের "বার্নস অ্যান্ড নোবে্ল" এর দোকানগুলোকে ঢেলে সাজিয়েছে। লেখকদের গল্প, কবিতা পড়ার জায়গা, কফিশপ্। বই এর দোকানের মধ্যেই কত ব্যবস্থা। নীল যে দোকানটায় কাজ করছে, সেটা পাশের শহরে। রি-মডেলিং এর পর শমীকের আর যাওয়া হয়নি। একটা শনিবার গেলেই হয়। অবশ্য চলে যাওয়ার আগে যদি সময় থাকে।

শমীক ভাবছিল নীল কি ওর চলে যাওয়ার কথা জানে? সুদেষ্ণা কি বলেছে? শমীক চুপ করে আছে দেখে সুদেষ্ণা বলল—"তুমি আর কবে যাবে? মাত্রদুটো উইক্-এন্ড তো আছে। নেকসট্ শনিবার আমি থাকছি না।"

সুদেষ্ণার কথাবার্তা শুনে নীলের হাসি পাচ্ছিল। মার কাছে বুক-স্টোরে যাওয়াটাও ডেট্ দেখে ঠিক করার ব্যাপার । বই ও তো কিনবে না। স্টারবাকসে্র কফি আর চকলেট ব্রাউনি খেয়ে ফিরে আসবে! নীল মজা করে বলল—'ইটস্ নট আ বিগ্ ডিল মাম্। স্যাম্ ক্যান মেক-ইট এনি টাইম।

—"নো, হি ক্যান্ট্"সুদেষ্ণার গলার স্বর বদলে গেল। —"নীল, শমীক চলে যাচ্ছে। এ মাসেই।"

—"ওহ্ রিয়েলি! আই ডিড্ নট নো দ্যাট!"

শমীক জানে নীল অবাক হয়নি। ইদানীং ওর স্বভাবে একটা নির্বিকার ভাব লক্ষ করছে। তবু একেবারেই কি প্রতিক্রিয়া হবে না? আসলে বুঝতে দিতে চায় না। এই সম্পর্ক-টম্পর্ক নিয়ে আর বোধহয় মাথাও ঘামায় না। সতেরো বছরের আমেরিকান ছেলেদের মতোই হাবভাব। অথচ এই নীল বারো-তেরো বছরে কী প্রচন্ড রি-অ্যাক্ট করত! জিনিসপত্র ভেঙেচুরে তছনছ। স্কুলে গ্রেড খারাপ করেছে। দুবার বাড়ি থেকে চলে গিয়েছিল। শমীক বুঝতে পারতো ওর ওপর অনেক চাপ গেছে। ছোট থেকে পরপর এতগুলো ঘটনার জের সহ্য করা কঠিন। ভেবে দেখতে গেলে নীলেরই বোধহয় সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে।

নীলের কথায় শমীকের চিন্তার স্রোতে বাধা পড়ল।

—"স্যাম্, নিউইয়র্কে তুমি কোথায় থাকছ।"

—"মিড টাউনে। বিটুইন থার্টি ফিফথ অ্যান্ড লেকসিংটন।"

—"তুমি সেটল করে নাও। একদিন যাব।"

শমীক সুদেষ্ণার দৃষ্টি থেকে চোখ সরিয়ে নিল। টেব্ল ছেড়ে ওঠার সময় নীল্কে বলল—"চলে এসো এনি টাইম। উই ক্যান হ্যাভ লাঞ্চ অর ডিনার।"

দু সপ্তাহ পরে শমীক নতুন অ্যাপার্টমেন্টে চলে গেল। ছ বছর সুদেষ্ণার সঙ্গে ছিল। অথচ শেষের কয়েকদিন প্রায় দেখাই হল না। ওই সপ্তাহে শমীককে অফিসের কাজে ওয়াশিংটন যেতে হল। ফিরে এসে ইউনাইটেড নেশন্‌সে দুদিন। থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রির পপ্যুলেশন কন্ট্রোলের ওপর মিটিং কভার করা। পর পর তিন চারটে অ্যাসাইনমেন্ট এসে গেল। নিউইয়র্ক থেকে দু রাত্তির ফিরতেই পারল না।

শনিবার মুভ্ করার কথা। শমীক শুক্রবার ফিরে এসে সুদেষ্ণাকে দেখতে পেলো না। রাত প্রায় নটা। নীল টি. ভি দেখছিল।

শমীক বলল—"মুভিং কম্পানি কল করেছিল। কাল সকাল আটটায় ভ্যান্ আসবে।"

—"জানি। অফিসেও মেসেজ রেখেছিল। আমি আর কল্ ব্যাক করার সময় পাইনি।"

—"তোমার ডিনার রাখা আছে। ইউ ওয়ান্ট মী টু ওয়ার্ম -ইট আপ্?"

শমীক সিঁড়ির দিকে তাকাল—"সুদেষ্ণা কোথায়?"

নীল উত্তর দিল—"ম্যাম লীনার কাছে গেছে। সান-ডের আগে ফিরবে না।"

শমীক এই প্রথম বিচ্ছেদের কষ্টের মতো কিছু অনুভব করল। সুদেষ্ণা নেই। শমীক আসবে জেনেও চলে গেছে। কাল ফোনে কথা হল। একবারও বলল না লীনার কাছে যাবে। শমীক ভাবতেই পারছে না চলে যাবার আগে সুদেষ্ণার সঙ্গে ওর দেখা হবে না। নীলকে জিজ্ঞেস করল "হঠাৎ আজই কেন যেতে হল জানো? লীনার শরীর ঠিক আছে?"

—"লীনা যেমন থাকে, সেরকমই আছে। শেরউড্ থেকে কোনও কল্ আসেনি। মাম্ নিজে থেকেই দুদিনের জন্যে গেছে।"

শমীক আর কোন প্রশ্ন করল না।ওপরে নিজের দরকারি কাগজপত্র গুছিয়ে নিতে নিতে চাবির কথা খেয়াল হল। চাবি কার কাছে ফেরত দিয়ে যাবে? কাল মুভারদের ভ্যান রওনা হওয়ার পরেই ওকে বেরিয়ে পড়তে হবে। সুদেষ্ণা নেই। নীলও হয়তো থাকবে না। শমীকের রাগ হচ্ছিল। সুদেষ্ণা ওর সুবিধে অসুবিধের কথাও ভাবল না। যেন ভাড়াটে চলে যাচ্ছে। যাওয়ার দিন এত অভিমান করে কী লাভ?

শমীক ডাকল — "নীল, নীল, একবার সিঁড়ির কাছে এসো।"

নীল শুনতে পাচ্ছে না। শমীক চিৎকার করে ডাকলো—"নীল তুমি কি নীচে?"

নীল টি.ভি দেখতে দেখতে শমীকের গলা পেয়ে উঠে এল। সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল—"কী হল, কিছু চাই?

—"চাবিটা কি করব? কাল কি তুমি থাকবে?"

—"আমার তো কাজ আছে। ফিরতেও দেরি হবে। এনি ওয়ে, চাবিটা কোন প্রবলেম নয়। তুমি মিসেস ক্রফ্‌টের কাছে রেখে যেও।"

শমীকের মনে হল নীল যেন অন্যদিনের মতোই ব্যবহার করছে। শমীকের চলে যাওয়াটা ওদের কাছে এতই সামান্য ব্যাপার যে সে নিয়ে ভাবারও সময় নেই।

আশ্চর্য! শমীক নিজেও বা এতটা আশা করছে কেন? চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত সে নিজেই নিয়েছে। সুদেষ্ণার সঙ্গে এত বছরের সম্পর্ক ভেঙে দিয়ে যাচ্ছে সে জন্য তার কোন দ্বন্দ্ব নেই। আক্ষেপ নেই। তবু, যাওয়ার সময় সুদেষ্ণার না থাকা, নীলের ব্যবহার বড় উপেক্ষার মতো লাগছে।

শমীক চলে যাওয়ার পর কয়েক সপ্তাহ কেটে গেল। ওর ফোন এল না। সুদেষ্ণা বুঝতে

পারছিল শমীক আর যোগযোগ রাখতে চাইছে না। নীলকে যাই বলে থাক,এ বাড়ির সঙ্গে শমীকের সম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে। সুদেষ্ণাকে কখনও ওর প্রয়োজন হবে না।

প্রয়োজন শব্দটা উলঙ্গ সত্যের মতো সুদেষ্ণার চেতনায় আঘাত করছিল। আশ্রয়, অবলম্বন, ভালোবাসা—এইসব সূক্ষ্ম মায়াময় শব্দের আবরণে সে ঢাকা থাকে। স্বচ্ছতা ভেদ করে কখনও চোখে পড়ে। কখনও পড়ে না। সুদেষ্ণা জানে, সেও নিজের প্রয়োজনে শমীককে এদেশে এনেছিল। শমীক পাশে না থাকলে সেই দুঃসহ সময় পার হয়ে আসা বড় কঠিন হত। তবু, সুদেষ্ণা কখনও ভাবেনি শুধু প্রয়োজনের জন্য তারা পরস্পরকে অবলম্বন করে আছে। সে সমাজকে অস্বীকার করেছে। অসম বয়সকে বাধা বলে মানেনি। এক তীব্র মোহের আবরণকে অন্ধ বিশ্বাসে আঁকড়ে ধরেছিল। সুদেষ্ণা ভেবেছিল সেই বোধের নাম ভালোবাসা। সেই অনুভব প্রেম।

এখন মাঝে মাঝে নিজেকে বড় অবিন্যস্ত লাগে। ঘটনাচক্রের আর্বতে ক্লান্ত এ জীবন কখনও সুস্থির হবে না।

নিউইয়র্কে আসার পর শমীক অনেকটা সময় পায়্। অফিস ছুটির পরে সাবার্ব এ ফেরার তাড়া নেই। পোর্ট-অথরিটিতে গিয়ে বাসের জন্যে দাঁড়িয়ে থাকা নেই। রোজ যাতায়াতে দু ঘন্টা যেতে ট্রাফিক, ওয়েদার কিছু নিয়েই আর ভাবতে হয় না। নিউইয়র্কে সন্ধের পর এত জায়গায় যাওয়ার থাকে, অফিসের চাপ না থাকলে ইচ্ছেমতো ঘোরা যায়। শমীক বহুদিন পরে কলকাতার মেজাজ ফিরে পাচ্ছিল। আমেরিকায় এসে পর্যন্ত বড় শহরে থাকা হয়নি। সুদেষ্ণার বাড়ি আর ছোট শহরে চাকরি-এভাবেই শুরু হয়েছিল। নিউইয়র্কে চাকরি পাওয়ার পরও একইভাবে চলছিল। শমীক অনেকবার ভেবেছে। শেষপর্যন্ত সুদেষ্ণাকে বলতে হল। শমীকের তেত্রিশ বছর বয়স হয়ে গেছে। এবার নিজের মুখোমুখি হওয়া দরকার। ইচ্ছে অনিচ্ছেগুলো বুঝে নেবার সময় এসেছে। একটাই জীবন। শমীক নিজের মতো করে বাঁচতে চায়। ছোট শহরে নিস্তরঙ্গ পরিবেশ, সুদেষ্ণার সংসারের প্রতিদিনের রুটিন ওর আর ভালো লাগছিল না। এখন এই জমজমাট শহরে শমীক নতুনভাবে সময় কাটাচ্ছে। আঠারোতলার ছোট্ট অ্যাপার্টমেন্ট। ইচ্ছে হলে শুধু নিজের সঙ্গে থাকা। সন্ধেবেলা শহরে হাজার আকর্ষণ। শমীক কোনদিন সোহোর প্রাইভেট আর্ট গ্যালারিতে যায়। কোনদিন সেন্ট্রালপার্কের ধারে গুগন হাইম্ মিউজিয়াম নয়তো মিউজিয়াম অফ্ মর্ডান আর্ট এ। প্রেস কার্ড নিয়ে লিংকন সেন্টারে "মহাত্মা ভার্সেস গান্ধী" দেখে এল। নাসিরউদ্দিনের ইন্টারভিউ নিয়ে রাত জেগে রিভিয়্যু লিখল। লেখাটা "এম্পায়ার নিউজের" রবিবারের আর্ট অ্যান্ড এন্টারটেন্মেন্ট সেক্শনে গেল। শমীক তার কাজ আর ছুটির মেজাজ মিলিয়ে মুক্ত জীবনের স্বাদ অনুভব করছে। সুদেষ্ণার সঙ্গে কথা হয় না। শমীক ফোনে মেসেজ রেখেছিল। হয়তো নীল আসবে একদিন।

ক্রিসমাসের আগে হঠাৎ ঠান্ডা পড়ে গেল। দুদিন ধরে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি। ভেজা স্যাঁতসেতে আবহাওয়া। শমীক প্রায় চোদ্দটা ব্লক হেঁটে অফিস যায়। হাঁটতে ভালই লাগে। আজ এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে। রাস্তায় নেমে খেয়াল হলো ছাতা আনেনি। বৃষ্টির সঙ্গে ঝিরিঝিরি বরফ শুরু হয়েছে। দু ব্লক হেঁটে শমীক সাব-ওয়ে নিল। অফিসের কাছে স্টেশনে ওঠার মুখে সিঁড়িতে ক্যারেনের সঙ্গে দেখা। সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে ক্যারেন বলল—"আজ তাহলে হাঁটা হল না?"

—"ওয়েদারটা আইডিয়াল্ বলছ? একে দেরি হয়ে গেছে, তার ওপর ছাতা ফেলে এসেছি।"

দুজনে কথা বলতে বলতে অফিসে পৌছে গেল। "এ বছর তাড়াতাড়ি ঠান্ডা পড়ে যাচ্ছে। ক্রিসমাসের আগেই স্নো শুরু হল।"

শমীক এলিভেটরের বোতাম টিপে বলল—"পড়ুক। আমাকে তো আর রোজ রোজ কমিউট করতে হচ্ছে না। দ্যাট্ ওয়াজ রিয়েল পেইন।"

এলিভেটরে দাঁড়িয়ে ক্যারেন হাসল—"শীতের মধ্যে হেঁটে হেঁটে কমিউট করাও সোজা নয়। কতগুলো ব্লক্! জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারিতে বুঝবে।"

ফিফ্থ ফ্লোরে পৌছে ওরা নিজেদের ডিপার্টমেন্টের দিকে যাচ্ছিল। ক্যারেন জিজ্ঞাসা করল—"উইক-এন্ডে ফ্রি আছো? শনিবার সন্ধেবেলা?"

"এখনও পর্যন্ত কিছু নেই। কেন? কোথাও যাচ্ছ?

ক্যারেন হলওয়ের ডান দিকে ঘুরল।—"ভিলেজে যাব। ডেভিডের ছাত্ররা একটা নাটক করছে। লাঞ্চে কথা হবে।"

শনিবার ক্যারেন আর ওর বর ডেভিডের সঙ্গে শমীক গ্রেনিচ ভিলেজে গেল। ডেভিড নিউইর্য়ক ইউনিভার্সিটির ড্রামা ডির্পাটমেন্টে পড়ায়। অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর। ওর ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের লেখা নাটক করছে।

ছোট অডিটোরিয়াম। নিচু স্টেজ। পর্দা খোলা আছে। অন্ধকারে সেট দেখা যাচ্ছে। শমীকরা বসার পরে একটা ভারতীয় মেয়ে এসে বসলো। ক্যারেন আলাপ করিয়ে দিল—"আমার বন্ধু অ্যানা। এ হচ্ছে শমীক। আমার কোলিগ।"

মেয়েটি শুধু বলল—"হাই। চেয়ার থেকে উঠে কালো ওভার কোট খুলে দাঁড়াতেই শমীকের সঙ্গে চোখাচোখি হল। দীর্ঘ সুঠাম শরীর। জিন্সের ওপর স্লেট রং এর হাই-নেক সোয়েটার। কাঁধ পর্যন্ত লম্বা চুল। আই-মেকআপ আর কালচে লিপস্টিকে মুখখানা আকর্ষণীয় দেখাচ্ছে। শমীক চোখ সরিয়ে নেওয়ার মুহূর্তে মেয়েটি জিজ্ঞাসা করল—"আপনার পাশের সিটে কেউ আসবে?"

শমীক বলল—"জানি না তো। আপনি বসবেন? তাহলে একটা সিট সরে যেতে পারি।"

—"সে জন্যে নয়। আমাদের কোটগুলো রাখা যেত। কেউ এলে সরিয়ে নেব।"

শমীক গম্ভীর হয়ে বলল—"আপনার কোটটা রেখে দিন। কিংবা সিটের পেছনে ঝুলিয়ে দিন। লোক আসছে মনে হচ্ছে।

মেয়েটি সিটের পেছনে কোটটা ঝুলিয়ে রেখে শমীকের পাশেই বসল। ডেভিডের জায়গায়। ডেভিড দূরে কার সঙ্গে কথা বলছিল। ফিরে এসে ক্যারেনের ওপাশে বসল। ঝুঁকে পড়ে শমীককে বলল—"শমীক, অ্যানা ভাল কবিতা লেখে। ওর কবিতার থিম নিয়েই আজকের নাটক।"

শমীক এ দেশে অ্যানা বলে কোনও ভারতীয় কবির নাম শোনেনি। ইদানীং চিত্রা ব্যানার্জি দিবাকারুণী বেশ নাম করেছে। আরও কেউ কেউ লিখছে। এ মেয়েটির পুরো নাম কি? চেহারা দেখে মনে হচ্ছে বাঙালিও হতে পারে।

শমীক আগ্রহ দেখাল—" ইনটেরেস্টিং। কবিতা নিয়ে নাটক? পোয়েট্রি ইন্ মোশন।"

ডেভিড রসিকতার ভঙ্গিতে হাত ঘুরিয়ে দেখাল পোয়েট্রি ইন অ্যাকশন।

অ্যানা এত গম্ভীর কেন কে জানে? শমীকের কথার উত্তরে শুধু বলল—"দেখি, এরা কীভাবে করে।"

—"কেন, স্ক্রিপ্ট্ দেখে নেননি?"

—"ডেভিড দেখেছে।"

শমীক প্লে-বিল্ এ নাটকের নাম দেখেছে। "প্রমিসেস্ প্রমিসেস্।" আর একবার খুলে দেখার আগে হলের আলো নিভে গেল।

আবহসঙ্গীত শুরু হয়েছে। অন্ধকারে দুটি মানুষ এসে দাঁড়াল। ক্রমশ আলোর বৃত্তে তাদের মুখ দেখা গেল। বিয়ের পোশাকে একজন নারী, একজন পুরুষ। স্বগতোক্তির মতো শপথ উচ্চারণ করছে—"আই ডু প্রমিস্ অ্যান্ড কোভেন্যান্ট্ বিফোর গড্ অ্যান্ড দিজ উইট্নেসেস্ টু বি ইওর লাভিং হাজবেন্ড অর ওয়াইফ্ ইন্ সিক্‌নেস্ অ্যান্ড ইন্ হেলথ্, ইন্ প্লেন্‌টি অ্যান্ড ইন ওয়ান্ট্, ইন জয় অ্যান্ড ইন্ সরো, অ্যাজ লং অ্যাজ্ উই বোথ শ্যাল্ লিভ......।"

মাত্র দশ মিনিট বিরতি ছিল। নাটকটা নিয়ে শমীক প্রথম কথা তুলল—"আপনার কবিতার থিম্ আর নাটকটা কাছাকাছি গেছে?"

অ্যানা বলল—"থিম ঠিকই রেখেছে। নাটকের জন্যে কয়েকটা বাড়তি চরিত্র আর ঘটনা এনেছে।"

—"প্লে-বিল্ এ দেখছিলাম ঘটনা মেক্সিকোয় নিয়ে গেছে। আপনার কবিতায় নেই বোধহয়?"

—"মেক্সিকোর বদলে ইন্ডিয়াতেও নিয়ে যেতে পারত। আমার কবিতায় তাই ছিল। "

ডেভিড ওপাশ থেকে বলল—"ম্যারেজ ভাও এর সিন-টিনের জন্যে ক্রিশ্চান ব্যাক্‌গ্রাউন্ড এনেছে। এথ্‌নিসিটি বোঝাতে মেক্সিক্যান।"

শমীক ঠাট্টা করল—"তোমাদের কি ধারণা আমাদের হিন্দু ওয়েডিং-এ ম্যারেজ ভাও নেই?"

ডেভিড বলল—"থাকবেই তো। কিন্তু এরা থিমটা অ্যাড্যাপ্ট করেছে। সেভাবেই স্ক্রিপ্ট্ লিখেছে।"

ক্যারেন আজ একদম চুপচাপ। নাটক দেখে বেশ অভিভূত মনে হচ্ছে। ডেভিড বাইরে গেল। অ্যানা নিজে থেকে কথা বলছে না। কোলের ওপর হাত রেখে কিছু ভাবছে।

শমীক প্লে-বিল্ খুলে দেখেছে আর চারটে সিন্ বাকি। তখনই কবিতা আর কবির নাম দেখে নিয়েছে। "স্টেয়ার্স অফ্ থর্নস্" বাই অনন্যা দাশগুপ্ত। শমীক কখনও এর নাম শোনেনি।

অ্যানা হঠাৎই জিজ্ঞেস করল—"আপনি বাঙালি?"

শমীক হাসল—"আপনার পদবিও তাই বলছে।"

—"কেন চেহারা থেকে বোঝা যায় না?"

—"আন্দাজ করা যায়।"

ক্যারেন একেবারেই কথা বলছে না। শমীকের আজ ওকে অ্যানার মতোই গম্ভীর মনে হচ্ছে। মেয়েরা নাটক দেখে একটু বেশি অভিভূত হয়। হলের আলো নিভে আসছে। বিরতি শেষ হবার মুহূর্তে শমীক জিজ্ঞেস করল—"আপনি বাংলা জানেন?"

—"জানি। বলার সুযোগ হয় না।"

নাটকের দ্বিতীয় পর্বে দৃশ্যপট বদলে গেছে। কাহিনী শুরু হয়েছিল শিকাগোয়। এবার মেক্সিকোর একটি গ্রামের হাসপাতালের দৃশ্য। নাটকের শুরুতে যার বিয়ে দেখানো হয়েছিল, তার এখন মধ্য বয়স । পারকিন্‌সন্‌স সিনড্রোমে অসুস্থ। বিছানায় বসে আছেন। বুকের কাছে ধরা একটি ছবি। হাত কাঁপছে। মাথা কাঁপছে। শিথিল, অবশ শরীর।

তাঁর বৃদ্ধা মা ঘরে ঢুকলেন। হাতে খাবারের কৌটো। কাঁধের ব্যাগ নামিয়ে রেখে বললেন—"দেরি হয়ে গেল। সময়মতো বাস আসে না।" অসুস্থ মহিলার ক্ষীণ স্বর শোনা গেল—"রোজ রোজ কেন এত কষ্ট করে আসো।"

মা বললেন—" এই কষ্ট করেও যদি তোকে ভালো করতে পারতাম। বাড়ি নিয়ে যেতে পারতাম।" বৃদ্ধা তাঁর মেয়ের গালে কপালে চুম্বন করলেন। টেবিলে থালার ওপর খাবার সাজাতে গিয়ে তাঁর দীর্ঘশ্বাস পড়ল। মেয়ের কোলের কাছে ছবিটা পড়ে ছিল। মা খাবার খাওয়াতে গিয়ে দেখতে পেলেন। এক হাতে তুলে নিয়ে বললেন—"মেয়েকে দেখতে ইচ্ছে করছে? ফোন্ এলে বলব? একবার চলে আসতে বলব?"

মহিলার মাথা কাঁপছিল। দুই হাত কাঁপছিল। দু চোখে জলের ধারা। কথা বলতে চেষ্টা করছিলেন। অস্ফুট গোঙানির মতো শব্দ উঠে এল। অসহায়, রোগজীর্ণ দেহে প্রাণশক্তি ফুরিয়ে আসছে। মা তাঁর শীর্ণ হাত দুটি দিয়ে জড়িয়ে ধরে আছেন।

অন্ধকারে দৃশ্যান্তর হয়ে যাচ্ছে। শমীক ভাবছিল এরকম প্লট কি অ্যানার কবিতায় ছিল? গল্প, উপন্যাস তো নয়। যদিও গল্প বলার জন্যে একদিন শুধু কবিতাই ছিল।

শেষ দৃশ্য আবার আমেরিকা। শিকাগো নয়। সমুদ্রের ধারে অচেনা শহর। একটি ঘরের জানলা দিয়ে ভোরের আলো এসে পড়েছে। বিছানায় তন্দ্রাচ্ছন্ন যুবক যুবতী। দুটি শিশু রাতের পোশাক পরে ছুটে এল। হাতে মার জন্য আঁকা ছবি, চকলেট, মাটির ফুলদানিতে লুকিয়ে রাখা ফুলগাছ। তারা খাটে উঠে মায়ের গায়ের ওপর ঝুঁকে পড়ে ডাকছে—হ্যাপি মাদার্স ডে! আই লাভ ইউ মমি...

যুবতী উঠে বসেছে। যুবকের ঘুম ভেঙে গেছে। বিছানা জুড়ে শোরগোল। মায়ের বুকের কাছে দুটি শিশু। ছোট ছোট হাতে মার জন্যে উপহার। ছবি, ফুল, চকলেট। যুবতীর সদ্য ঘুম ভাঙা উজ্জ্বল প্রসন্ন মুখে হঠাৎই বেদনার ছাপ পড়ে। যুবক লক্ষ করে। হাতে হাত রাখে।

নাটক শেষ হয়ে আসছে। মঞ্চে একটি মাত্র চরিত্র। তার মুখে কয়েকটি সংলাপ। গভীর রাতে সেই যুবতী তার মায়ের ছবির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। মেক্সিকোর হাসপাতালে মা তার কবেই মারা গেছেন। তবু এই বিশেষ রাতে তাকে মনে পড়ে। সে মায়ের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করে। অশ্রুভারে অবরুদ্ধ, অনুতপ্ত কণ্ঠস্বর।

মা, আজ তোমার জীবনের বিনিময়ে বেঁচে আছি। শৈশব, কৈশোর, সবই যেন সমুদ্রতীরে বালির ওপর লেখা ছবি। কখনো ঢেউ এসে, কখনো ঝড় এসে মুছে দিয়ে গেছে।

তবু স্বপ্নে দেখি জ্যোৎস্নার রূপালী নীল ছায়া। সেই ছায়ায় ছায়ায় তোমার হাত ধরে পথ চলা। বুকের ভেতর বড় সঙ্গোপনে সেইসব রাত আসে, যায়।

মাগো, তোমার জন্যে বেঁচে আছি
শুধু তোমার জীবনের বিনিময়ে...
আ অ্যাম হিয়ার বিকজ অফ ইউ
আই সার্ভাইভড্ বিকজ অফ ইউ

স্টিল, দিস ইজ নো ওয়ে টু লিভ্
নো ওয়ে টু সার্ভাইভ...” ,

শমীকের মনে হল এই কথাগুলো কোথায় যেন পড়েছে। বিশেষ করে শেষের কয়েকটা লাইন। চেনা চেনা লাগছে। কোথায় পড়েছে?

নাটক শেষ হবার পর শমীক অ্যানাকে কিছু বলার আগেই ডেভিড ওকে স্টেজে নিয়ে গেল। দর্শকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। অ্যানার হাতে ফুলের তোড়া। সকলের অভিনন্দনের উত্তর সে সৌজন্যের হাসি হাসল। কয়েকবার বলল—“ধন্যবাদ, ধন্যবাদ।”

বাড়ি ফেরার সময় ডেভিড জিজ্ঞেস করল—“আজ কোথায় খেতে যাচ্ছি আমরা?”

ক্যারেন বলল—“পেনাং এ যেতে পারি। শমীক, তুমি মালয়েশিয়ান ফুড পছন্দ করো?”

শমীক বলল—“গেলেই হয়। এনি এশিয়ান ফুড ইজ্ ও.কে. উইথ মি।”

অ্যানাকে জিজ্ঞেস করতে সেও রাজি হয়ে গেল।

শমীকের পাশাপাশি অ্যানা চুপচাপ হেঁটে যাচ্ছিল। কালো লং কোটের ওপর দিয়ে গলায় স্কার্ফ জড়িয়ে নিয়েছে। কাঁধে ঝোলানো ব্যাগের চেইন্ এ হাত রেখে জুতোর খুটখাট শব্দ তুলে হাঁটছে। খোলা চুল শীতের হাওয়ায় এলোমেলো। এই মেয়েটির সঙ্গ শমীকের ভাল লাগছিল।

নাটক নিয়ে দু-চার কথার পর শমীক বলল—“আপনার কবিতা পড়িনি। কাদের পাব্লিকেশন?”

কানের ওপর থেকে চুল সরিয়ে নিয়ে অ্যানা বলল—“ইউনিভার্সিটি প্রেস্ থেকে পাব্লিশ করেছে।”

—“একটা কপি দেবেন। নাটকের যদি রিভিয়্যু করি, কাজে লাগবে। ”

অ্যানা ক্ষুণ্ণ হল—“নাটকের রিভিয়্যু করার জন্য কবিতা পড়বেন? কাজে লাগানোর জন্যে?

শমীক হেসে ফেলল—“না, না তা নয়। কবিতার জন্যেই চাইছি। আসলে আমার প্রফেশনটা এমন, দু কলম লেখার ব্যাপারটা এসে যায়।”

অ্যানা বলল—“ঠিকানা পেলে বই পাঠিয়ে দেব।”

পেনাং এ ডিনার শেষ হওয়ার আগে শমীক অ্যানাকে ওর বিজনেস কার্ড দিল। রেস্টোরেন্টটা ডাউনটাউনে। সোহো অঞ্চলে। অ্যানা ওদিকেই থাকে। ক্যারেনরা যাবে অন্যদিকে। শমীক বাড়ি ফেরার জন্যে ট্যাক্সি নিয়ে পথে অ্যানাকে নামিয়ে দিয়ে গেল। মনে মনে ওই চারটে লাইনের রহস্য উদ্ধার করে ফেলেছে। ক্যারেনের কবিবন্ধুর সঙ্গে শমীকের বোধহয় আবার দেখা হবে।

ক্রিসমাসের দিন অফিস ছুটি। আগের দিন পার্টি ছিল। শমীক অনেক রাতে ফিরেছে। সকালে ফোনের আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল।

বহুদিন পরে সুদেষ্ণার গলা। বলল—“কী খবর? ভাল আছো? নিজে থেকেই কল্ করলাম।”

শমীক বলল—“কেন? মেসেজ পাওনি? নীল একদিন আসবে বলেছিল , কী হল?”

সুদেষ্ণা সে কথার উত্তর দিল না। জিজ্ঞেস করল—“ক্রিসমাসের ছুটির মধ্যে একদিন আসতে পারবে?”

—“আমার শুধু আজকেই ছুটি আছে। কেন বলো তো?” কিছু হেল্প দরকার?”

—"বাড়িটা সেল্ এ দিয়েছিলাম। বিক্রি হয়ে গেছে। তোমার জিনিসপত্র এখনও পড়ে আছে। এসে নিয়ে যাও।"

শমীক অবাক হল—"বাড়ি বিক্রি করে দিচ্ছ? নীল কলেজে যাওয়ার আগেই? কোথায় মুভ করছ?"

"কাছেই। টাউন হাউসে চলে যাচ্ছি। বাড়ি আর মেইনটেন্ করতে পারছি না।"

শমীক বুঝতে পারছিল সুদেষ্ণা তার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে। ক্রিসমাসের সময় পুরনো বছরগুলোর কথা মনে পড়ছে। শমীক বলল—"আজ একবার যাওয়ার চেষ্টা করতে পারি। তবে ক্রিসমাসের দিন বাস-টাস্ কখন কী পাব জানি না। তোমাদের ওখানে স্নো পড়ছে না?"

—"সেরকম নয়। সন্ধেবেলায় আসবে? এখানে ডিনার কোরো।"

—"ডিনারের সময় পাব না। সন্ধের মধ্যে ফিরে আসতে হবে।"

সুদেষ্ণা বলল — "আজ তো অফিস বন্ধ।"

শমীক স্পষ্টই বলে দিলো — "না অতক্ষণ থাকা যাবে না। সন্ধ্যেবেলা অন্য প্রোগ্রাম আছে।"

সুদেষ্ণা চুপ করে থাকল। শমীক ভাবছিল আজ যাওয়াই মুশকিল। কতক্ষণে বাস পাবে, কতক্ষণে ফিরতে পারবে। তাও জিজ্ঞেস করল—"কী করব? আজ যাব? না, পরে একদিন গিয়ে তোমাকে হেলপ্ করে আসব?"

সুদেষ্ণা বলল—"ছেড়ে দাও। যদি পারি ডরোথির গ্যারাজে রেখে যাব। কিংবা ফেলেও দিতে পারি। পুরনো সুটকেস ভর্তি হাবিজাবি জিনিস। দোতলা থেকে টেনে নামাবো কি করে জানি না।"

শমীকের খারাপ লাগছিল। অপ্রস্তুত হয়ে বলল—"কাজটা করে আসা উচিত ছিল। তাড়াহুড়োয় খেয়াল করিনি সুদেষ্ণা।"

সুদেষ্ণা হাসল—" তা নয়। আসলে মায়া। মনে হয় একদিন কাজে লাগবে। শেষ পর্যন্ত সেই ফেলে দিতেই হয়। তোমার তো শুধু একটা সুটকেস। আমি কত কী ফেলে যাচ্ছি ভাব?"

শমীক আবার বলল—"মুভিং এর সময় দরকার হলে ডেকো। চলে আসব।"

ফোন্ রাখার আগে সুদেষ্ণা হঠাৎ জিজ্ঞেস করল—"তোমার গার্লফ্রেন্ড কি আমেরিকান?"

শমীক অবাক—"এ খবরটা কে দিল?"

—"কেউ নয়। আমি জিজ্ঞেস করছি। "

অন্য লাইনে শমীকের একটা ফোন এল। সুদেষ্ণা আর অপেক্ষা করল না। ফোন্ রেখে দিল।

সন্ধের সময় সাব-ওয়ে নিয়ে শমীক ডাউনটাউনে গেল। নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটির কাছাকাছি অ্যানার অ্যাপার্টমেন্ট। ক্রিসমাসে কলেজ বন্ধ। ছাত্রছাত্রীরা বাড়ি গেছে। অন্যদিনের মতো রাস্তাঘাটে তেমন ভিড় নেই। ক্রিসমাসের দিন সাবার্ব-এ রেস্তোরাঁগুলো বেশিরভাগ বন্ধ থাকে। এদিকে সোহোর কাছাকাছি কয়েকটা খোলা আছে। আজ অ্যানার বাড়িতে পার্টি না থাকলে শমীক ওকে নিয়ে এখানে ডিনারে আসতে পারত।

টোয়েন্টি থার্ড স্ট্রিটে অ্যানার অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছে শমীক দেখল অনেকেই এসে গেছে। অ্যানা কিচেনে ছিল। শমীককে দেখে লিভিং রুমে এল। আলগাভাবে জড়িয়ে ধরে বলল— "মেরি ক্রিসমাস।" ডোর বেল বাজল। অ্যানা শমীকের হাত ছেড়ে দিয়ে দরজার দিকে গেল। তারপর থেকে সারাক্ষণ ব্যস্ত।

রাতে নিজের অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে শমীক অ্যানার দেওয়া ক্রিসমাস গিফ্‌টের মোড়ক খুললো। একটা কোলনের বাক্স। র‍্যালফ্ লরেনের সাফারি। অন্য মোড়কে বই।" স্টেয়ার্স অফ্ থর্ন্‌স্" কেন মেইল করেনি বোঝা গেল। ভেতরে লিখেছে—'টু আ ফ্রেন্ড অ্যান্ড ক্রিটিক.....নীচে ছোটদের বাংলা হাতের লেখার মতো নাম সই করা—অনন্যা দাশগুপ্ত। শমীক কবিতাটি খুঁজে পেল।"

এপ্রিলের শেষে বসন্ত এল। অ্যানা ঘরের জানলা খুলে দিয়েছে। ছোট্ট বারান্দায় সারি সারি গাছ। পাম্ রাবার প্লান্ট, অ্যাফ্রিকান ভায়লেট, পিটুনিয়া, জিরেনিয়াম্। রোজ রোজ ফুল ফুটছে। সারা শীত ঘরে বন্দী থেকে এতদিন পরে আবার আকাশ, রোদ, বৃষ্টি, বসন্তের হাওয়া। শমীক এ শহরে নতুন ঘাসের গন্ধ পায় না, পেভ্‌মেন্টের বুকে একা একা দাঁড়িয়ে থাকা গাছ। কবে তাদের পাতা ঝরল, কবেই বা নতুন পাতা এল, ধরা যায় না। শুধু যখন অ্যানার কাছে আসে, এই ছোট্ট বারান্দায় সারি সারি গাছ হাওয়ার মাথা দুলিয়ে বসন্তের খবর দেয়।

এই পরিপার্শ্ব কেমন এক প্রভাব সৃষ্টি করে। শমীক অ্যানার কাছে জীবনের গল্প শোনে। গল্প বলে। পরস্পরের কাছে স্বীকারোক্তির মতো এক দায়বদ্ধতা অনুভব করে। অ্যানা বলে নিজের মার কথা — "শমীক জানো, মার সবচেয়ে চিন্তা ছিল বইগুলো নিয়ে। স্টাডি ভর্তি বাংলা বই। কবিতার সারিতে কবিতা সাজাতে সাজাতে মা একদিন বলেছিলেন এত সব বই কী হবে? আমাদের পরে কেউ তো আর পড়বে না। বাবার একটাই উত্তর। যদি দেশে ফিরে যাই, সঙ্গে নিয়ে যাব। আমি চুপ। কোনও রকমে বাংলা লিখতে পড়তে পারি। তা বলে মোটা মোটা বই পড়ার ক্ষমতা নেই। মার এত বইপত্র, গল্প, কবিতা সঙ্গে নিয়ে বড় হয়ে কোথায় যাব? কোথায়ই বা রাখব? এ বাড়িতে তো চিরকাল থাকব না। বড়জোর স্কুলের কটা বছর। বইগুলো ডোনেট করার কথাও বলা যাবে না। বেশিরভাগ সিগ্‌নেচর কপি। ফেমাস্ বেঙ্গলি অথরদের দেওয়া। এই সেদিনই মা আমাকে সরু মতো একটা বই খুলে দেখিয়েছেন। তস্‌লিমা নাসরিনের সই করা বই। ঐ কন্ট্রোভার্শিয়াল্ মহিলার কথা নিউইয়র্ক টাইমসে পড়েছিলাম। মা অবশ্য ওঁকে দেখেননি। তাও বলছিলেন—"সিগ্‌নেচরের জায়গাটা পড়ে দ্যাখ।" আমি ছাপা লেখা পড়তে পারি। হাতের লেখা ঠিকমতো বুঝতে পারি না। ভুরু কুঁচকে আছি দেখে মা নিজেই পড়ে দিলেন—"সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধা এবং শ্রদ্ধা সহ তস্‌লিমা নাসরিন।" আমি হেসে উঠলাম। তোমাকে তো দেয়নি। মা বললেন না দিলেই বা কি? সুনীল গাঙ্গুলিকে দিয়েছে। উনি আমাকে দিয়েছেন।

শুধু বই নয়, বাড়ির অনেক জিনিস নিয়েই মার চিন্তা শুরু হল। আমাকে দেখলে আরও বেশি বেশি করে বলতেন। ক্লসেট্ খুলে ডাকতেন। হ্যাঙারে ঝোলানো শাড়িগুলো দেখিয়ে বলতেন—"এগুলো কোনোদিন পরবি না? কতো আর দেশে বয়ে বয়ে নিয়ে যাব। বাবা বলতেন দান করে দাও। তোমাদের জামাকাপড়ে ক্লসেট ভর্তি। আমার কিছু আঁটেনা।

অথচ তখন মার অসুখের কথা জানিও না। মা যে ভেতরে ভেতরে এতরকম অসুখ বাধিয়েছেন বুঝতেই পারিনি। মাঝে মাঝে হাত কাঁপত। বাবা বলতেন নার্ভাসনেস। সব

ব্যাপারে থতমত খাওয়া স্বভাব। আসলে পারকিন্‌সন বোঝার আগেই মার ওভেরিয়ান ক্যান্‌সার ধরা পড়ল।

শমীক শুনছিল মন দিয়ে। জিজ্ঞেস করল-"তোমার মার তখন কী রকম বয়স?"

—"ফর্টি ওয়ান।"

—"চেক-আপ করাতেন না?"

—"ওভারিয়ান ক্যান্‌সার প্যাপ্‌-টেস্ট এ ধরা পড়ে না। তখন অত স্পেসিফিক টেস্টও করা হত না। যখন ধরা পড়ল, লিমফ্‌-নোড্‌স্‌ এ ছড়িয়ে গেছে।"

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে অ্যানা শমীককে বলল—"এতো পার্সোনাল স্টোরি শোনার ধৈর্য আছে তোমার?"

শমীক বলল—"ধৈর্যের অভাব লক্ষ করছো নাকি?"

—"না তা নয়। তবে, শুধু নিজেদের কথাই বলে যাচ্ছি তো।"

শমীক বলল—"তুমি সেদিন বলেছিলে লোকেরা আজকাল চিঠি লেখে না বলে কবির সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। মনের কথা লেখার লোক না পেয়ে পাঠকদের ধরছে। ধরো আমি তোমার সেই পাঠক। শুধু সামনে বসে আছি।"

অ্যানা জানলার বাইরে চেয়ে ছিল। এক সময় শমীকের দিকে মুখ ফেরাল—"মার কথা ভাবলে আমার শুধু দুঃখ হয় না শমীক। বুকের ভেতর থেকে তীব্র ঘৃণা আর লজ্জা উঠে আসে। নিজের কাছে এত ছোট হয়ে বেঁচে থাকা, এ যে কী কষ্ট তুমি বুঝতে পারবে না।"

অ্যানার গলার স্বর কান্নায় বুজে আসছিল। শমীক ওকে স্থির হতে সময় দিল। এ অবস্থায় কীই বা বলা যায়? অ্যানার মার পরিণতি যদি সত্যিই ঐ নাটকের মতো হয়ে থাকে শমীক কি ঘটনাটা অনুমান করতে পারছে না? অ্যানার কথায় সেই মেয়েটির সংলাপ শুনছে না? কিন্তু শমীক তো এখন নাটক দেখছে না। ওর পক্ষে নীরব দর্শকের ভূমিকায় বসে থাকা সহজ হল না। শমীক অ্যানার পাশে এসে বসল। ওর হাত নিজের হাতে ধরে রেখে বলল—"আজ তোমার এসব কথা মনে হচ্ছে কেন জানো? বোঝার বয়স হয়েছে বলে। আসলে একটা সময় আমরা হঠাৎ স্বার্থপর হয়ে যাই। তখন নিজেকে ছাড়া কারুর কথা ভাবতে চাই না। তাছাড়া তোমার তো তখন ডিসিশন নেওয়ার ক্ষমতাও ছিল না।"

অ্যানা ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল—"না শমীক, ওভাবে আমি নিজেকে বোঝাতে পারি না। আমার তখন ষোলো বছর বয়স। দু বছর পরে কলেজে যাব। মার জন্যে আমি কতটুকু ভেবেছি? কী ত্যাগ স্বীকার করেছি? সার্জারির পরে কেমো শুরু হল। মার কষ্ট দেখা যায় না। বমি, জ্বর, সর্বাঙ্গে যন্ত্রণা। ছ মাস চিকিৎসার পরে যখন একটু স্বস্তি পেলেন, পারকিন্‌সন্‌স্ ধরা পড়ল। বাবা সব দিক সামলাতে পারছিলেন না। বাড়িতে সারাদিন কারুর থাকা দরকার। কিন্তু কে থাকবে? আমি ইলেভেনথ্‌ গ্রেডে। বাবার পক্ষেও ছুটি নিয়ে বসে থাকা সম্ভব নয়। মা ভীষণ ভেঙে পড়লেন। বুঝতে পারছিলেন ক্রমশই সংসারের বোঝা হয়ে উঠেছেন।

যখন টুয়েল্‌ভথ গ্রেডে উঠলাম, বাবা একটা ডিসিশনে এলেন। মাকে এ দেশে রাখবেন না। ইন্ডিয়ায় পাঠিয়ে দেবেন। প্রথমে বিশ্বাস করতে পারিনি। যতই অসুস্থ হন, এটাই মার নিজের জায়গা। নিজের বাড়ি। মা কোথায় যাবেন? কেন যাবেন?

বাবা বোঝালেন-তুমি কমাস বাদে কলেজে চলে যাবে। চার বছর বাড়িতে থাকবে না।

আমাকে তো চাকরিটা রাখতে হবে অ্যানা। কার ভরসায় ওকে বাড়িতে রাখব? আমি বলেছিলাম ইন্ডিয়া থেকে কাউকে আনা যায় না? বাবা বললেন—"কে আসবে? এটা লং টার্ম ব্যাপার"—"কেন? লোকে হাউসকিপার, বেবি সীটার আনাচ্ছে না? বাবা রেগে উঠলেন—"তোমার মাকে হ্যান্ডেল করা আমাদের পক্ষেই শক্ত হয়ে দাঁড়াচ্ছে। দেশ থেকে হাউসকিপার আনলেও থাকবে ভেবেছ? আমি বাবার কথা মানতে পারছিলাম না। রেগে গিয়ে তর্ক শুরু করে বললাম—"নিশ্চয়ই আরও উপায় আছে। মাকে তো এখানেই নার্সিং হোমে রাখা যায়। আমার ছুটির সময় বাড়িতে নিয়ে আসব।

বাবা বোঝালেন—"মেডিকেল ইনসিওরেন্স থেকে অত খরচ দেবে না। আমি অনেক দিকে খোঁজ খবর নিয়েছি।

আমি গুম হয়ে আছি দেখে বাবা বলতে লাগলেন—"চার বছর তোমাকে কলেজে পড়তে হবে। অলমোস্ট এইটি থাউসেন্ড ডলার্স । দিন দিন টিউশন আরও বেড়ে যাচ্ছে। আমাকে তার প্রভিশন রাখতে হচ্ছে। তাছাড়া তোমার মার লং টার্ম কেয়ারের জন্যে ইন্ডিয়াতেও ভাল ব্যবস্থা করছি।"

—"মা কোথায় থাকবে?"

"কোলকাতার কাছেই। একটা প্রাইভেট নার্সিং হোমে। তোমার দিদিমা, মামাটামারা দেখাশোনা করবে। খোঁজখবর নেবে। আমরাও যাব মাঝে মাঝে।"

বুঝতে পারলাম বাবা তার মানে ভেতরে ভেতরে ব্যবস্থা করে ফেলেছেন। মামার বাড়িতেও জানে। কিন্তু মা? মা কী করে থাকবেন? আমাকে ছেড়ে, বাবাকে ছেড়ে বাকি জীবনটা দেশের নার্সিংহোমে কাটবেন? একথা আমরা মাকে বলব কী করে?

মাকে বাবাই বললেন।

সেই দিনটা ভুলতে পারব না শমীক। মার চোখে অবিশ্বাস, ভয়; সেই অসহায়, ভয়ার্ত দৃষ্টি, নিঃশব্দ দহনে আমরা যেন পুড়ে যাচ্ছিলাম। যে মা আগে বলতেন চিরদিন বিদেশে থাকব না, সেই মা দেশে যাওয়ার কথায় অসহায়ভাবে প্রতিবাদ করার চেষ্টা করলেন। দিনের পর দিন বাবা বুঝিয়েছেন। আমি চেষ্টা করেছি। মা বুঝতে চাননি। কত বছর মা চাকরি করেছেন। বাবাকে সাহায্য করেছেন। এই বাড়িঘর সংসারে তাঁর তো একই অধিকার। আজ অসুস্থ অবস্থায় তাঁকে আমরা দূরে ঠেলে দিচ্ছি। নিষ্ঠুরতার সেই অভিযোগ অভিমান নিয়েই মা চলে যেতে বাধ্য হলেন।

শমীক জিজ্ঞেস করল-"তুমি সঙ্গে গিয়েছিলে?"

—"না, বাবা গিয়ে রেখে এলেন। যাবার আগের দিন বাবা জিনিসপত্র গোছাচ্ছিলেন। মা আমাকে ডাকলেন। দেয়ালে ঝোলানো ফ্যামিলি পিক্‌চার থেকে একটা ছবি চেয়ে নিলেন। মা আর আমার ছোটবেলার ছবি। বললেন—"এটা নিয়ে যাই? তোদের তো অনেক ছবি আছে।" কথাটা বুকে বাজলো। এ বাড়ির জিনিসপত্র এবার থেকে শুধু আমাদের। মার নয়। আমার ছবিও শুধু আমাদের। মার নয়। তাই একটা মাত্র চেয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলাম না। মাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছি। মা আদর করে বললেন—"আরও কটা বছর বাঁচব তো? তুই আবার নিয়ে আসবি। এখানেই কোথাও রেখে দিবি। তবু তো দেখতে পাব।"

সেদিন মনে হয়েছিল মা আমাকে ক্ষমা করেছেন। ভেবেছেন আমার তো কোনও ক্ষমতা

নেই। বাবার ওপর কথা বলতে পারছি না। জানো, মা বোঝেননি আমি তখন নিজের কেরিয়ারের কথা ভাবছি। কর্ণেল-এ অ্যাড্‌মিশন পেয়েছি। ইউ-পেন্ এ পেয়েছি। কলম্বিয়ার চিঠির অপেক্ষা করছি। আইভি-লিগে পড়ব। বাবাকেই চার বছর পড়াতে হবে। আমার ভবিষ্যতের কথা ভেবেই বাবাকে এমন একটা ডিসিশন নিতে হয়েছে। বাবার নিজের জীবনেই বা কি থাকল?

সেদিন এই ভাবেই আমি মনকে বুঝিয়েছিলাম শমীক।

—"মার সঙ্গে তোমার আর দেখা হয়নি।"

—"হয়েছিল। পরের বছর সামারে গিয়েছিলাম। মার অবস্থা দেখলাম আরও খারাপ। এ অসুখে শেষের দিকে যা হয়। কয়েক বছর ধরেই তো শুরু হয়েছিল। রেস্টিং মাস্‌ল্‌স্ এ ট্রেমর। ভীষণ উইক-নেস্। নার্ভ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সেবার গিয়ে দেখলাম আরও ডি-জেনারেট করেছে। মা কথা বলতে পারছেন না। দু চোখ দিয়ে শুধু জল পড়ছে।

সবচেয়ে কষ্ট হচ্ছিল জায়গাটা দেখে। নার্সিং হোম্ বলতে যা ভেবেছিলাম তা নয়। ঘিঞ্জি এলাকায় একটা বাড়ি। ঘরে ঘরে কজন ডিস্‌এবল্‌ড্ রুগী। অ্যাটেনডেন্টরা দেখাশোনা করে। মাঝে মাঝে ডাক্তাব আসেন। ট্রেণ্ড নার্সও নেই। যাঁর ব্যবসা সেই মহিলাই বললেন—অল্প খরচে এর চেয়ে ভাল ব্যবস্থা করা যায় না।

ভাবছিলাম বাবা কী করে এ জায়গাটা খুঁজে পেলেন? কেউ নিশ্চয়ই খবর দিয়েছিল। বাবা পরে বলেছিলেন মামার বাড়ির কাছাকাছি বলে ওখানে রেখেছিলাম।

-"ওঁরাই দেখাশোনা করতেন বোধহয়?"

অ্যানা বলল-"মামার বাড়ি বলতে দিদিমা আর দুই মামার ফ্যামিলি। কলকাতায় এক মাসী। হ্যাঁ, ওঁরাই দেখাশোনা করতেন। সেদিক থেকে জায়গাটা খুব দূর ছিল না। কিন্তু কী নোংরা রাস্তাঘাট ভাবতে পারবে না। বাজারের গোলমাল। বাসের আওয়াজ। একতলায় মার ঘরটায় ঢুকলে দম বন্ধ হয়ে আসে। দিনের বেলাও মাকে মশারির মধ্যে শুইয়ে রেখেছে।"

শমীক, আমার মনে হল এটা পাপ। তিল তিল করে আমবা একটা মানুষকে মেরে ফেল্‌ছি।

দিদিমা যখন বললেন তোদের বড়লোকের দেশে মানুষ এত নিষ্ঠুর হয়? মা, বউ এর অসুখ করলে বাড়ি থেকে বার করে দেয়? দ্যাখে না? তখন বাবার পক্ষ নিয়ে একটা কথাও বলিনি। মাথার মধ্যে কেবলই ঐ পাপ কথাটা ঘুরে ফিরে আসছিল। মাকে আমরা কত কষ্ট দিলাম।

শমীক বলল-"মা কতদিন বেঁচেছিলেন?"

তারপর আর বছরখানেক।

-" তোমার বাবার দিকের আত্মীয়স্বজন?"

-"বাবার বাড়ি নর্থ বিহারে। পূর্ণিয়ায়। কলকাতায় বিশেষ কেউ নেই। যাঁরা আছেন, তাঁরা মাঝে মধ্যে মাকে দেখতে যেতেন।"

-"তোমার সঙ্গে আত্মীয়দের কনট্যাক্ট্ আছে?"

-"খুব কম। ইণ্ডিয়ায় আর যাওয়া হয় না।"

-"এদেশে কেউ নেই।"

-"মার এক কাজিন্ আছেন। আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন না। ঐ সময় বাবার সঙ্গে

একটা রিফট্ হয়ে গেছে। হয়তো ওঁকে চেনো। সাউথ্ ইস্ট এশিয়ান উইমেনস গ্রুপে কাজ করেন। বৃন্দা সেন।"

আসলে বাঙালি কমিউনিটিতে মার ব্যাপারটা নিয়ে অনেক কথা উঠেছিল। দু-চারজন বাবার অবস্থাটা বুঝতে চেষ্টা করতেন। কিন্তু বেশিরভাগই বাবার বিরুদ্ধে। সমালোচনার কথা আমাদের কানেও আসত। বৃন্দামাসী বাবাকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত ওঁদের উইমেনস গ্রুপ মার কাছে এল। ওঁরা বললেন-মা যদি ডিভোর্স ফাইল করতে চান ওঁরা লিগ্যাল অ্যাসিস্টেন্স দেবেন। সব রকম সাপোর্ট দেবেন।

শমীক বলল-"ডিভোর্স পেলেও বা কি সলিউশন হতো?"

অ্যানা বলল-"বাবা তাহলে মাকে বাড়ি থেকে সরাতে পারতেন না। লিগ্যালি তো তা পারেন না, না? তখন বাবাকেই বাড়ি ছেড়ে আলাদা থাকতে হত। মাসে মাসে অ্যালিমনি দিতে হত। মাকে দেখাশোনার জন্যে অবশ্য কে কী ব্যবস্থা করতে পারত জানি না।"

শমীক জিজ্ঞেস করল-"মা ডিভোর্স ফাইল্ করতে রাজি হলেন না?"

-"না। অত স্ট্রেস নেওয়ার মতো ক্ষমতা ছিল না। আমার কথাও ভেবেছিলেন। আমার কেরিয়ারের জন্য মাকেই সবচেয়ে বেশি দাম দিতে হল। বাবাও সেটাই প্রায়রিটি দিয়েছিলেন।"

শমীক বলল-"একটা কথা জিজ্ঞেস করব?"

-"কী? বলো।"

-"এ দেশে এত লোক স্টুডেন্ট লোন নিয়ে পড়ে। তোমার বাবা কেন কলেজলোন্ নিয়ে পড়ালেন না। পে-ব্যাক্ করার জন্যে তুমি কত বছর সময় পেতে।"

-"জানি না। প্রত্যেক ব্যপারে বাবা নিজে ডিসিশন নিয়েছিলেন। বন্ধু, বান্ধব কারুর অ্যাড্ভাইস নেননি। আঠারো বছর বয়সে আমিও ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি। আজ যে এত কষ্ট পাচ্ছি, সে তো এই জন্যেই। যত দিন যাচ্ছে, বুঝতে পারছি। সলিউশন ছিল। বাবা খুঁজে পাননি। কিংবা খুঁজতে চাননি।"

-"তোমার বাবা এখন কোথায়?"

অ্যানা ম্লান হাসল—"আছেন। লং আয়ল্যাণ্ডের ঐ বাড়িতেই। মার ছবি, বইটই-এর ধুলো ঝাড়েন। বিবেকও পরিষ্কার। এখনও মনে করেন যা করেছেন ঐ অবস্থায় তার বেশি কিছু করার ছিল না।"

শমীক অ্যানার বাড়ি থেকে ফেরার পর কদিন একদম সময় পেল না। সুখমিন্দর, যস্পাল মার্ডার কেসের ট্রায়াল শেষ হয়েছে। ওদিকে নিউইয়র্কের মেয়রের অফিসের সামনে ট্যাক্সিওলাদের ডেমন্স্ট্রেশন। রাশিয়ান আর ইস্ট ইওরোপিয়ান ড্রাইভারদের সঙ্গে ইণ্ডিয়ান, পাকিস্তান, বাংলাদেশি ট্যাক্সিওয়ালারা ডেমন্‌ট্রেশন দিচ্ছে। ম্যান্‌হ্যাটনের হট্‌ডগ, হ্যাম্‌বার্গার ভেণ্ডারদের আন্দোলনেও ইণ্ডিয়ানরা আছে। শমীকদু/তিনটে স্টোরি নিয়ে ব্যস্ত। তার মধ্যে তেলুগু অ্যাসোসিশন চিঠি ছেড়েছে। অ্যানুয়াল কনফারেন্স। শমীক ওটা ট্রেসির ঘাড়ে চাপাবে। ট্রেসি পয়সা খরচ করে ম্যাড্রাস গার্ডেনে দোসা খেতে যায়। তার বদলে একবেলা তেলেগু কনফারেন্স যাক। দু'ঘন্টা অ্যাটেণ্ড করে ব্রোশিওর থেকে জিস্ট্ দেখে নিক। সেই তো এক কথা। হেরিটেজ, ডাইভারসিটি, মিলেনিয়ম অ্যান্ড ভিশন্। কমিউনিটির দুটো ডাক্তারকে সাইটেশন দেবে। ইণ্ডিয়া থেকে একজন মন্ত্রী এসে সব এন. আর. আই. কে

ইণ্ডিয়ার সত্যিকারের অ্যাম্ব্যাসাডর বলবে। একটু ইনভেস্ট করতে বলবে। তারপর ভায়োলিন। তারপর কুচিপুড়ি। ভেজিটেরিয়ান ডিনার। ট্রেসি চলে যাক। দেখেশুনে লিখুক। এথনিক স্টোরি মানেই শমীককে ছুটতে হবে তার কোনও মানে নেই।

শমীককিছুদিন ছুটি নেবে ভাবছে। গত বছর দেশে যাওয়া হয়নি। মাকে ফোন্ করলে আগে বাবা অনেক কথা বলবেন। শেষে মাকে দেবেন। মা দু'চার কথার পরেই বলবেন-কবে আসবি? ইদানীং মা বোধহয় শমীকের বিয়েটিয়ের কথা ভাবছেন। সুদেষ্ণার বাড়ি থেকে চলে এসে শমীক বাবা-মাকেই সবচেয়ে স্বস্তি দিয়েছে। আজকাল যে লোকে অন্যের খবর টবর নিয়ে তেমন মাথা ঘামায় তা নয়। আসলে সময়ের টানাটানি। তাও টুকটাক চালিয়ে যায়। পাড়া থেকেএকটা ছেলে বোস্টনে তবলা বাজাতে এসেছিল। পরে নিউইয়র্কে এল। সে বলল শমীক যে সুদেষ্ণাকে "ছেড়ে দিয়েছে"- সে খবর নিউ জার্সির কোন্ চন্দ্রাবলী গিয়ে দিয়ে এসেছে। মার অবশ্য সন্দেহ ছিল। শমীক নিউইয়র্কে এসে নতুন ঠিকানা, ফোন্ নাম্বার দিতে এখন নিশ্চিন্ত। দেশে যাওয়া মানে ডিসেম্বরের আগে হয়ে উঠবে না। ক্রিসমাসের সঙ্গে দু'সপ্তাহ নিয়ে নেবে। কিন্তু এখন একটা ব্রেক দরকার। শমীক দু-চারদিন ছুটি নিতে চায়।

শুক্রবার অ্যানার ফ্যাকালটি মিটিং ছিল। লাঞ্চের পরে দুটো ক্লাস নিয়ে বাড়ি ফিরল। প্যাকিং করতে আধ ঘণ্টা। শমীক ওকে বাড়ি থেকে তুলে নেবে। শেষ অবধি নিউ হ্যাম্পাশায়ার যাওয়াই ঠিক হল। শমীক গাড়ি রেন্ট করে নিয়েছে। সোমবার অ্যানার অফ-ডে। শমীক ছুটি নিয়েছে।

উইক এণ্ডের ট্র্যাফিক পার হয়ে ওরা যখন হাইওয়ে ধরল, তখনও বিকেলের আলো ছিল। পথে একবার থামল। নিউ হ্যাম্প্‌শায়ার পৌঁছতে অনেক রাত হয়ে গেল।

পরদিন ভোরবেলা অ্যানার ঘুম ভাঙল। নতুন জায়গায় ঘুম আসতে দেরি হয়েছে। ভাঙলও তাড়াতাড়ি। ঘড়িতে মাত্র পাঁচটা কুড়ি। অ্যানা উঠে পর্দা সরাল। চারদিকে পাহাড়। দূরে জ্যোতির্বলয়ের মতো আলো ফুটে উঠেছে।

অ্যানা বিছানায় ফিরে এল। ঘুম আর হবে না। একটু পরে উঠে স্নান সেরে নেবে। শমীক সাড়ে আটটায় তৈরি থাকতে বলেছে। বিছানায় শুয়ে অ্যানা ঘরের ভেতরটা দেখছিল। হোটেলটা বেশ পুরনো। কান্ট্রি-হাউস ছিল বোধহয়। অ্যান্টিক ফার্নিচার দিয়ে সাজিয়েছে। উঁচু ফোর-পোস্টার বেড। খাটের নীচে ছোট্ট কাঠের সিঁড়ি। মাথার ওপর গোটানো মশারির মতো ঝালর। মামার বাড়ির ঘরটা মনে পড়ল। দিদিমার উঁচু খাট। মাথার দিকে ঝাপসা হয়ে আসা আয়না। শক্ত পাশবালিস। ছোটবেলায় ইণ্ডিয়ায় গিয়ে মার সঙ্গে ঐ উঁচু খাটটায় শুতো। অ্যানা পড়ে যাবে বলে মা ওকে দেওয়ালের দিকে দিতেন। সেই ঘর, সেই বিছানা ওর স্মৃতি থেকে উঠে এল। মা সব কিছু সঙ্গে নিয়ে গেছেন।

ব্রেকফাস্টের পরে ওদের বেরনোর কথা, শমীক নিজের ঘরে থেকে ফোন-এ তাড়া দিল-

-"তোমার কতদূর? তাড়াতাড়ি রেডি হও। নীচে ব্রেকফাস্ট সেরে বেরিয়ে পড়ব।"

-"লস্ট-রিভারেই যাচ্ছি তাহলে?"

-"কাল তো তাই ঠিক হল। ম্যাপ-ট্যাপ্ দেখে রাখলাম।"

-"ঠিক আছে। আমি অল্‌মোস্ট রেডি। পাঁচ-দশ মিনিটের মধ্যে আসছি।"

হোটেলে থেকে প্রায় এক ঘণ্টার পথ। পাহাড়ের ধারে গাড়ি রেখে ওরা হাঁটতে লাগল। হারানো নদীর খোঁজে রেইন-ফরেস্টের ভেতর দিয়ে যাবে। কোনকালে এক পাহাড়ি নদী

এখানে এসে সমতলের পথ হারিয়েছিল। বনের সুঁড়ি পথ ধরে নতুন পাহাড়ের গর্তে নেমে গেছে। অন্ধকারে সুড়ঙ্গে চলতে চলতে তার ছলছল শব্দ শোনা যায়। নদীকে দেখা যায় না। পাথরের দেওয়ালের আড়ালে ফার্নের জঙ্গলে শ্যাওলা ধরা পথ ধরে নদী চলেছে। পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে পাথরের সিঁড়ি নেমে গেছে। দুদিকে ঘন সবুজ অন্ধকার। হারানো নদীর খোঁজে ওরা সুড়ঙ্গ পার হয়ে চলেছে। মাথার ওপর পাহাড়ের ছাদ। দেওয়ালে ঝিরঝির করে জলের ধারা নামছে। পায়ের তলায় জল, মাটি। অ্যানার পা পিছলে যাচ্ছে। শমীকের হাত ধরল।

সুঁড়িপথ শেষ হয়ে এল। তখনও নদীর দেখা নেই। সামনে বিশাল পাথরের চাতাল। গাছপালার ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো আসছে। অনেক উঁচুতে নীল আকাশ। ওরা যেখানে দাঁড়িয়ে তার কাছাকাছি কোনও পথ নেই। দূর থেকে দেখছে অনেক নীচে পাহাড়ের খাঁজে ঝর্ণার মতো একটা সরু ধারা নেমেছে। শমীক বলে উঠল-"ঐ তো নদীটা! দেখতে পাচ্ছো?"

অ্যানা ঝুঁকে দেখল-"নদী? না ঝর্ণা?"

-"পাহাড়ে এসে ঝর্ণা হয়ে গেছে। চল নেমে যাই।"

অ্যানা তখনও ঝুঁকে পড়ে দেখছে-'অত নীচে যাব কী করে?"

-"ঐ তো দূরের কাঠের সিঁড়ি দেখতে পাচ্ছি। এসো, আমার হাত ধরো।"

কাঠের ছোট্ট পুল পার হয়ে ওরা সিঁড়ি ধরে ধরে গভীর খাদের ভেতরে নেমে এল। গাছের ছায়ার অন্ধকারে হারানো নদী বয়ে চলেছে। নুড়ি পাথরের ওপর দিয়ে অবিস্তীর্ণ আঁকাবাঁকা পথ কোথায় চলেছে খাড়া পাহাড়ের থেকে দেখা যায় না।

জলের ধরে এসে অ্যানা যেন নিজেকেই বলল-"নদী তো হারায়নি। নিস্তব্ধ নিথর মুহূর্তে। শুধু জলের ছলছল শব্দ। শমীক অ্যানাকে জড়িয়ে ধরেছিল। অ্যানা মুখ ফেরাল। দীর্ঘ চুম্বনের মুহূর্তে ওর চোখের পাতা ভিজে যাচ্ছিল।

হোটেলে ফিরে এসে ডিনারের পর শমীক একবার নিজের ঘরে গেল। অ্যানা জিনস টি-শার্ট ছেড়ে স্নান করে রাতের পোশাক পরে নিল। ফ্লানেলের রোব্ জড়িয়ে জানালার পাশে এসে বসল। বাইরে ঘন অন্ধকার। দূরে পাহাড়ের অস্পষ্ট রূপরেখা। আকাশের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে অসংখ্য নক্ষত্রের দীপ। অ্যানা হারানো নদীর কথা ভাবছিল। পাহাড়ের অতলগর্ভে গভীর অন্ধকারে প্রবহমান সেই জলধারা কোথায় চলেছে? নদী কি সঞ্জীবিত করার মন্ত্র দেয়? বলে পথ আছে। পথ খুঁজে নাও। বেদনা থেকে আনন্দে, দুঃখ থেকে সুখে, বিচ্ছিন্নতা থেকে বন্ধনে ফেরার জন্যে পথ খুঁজে নাও।

দরজায় শব্দ হল। শমীক এসেছে। অ্যানা লক্ খুলে দিয়ে বিছানায় এসে বসল। ঘরে ঢুকে শমীক বলল-"কী ব্যাপার? ঘুমের জন্যে রেডি? এখন তো দশটাও বাজেনি।"

অ্যানা হাসল-"আমার তো সুবিধে! তোমার মতো হল্-ওয়ে দিয়ে হাঁটাহাঁটি করতে হচ্ছে না। একেবারে রাতের জামাকাপড় পরে নিলাম।"

-হ্যাঁ, তোমার সব দিকেই সুবিধে। জানলা খুললেই চাঁদ, তারা।"

-"কেন? তোমার জানলায় নেই?"

শমীক সোফায় পা উঁচিয়ে বসে বলল-"পাহাড় আর যাবে কোথায়? সঙ্গে অ্যাডেড ভিউ। পার্কিং লট, ম্যাকডন্যাল্ড, গ্যাস্ স্টেশন। যা যা চাও।"

অ্যানা হাসছে-"তার মানে ঘরটা বাজে দিয়েছে। চেঞ্জ করলে না কেন?"

-"করা উচিত ছিল। পাশের ঘরেও একটা লোক জুটেছে বটে। সারারাত ফ্ল্যাশের আওয়াজ।

ডায়াবেটিস্ না ডায়রিয়া ধরতে পারছি না। যাক গে। কালকে কী প্ল্যান বলো।"

-"ড্রাইভিং না হাইকিং। সেটা আগে ঠিক করো।"

শমীকের হাই উঠল—"আজ তো অনেক হাইকিং হল। তার চেয়ে মাউন্ট ওয়াশিংটনে চলো। গাড়ি নিয়ে দশ হাজার ফিট উঠে যাব।"

অ্যানা বলল—"কাল আমি চালাব। শেষের দিকটা ভীষণ স্টিপ্"

-"কেন আমার ড্রাইভিং স্কিলের ওপর ভরসা নেই?"

অ্যানা নিজের পায়ের পাতা টিপে ধরে বলল—"ব্যথা ব্যথা করছে। কম হাঁটনি আজ।"

শমীক বলল-"তাহলে কালকের ট্রিপটা বাদ দাও না। আবার তো সাত সকালে উঠতে হবে।"

অ্যানা সায় দিল-"না গেলেই হয়। তার চেয়ে এখানেই রিল্যাক্স করি।"

শমীক খুশি হল-"হ্যাঁ, ঘরে বসে গল্প করে কাটাই। আর তো একটা দিন।"

অ্যানা শমীকের কাছে এসে বসল। শরীরে স্নানের গন্ধ। সাবান শ্যাম্পু, পাউডারের গন্ধ মিলে মিশে স্নিগ্ধ পরিচ্ছন্ন সুবাস রেখে গেছে। অ্যানার ভেজা চুলে, কপালে, ঠোঁটে সেই ঘ্রাণ নিতে নিতে শমীক এক সময় বলল—"নিজের অনেক কথা তোমায় বলিনি অ্যানা। তুমি জানতে চাও না।"

অ্যানা মৃদু স্বরে উত্তর দিল-"পুরনো কথা জানা না জানায় আমার কিছু এসে যায় না।"

-"কেন তুমি কেয়ার কর না? আমি ভাল হই, খারাপ হই, তোমার কিছু এসে যায় না।"

অ্যানা শমীকের কাছ থেকে সরে এল-"তোমার এক্স গার্লফ্রেণ্ডকে বাদ দিয়ে যদি কোন কথা থাকে বলো। ঐ এপিসোড কিছু কিছু জানি। ক্যারেন বলেছিল।"

গার্লফ্রেণ্ড কথাটা শমীকের কানে অদ্ভুত শোনাল। সুদেষ্ণা ওর চেয়ে ছ বছরের বড়। চল্লিশ বছরের সুদেষ্ণাকে এক্স-গার্লফ্রেণ্ড বলতে হলে আমেরিকান কালচারের শেকড় দরকার। তবু শমীক শব্দটাকে স্বীকার করে নিল। অ্যানাকে বলল—

-"ক্যারেনের কাছে শুনে থাকলে আমার কাছে আর কিছু জানার নেই? কেন এত বছর পরে সম্পর্ক ভেঙে দিলাম জানতে চাইবে না?"

-"কী হবে জেনে? আমি ক্যারেনকে জিজ্ঞেস করেছিলাম ঐ মহিলাকে বিয়ে করেছিলে কিনা? তাকে অসুস্থ অবস্থায় ফেলে এসেছিলে কিনা। ক্যারেন বলেছিল কোনটাই নয়। আর কিছু জানতে চাইনি।"

শমীক স্তব্ধ হয়ে গেল। অ্যানার বাবার অপরাধটা ওর কাছে সবচেয়ে বড়। তাই শমীকের লিভ-টু-গেদার করা, ব্রেক-আপ করার জন্যে কোন প্রশ্ন করছে না। শমীক নিজে হলে করত না, পুরনো অ্যাফেয়ার নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। তবু ওর মনে হল অ্যানাকে কতগুলো কথা বলার আছে। একটু চুপ করে থেকে বলল—"ক্যারেন তোমাকে ঠিক কী বলেছে জানি না। হয়ত আরও কথা আছে। তুমি কি জানো অ্যানা, ঐ মহিলার জন্যে আজ আমি এ দেশে আছি। লিবারেল আর্টস-এর ছাত্র ছিলাম। বাড়ির অবস্থাও সাধারণ। আমেরিকায় পড়তে আসা আমার কাছে তখন স্বপ্নের মতো ব্যাপার। সুদেষ্ণা আমাদের পাড়ার মেয়ে। আমাকে স্পনসর করে এনেছিল। প্লেনের টিকিট পাঠিয়েছিল। ওর বাড়িতে থেকে নিউ স্কুলে অ্যাডমিশন নিলাম। পরে গ্র্যাজুয়েট স্কুলে গেলাম। প্রথম চাকরি একটা ছোট কাগজে। সেও সুদেষ্ণার কন্ট্যাক্ট থেকে। এইচ্. ওয়ান ভিসা হল। তারপর এই চাকরি। সুদেষ্ণার কাছে আমার অনেক ঋণ।

অ্যানা শুনছিল। শমীকের শেষের কথাটায় যেন মৃদু প্রতিবাদের চেষ্টা করল—"তোমাকে ওঁর প্রয়োজন ছিল। দুজনে দুজনকে দেখেছো।"

-"সেই যুক্তিটাই ধরে আছি।"

অ্যানার মুখ ম্লান দেখাল। গলার স্বরে বিষণ্ণতা-"শমীক ডু ইউ হ্যাভ এনি রিগ্রেট্? চলে এসে ভুল করোনি তো?"

শমীক উত্তর দিল-"না অনেক দিন থেকে ভেবেছি। শুধু লীনার জন্যে সুদেষ্ণাকে ছেড়ে আসতে পারিনি।"

-"লীনা কে?"

-"সুদেষ্ণার মেয়ে। মেন্টালি রিটার্ডেড। সিভিয়ার গ্রেড অফ্ রিটার্ডেশন না হলেও ওকে নিয়েই ওদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অশান্তি শুরু হয়েছিল। নীল যখন একটু বড় হল, সুদেষ্ণার স্বামী লীনাকে আর বাড়িতে রাখতে চাইছিল না। সুদেষ্ণাও কিছুতেই লীনাকে ইন্স্টিট্যুশনে রাখতে দেবে না। শেষ পর্যন্ত ভদ্রলোকই ওদের ছেড়ে চলে গেলেন। আবার বিয়ে করলেন। অ্যালিমনি দিতেন। বাড়িটাও সুদেষ্ণা পেয়েছিল।"

-"লীনাকে তুমি দেখাশোনা করতে?"

-"দেখতে হত। সুদেষ্ণার ফুলটাইম চাকরি। নীলও ছোট। সুদেষ্ণা একা পেরে উঠেছিল না। আমি আসার পর যেটুকু সময় পেতাম সাহায্য করতাম।"

-"লীনা এখন কোথায়?"

-"শেরউড ইনস্টিট্যুশনে। অ্যাডোলেসেন্সের পর থেকে বাড়িতে আর হ্যাণ্ডেল করা যাচ্ছিল না।"

অ্যানা দু হাঁটুর ওপর হাত রেখে মাথা নীচু করে বসেছিল। এক সময় মুখ তুলল-"আমি এত কথা জানতাম না। ক্যারেনও বোধহয় জানে না।"

শমীক বলল-"অফিসে দু-চারজন জানে। ক্যারেনের সঙ্গে আগে তো সেরকম আলাপও ছিল না। তোমার পাঠানো সেই মাদার্স-ডের কবিতা দিয়ে বন্ধুত্ব হয়ে গেল। তারপর তোমার সঙ্গে দেখা।"

নিউইয়র্কে জুলাই এর এক বৃষ্টির সকালে ওদের বিয়ে হল। অ্যানার বাবা এসেছিলেন। নীল এসেছিল। আর ওদের কয়েকজন বন্ধু। রিসেপশনে অ্যানা নিজের লেখা থেকে পড়ল-

"এভরি থিং ইজ্ রিয়েলি গুড রাইট নাউ
এভরি থিং ইজ হারমনিয়াস্
দিস্ ইজ ওয়ান্ অফ্ দোজ্ টু মিনিট্স্ ইন্ লাইফ্
হোয়েন্ সাডনলি এভরি বডি ইজ ও কে
দোজ্ টু মিনিটস্ ইন্ লাইফ্......

শমীকের মনে পড়ছিল
এই জীবনের সত্য তবু পেয়েছি এক তিল
পদ্মপাতায় তোমার আমার মিল....

অঙ্গীকার আর প্রতিশ্রুতির পরে সেই নীরবিন্দুর জন্যে শমীক এক আশ্চর্য মায়া অনুভব করছিল।

হৃদয়ের হারানো গল্প

রওশনের অপমানিত মুখখানা দেখতে দেখতে জয়িতা তীব্র প্রতিবাদের জন্যে তৈরি হচ্ছিল। এসে পর্যন্ত অনেকক্ষণ নিজেকে সংযত রেখেছে। এবার কিছু বলা দরকার। সাহিত্য আলোচনার নামে এত ঔদ্ধত্য সহ্য করা যায় না। ব্রুক্‌লিন থেকে ভুঁইফোঁড় কজন সমালোচক এসেছে। সবজান্তার মতো মন্তব্য করে যাচ্ছে। রওশনের লেখা গল্প শুনে ওদের হাস্যকর আলোচনা কেউই যে পছন্দ করেনি, সে তো বাকি লোকেদের মুখ দেখে বোঝা যায়। তবু কী আশ্চর্য! একজনও ওদের জ্ঞান বুদ্ধি নিয়ে প্রশ্ন করতে সাহস পাচ্ছে না। তর্কে যেতে চাইছে না। বোধহয় এরপরে নিজেদের গল্প, কবিতার খাতাও গুটিয়ে ফেলবে।

কিন্তু, এখানে লেখা যাচাই করতে আসার কোনও দরকার ছিল? কোথাকার সব সিউডো-ক্রিটিকদের রশিদভাই জুটিয়ে আনেন। নিউইয়র্কে রোজ রোজ ব্যাঙের ছাতার মতো কাগজ গজায়। নিজেদের মধ্যে চুলোচুলি করে বছরের মাথায় বন্ধ হয়ে যায়। সাকুর্লেশন নেই। কোয়ালিটি নেই। এদিকে সবাই জার্নালিস্ট! সবাই লেখক। এদের মধ্যে থেকে দু-চার জন সাহিত্য মোড়ল বেরিয়ে আসে। রশিদ ভাই তাদের ভাল চেনেন। সেলিমা ভাবি তেমন পছন্দ করেন না। আড়ালে বলেন—বনদেশে শিয়ালরাজা। তবু যে কেন গল্প, কবিতার আসরে নেমন্তন্ন করেন? যেন রওশন, মানোয়ারা, দিব্যেন্দু কিংবা জয়িতার মতো নতুন রাইটারদের লেখাগুলো এরা ভালো বললেই জাতে উঠবে।

আপাতত মৈনুল নামে সাহিত্য মোড়লটি রওশনকে গায়ে পড়ে উপদেশ দিচ্ছে—'মাঝে মাঝে আমাদের ওদিকে আসুন। লেখাটেখাগুলি শুনুন। বুঝতে পারবেন গল্প কীভাবে লেখা হচ্ছে। তাতে আপনারও লাভ। আমাদেরও অভিজ্ঞতা হবে।'

রওশন সামান্য হাসির চেষ্টা করল—'আপনাদের কী অভিজ্ঞতা হবে বুঝতে পারলাম না। বললেন তো গল্প লিখতেই জানি না।'

মৈনুল তার সঙ্গী কমল সাহার দিকে এক ঝলক তাকিয়েই উত্তর দিল—'জানতে পারব, আগেকার দিনের মহিলারা কেমন লিখতেন।'

রওশন উঠে দাঁড়াল। ঘুরে অপমান করার ক্ষমতা নেই। প্রবৃত্তিও নেই। একটা গল্পের জন্যে এত যুদ্ধ করা যায় না।

রুকসানা রেগে উঠে বলল—'আপনি খুব আপত্তিকর কথাবার্তা বলছেন। রওশনের সাথে সাথে আগের দিনের লেখিকাদেরও অসম্মান করছেন। এভাবে বিদ্রূপ করছেন কেন?'

মৈনুল চশমা নাড়াচাড়া করতে করতে হাসল—'সমস্যা তো এখানেই। আপনারা

লেখেন, অথচ সমালোচনা নিতে পারেন না। আমি তো ব্যাক্তিগতভাবে কাউকে আক্রমণ করিনি। তাঁর লেখার ভালমন্দ নিয়ে দু'চার কথা বলেছি।' এবার জয়িতা মৈনুলের মুখোমুখি হল—'একটা প্রশ্ন আছে। আপনি নিজের সম্পর্কে একটু বলবেন?'

মৈনুল সোজা হয়ে বসল—'কী জানতে চাইছেন?'

—'আপনি কী করেন?'

—'সেটা জানানো কি খুব দরকার?'

—'দরকার। আপনি যে আমাদের সবাইকে গল্প লিখতে শেখাবেন, তার জন্যে তো একটা এক্সপার্টিস দরকার। প্রফেশন্যাল গল্প লিখিয়ের ব্যাক্‌গ্রাউণ্ড থাকতে হবে।'

মৈনুল নিজের দলের লোক ছাড়া কারোর চোখের দিকে তাকায় না। এ সময় বৌ-এর দিকে তাকাল। তার বৌ স্বামীর হাঁটুর ওপর হাত রেখে খরদৃষ্টিতে জয়িতাকে লক্ষ্য করছিল। ঘরের আবহাওয়া ভারী হয়ে উঠেছে। মৈনুলের মুখ গম্ভীর। কখনও বোধহয় ঋত্বিক ঘটককে সামনা সামনি দেখেছিল। তাঁর মতো করে মাথার পেছনদিকে একমুঠো চুল টানতে টানতে উত্তর দিল — 'পত্রিকা চালাই যখন, সাহিত্যই পেশা বলা উচিত।'

পত্রিকা মানে যেগুলো ঝগড়ার জন্য পরের বছর উঠে যায় আর অন্য কাগজে গালাগালি দিয়ে চিঠি বেরোয়, সেইগুলো? নাকি দেশের খবরের কাগজের করেসপণ্ডেন্ট?

মৈনুল বিরক্ত হল—'আমি সাংবাদিক। সেটাই মনে হয় যথেষ্ট পরিচয়।'

—'তাতে কী প্রমাণ হয়? আপনি গল্প কবিতার এক্সপার্ট? সবাইকে ধরে ধরে লিখতে শেখাবেন?'

—'আপনাকে হয়তো নয়। যাঁর সম্ভাবনা আছে, তাঁকে সাহায্য করতে পারি। সমালোচনা করার মতো সাহিত্যবোধ আমার আছে।

জয়িতা মৈনুলের অহঙ্কারে অবাক হল না। অভদ্রতা গায়ে মাখল না। হেসে উঠে বলল—'তবে আর সময় নষ্ট করছেন কেন? ক্রিয়েটিভ রাইটিং-এর ক্লাস খুলে ফেলুন।'

মৈনুলের স্ত্রী অপ্রসন্নভাবে বসেছিল। সে খানিকক্ষণ আগে নিজের লেখায় তসলিমা নাসরিনকে যাচ্ছেতাই করেছে। যাকে বলে রীতিমত প্রতিবাদপূর্ণ রচনা, সে ধরনেরই লিখতে চেষ্টা করেছে। শুধু 'যোনি' শব্দটা এক লাইন অন্তর অন্তর লিখে গিয়ে কেবলমাত্র তসলিমার অশ্লীলতাই প্রমাণ করতে চেয়েছে কিনা জয়িতা ঠিক বোঝেনি।

রাগী মেয়েটি এবার স্বামীর জন্যে হাল ধরল।—'আজ কি আর কেউ পড়ার সুযোগ পাবেন? এভাবে সময় নষ্ট করার অর্থ হয় না। আমাদের বাসায় ফিরতে হবে'। অত্যন্ত অসহিষ্ণুভাবে সে রশিদভাইকে খুঁজল। মৈনুল তখনও রণে ভঙ্গ দিতে চাইছে না—'এই জন্যেই আলোচনায় বসতে চাইনি। আপনি কি রওশনের লেখার সমালোচনায় ক্ষুণ্ণ হয়েছেন? নাকি, আপনার গল্পের দোষ ত্রুটি ধরা হয়েছে বলে?'

ঘরের মধ্যে গুনগুন করে কথাবার্তা শুরু হয়েছে। এপাশ ওপাশ থেকে মতামত শোনা যাচ্ছে। জাহাঙ্গীর মিন্টু হাত তুলে কিছু বলতে চাইল। কথাবার্তা থেমে যেতে সে মৈনুলকে বলল—'গল্পের গতি সম্পর্কে তোমার ধারণার সঙ্গে আমি একমত নই। রওশন আপনার গল্পটি সুন্দর হয়েছে, আমাদের ভাল লেগেছে।'

বস্টন থেকে খুরশীদ আর মানোয়ারা এসেছেন। খুরশীদ কবিতা লেখেন। রসিকতা করে কমল সাহাকে জিজ্ঞেস করলেন—

—'আমার এক ডজন সরস কবিতাও কি সরোষে বাতিল হয়ে যাবে?' কমল রসিকতা পছন্দ করলেন না। ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করলেন—'তাহলে আজ এখানে আমাদের ভূমিকাটা কী? সেটাই বরং স্পষ্ট হোক। রশিদ ভাই এক কথা বলে ডেকে আনলেন। ওঁর উচিত ছিল, আগে আপনাদের জিজ্ঞেস করে, তারপর আমাদের আসতে বলা।' হাওয়া গরম বুঝে রশিদভাই স্ন্যাকস্-এর ব্রেক দিয়ে দিলেন। সেলিমা ভাবি কাবাব নিয়ে এলেন। রশিদ ভাই সিঙ্গাড়ার বাক্স খুলে দিয়ে বললেন—'আর তর্ক নয়। চা খেতে খেতে সন্ধি হয়ে যাক।'

সবাই কাবাব, সিঙ্গাড়া নিয়ে বসেছে। জয়িতা রওশনের পাশে জায়গা করে নিয়েছে। নিজেদের মধ্যে কথা হচ্ছে। জয়িতার ধারণা রশিদভাই যাই বলুন, সন্ধি হবে না। প্রথম থেকেই লক্ষ করেছে ব্রুক্লিনেল লোকগুলো যেন এখানকার লেখকদের অপদস্থ করবে বলে তৈরি হয়ে এসেছে। প্রত্যেকের সম্পর্কে অবজ্ঞার ভাব! দীপান্বিতা ঘোষের কবিতা কলকাতার কাগজে বেরোয়। তিনটে কবিতার বই বেরিয়েছে। তাকে কীভাবে বলল? যেহেতু দীপান্বিতাদি নিজের বই হাতে করে আসেনি, এমনিই কবিতা বলেছে, সে জন্যে কমল সাহা ধরে নিলেন এ বোধহয় বোরড় হওয়া হাউস্ ওয়াইফ্। মিড্ লাইফ্ ক্রাইসিস থেকে পদ্য লিখছে! মাথা নেড়ে নেড়ে বোঝাতে লাগলেন—'আপনার কবিতা, যদি আদৌ এদেরকে কবিতা বলা যায়, এখানে কিন্তু আবেগ-টাবেগগুলি প্রচারের মতো শোনাচ্ছে। শব্দ সাজানোর কৌশলও ঠিকমতো প্রয়োগ হয়নি। একটু অগোছালো অবস্থা আর কি? তবে কল্পনাশক্তি আছে। লিখতে থাকুন। চেষ্টা করতে করতেই হবে।'

দীপান্বিতাদি নিজের ডলার খরচা করে কবিতার বই ছাপতে যায়নি। কলকাতার পাবলিশার ছাপিয়েছে। কয়েকটা কবিতা তার আগে ম্যাগাজিনে বেরিয়েছে। সম্পাদকরা এমনিই বেছে নিয়েছে? দীপান্বিতা শান্তভাবে উপদেশ মেনে নিল দেখে জয়িতাও আর নিজের গল্পের সমালোচনা উত্তর দেয়নি। মৈনুলের বউ বলল—'গল্পের মধ্যে আপনি ধর্মের গোঁড়ামিকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। আপনার নিজের মতামত বেশ স্পষ্ট হয়ে গেছে। এ ধরণের লেখা সমাজের ক্ষতি করে।'

একজন অনেকক্ষণ চুপচাপ ছিল, চা পর্ব মিটতে কমল সাহা তাকে উৎসাহিত কিংবা উত্তেজিত করার চেষ্টায় বললেন—'জামাল, তুমি দেখি আজ চুপচাপ। লেখালেখি সম্পর্কে কিছু বলো।' সে দেওয়াল ঘেঁষে বসে কী যেন লিখছিল। মৈনুলদের সঙ্গেই এসেছে। অনিচ্ছা দেখিয়ে বলল—'যাক। ভুল বোঝাবুঝি হয়ে যাচ্ছে।'

মৈনুল অভয় দিল—'তোমার মত তুমি বলবে। ভুল বোঝার কী আছে?' জামাল বোধহয় এই অপেক্ষাতেই ছিল। একবারও জয়িতার দিকে তাকাল না। সামনের দেওয়াল লক্ষ করতে করতে আরম্ভ করল—'তাহলে জয়িতা সেনের লেখা প্রসঙ্গেই আসি। এটিকে আমি গল্প বলব না। ন্যারেটিভ্ লেখা এই পর্যন্ত। আসল উদ্দেশ্য আমাদেরকে কাঁদানো। লেখিকা কিছু পরে পরে কাঁদাতে চাইছেন। অথচ আমাদের কান্নার প্রয়োজন নেই। এটি একটি মেলোড্রামা।'

বোধহয় সুপরিকল্পিত আক্রমণের প্রতিবাদেই মানোয়ারা সোচ্চার হলেন—'আমি মানতে পারছি না। এ গল্পে আমাদের জীবনের ছায়া পড়েছে। চরিত্রগুলির সঙ্গে আমাদের সুখ দুঃখ মিলে মিশে গেছে।'

করিমভাই সমর্থন করলেন—ধর্মের গোঁড়ামিকে প্রশ্রয় নয়, বেদনার মধ্যে দিয়ে প্রতিবাদই তো লক্ষ করলাম।'

দীপান্বিতা ঘোষ নিজের জন্যে মুখ খোলেনি। এবার জয়িতার লেখার জন্যে জামালকে প্রশ্ন করলেন—'জামাল, গ্রিক ট্র্যাজেডির নাটকীয় উদ্দেশ্যটা কী ছিল? দুঃখের দৃশ্যের মধ্যে দিয়ে প্রপার পারগেশন অফ্ লাইফ্! তাই তো?'

—'আমরা তো নাটক নিয়ে আলোচনা করছি না'

—'সাহিত্য নিয়ে করছি। নাটক, গল্প যা-ই লেখা হোক, জীবনের সুখ দুঃখ নিয়েই সাহিত্য কর্ম। কাঁদানোর চেষ্টার মধ্যে আন্‌রিয়েলিস্টিক কিছু নেই। জয়িতার লেখায় আমরা আশাপূর্ণার ধারা দেখতে পাচ্ছি।'

'জামাল বলল—'ধারাটা নিয়েই আমার আপত্তি। খুব মেলোড্রামা, তাছাড়া, মেয়েদের জীবনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। আশাপূর্ণার লেখা আমি পড়ি না।' জয়িতা যেন একটু জোর পেল। সমালোচনা শুনতে শুনতে মনটা দমে গিয়েছিল। ও দীপান্বিতাদির মতো লিখতে পারে না। অন্তত প্রমাণ করার সুযোগ পায়নি। কলকাতার বড় কাগজে ওর লেখা ছাপা হয়নি। কয়েকবার গল্প পাঠিয়ে দেখেছে। চিঠির উত্তরও আসে না। এখানকার আর কানাডার বাংলা ম্যাগাজিনে যা কিছু বেরিয়েছে। অনেকে উৎসাহ দিয়েছে। বলেছে ওর গল্পের হাত ভাল। সেই আশাতেই রশিদভাই-এর বাড়ি এসেছিল। ভাবতে পারেনি এভাবে ওর অযোগ্যতার ব্যাখ্যা হবে। দুঃখের গল্প লেখা কি অযথা নাটক সৃষ্টির জন্যে? মেয়েদের জীবন নিয়ে লেখার অর্থ সীমাবদ্ধতা?

অথচ মানোয়ারা আর করিমভাই সে কথা বলেনলি। দীপান্বিতাদি বলেছে আশাপূর্ণা দেবীর ধারা। তুলনা সত্যি হোক বা না হোক, সে কিছুটা মান পেয়েছে। শেষে জামালের উত্তর শুনে বুঝতে পারল এদের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়ার কোনও মানে হয় না। যে লোক আশাপূর্ণার লেখা বাতিল করে দিয়েছে, পাঠক হিসেবে তাকে আমল না দেওয়ার চেষ্টায় জয়িতা বেশ স্বস্তি পেল।

সেদিন আর আলোচনা খুব জমল না। মৈনুলদের ফেরার তাড়া ছিল। খাওয়া দাওয়া শেষ হতে রাত এগারটা বাজল। জয়িতা বাড়ি ফেরার সময় সারা পথ বৃষ্টি পেল। গাড়ি চালাতে চালাতে মাথার মধ্যে সাত কথা ঘুরছিল। দীপান্বিতাদি বলেছে প্রপার পারগেশন অফ লাইফ...। জয়িতা নিজের লেখার কথা ভাবছিল... কেন আমার সব গল্প দুঃখের মধ্যে গিয়ে শেষ হয়? বারবার কেন শুধু হেরে যাওয়ার কথা লিখি? মৃত্যুর কথা লিখি? হয়তো এটাই আমার অক্ষমতা। জীবনের ঐশ্বর্য দেখতে পাই না। আজ পর্যন্ত একটা রোমান্টিক প্রেমের গল্প লিখতে পারিনি। অথচ এমন তো নয়, আমি শুধু যুদ্ধই করে চলেছি...।

কলেজে স্প্রিং ব্রেক চলছে। ইন্দ্র বন্ধুদের সঙ্গে ফ্লোরিডা গেছে। মুনিয়াও স্কুল থেকে ফিলড-ট্রিপে ভার্জিনিয়ায়। জয়িতার স্কুলে এ সপ্তাহে টিচার্স কনফারেন্স শুরু হচ্ছে। কাগজপত্র নিয়ে বসতে হবে। তার আগে খানিকক্ষণ টিভি দেখতে বসল। 'তাজমহল স্টোর' থেকে তিনটে ক্যাসেট এনে ফেলে রেখেছে। এখনও দেখা হয়নি। নতুন নতুন ছেলে মেয়েগুলোকে চিনতেও পারে না। গল্পের মাথামুণ্ডু নেই। 'তাজমহলের' লোকটাও তেমনি। 'ব্যাণ্ডিট কুইন্', 'বম্বে' এখনও আনতে পারল না। দোকানের টিভিতে খালি 'দিলওয়ালে দুলহনিয়া' দেখিয়ে যাচ্ছে। 'রুদালি'র ক্যাসেট দেওয়ার সময় বলেছিল— ভেরি স্লো মুভি। ওর রেটিং এর ওপর বিশ্বাস করে জয়িতা আর ক্যাসেট নেয় না। তাও এবারে 'মাচিস্' পেয়েছে। গুলজারের বই। ভালই হবে নিশ্চয়ই।

ডিনারের পরে ক্যাসেট শুরু হওয়া মাত্র রান্নাঘরে ফোন বাজল। মুনিয়ার ফোন ভেবে জয়িতা উঠে গেল। তিনবার রিং হয়ে চুপ। জয়িতা খানিক 'হ্যালো হ্যালো' করল। কর্ডলেস ফোন নিয়ে এই এক জ্বালাতন! আজ দু-তিনবার এরকম হচ্ছে। দু'দিন ছেলে মেয়ের সঙ্গে কথা হয়নি। ইন্দ্র না করুক, মুনিয়া নিশ্চয়ই চেষ্টা করেছে। জয়িতা বিরক্ত হয়ে ফোন নামিয়ে রাখল। হয়তো আবার রিং হবে।

টেবিলে শান্তনু মজুমদারের পাঠানো গেট-ওয়েল কার্ড। কবে জয়িতার ব্রঙ্কাইটিশ হয়েছিল। এতদিন পরে শুনে কার্ড পাঠিয়েছেন। আজকাল বেশি ফোন করেন না। মাঝে বোধহয় ইণ্ডিয়া গিয়েছিলেন। ডিভোর্সের পর খুবই ডিপ্রেসড। তিরিশ বছর পরে আমেরিকান বউ ছেড়ে চলে গেল। মেয়েরা পড়াশোনা শেষ করে চাকরি করছে। একজনের বিয়েও হয়ে গেছে। দূরে দূরে থাকে। শান্তনু খুব একা হয়ে গেছেন।

জয়িতার সঙ্গে গত বছর ইন্ডিয়া ফেস্টিভ্যালে দেখা হয়েছিল। কফি স্টলে বসে দু'জনে অনেকক্ষণ গল্প করেছিল। ইন্দ্র তখন সবেমাত্র কলেজে ঢুকেছে। ডর্মে আছে। ওকে ছেড়ে থাকতে জয়িতার কষ্ট হচ্ছিল। ছেলে মেয়েদের দূরে দূরে থাকা নিয়েই কথা বলেছিলেন শান্তনু। জয়িতাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন—'তোমার মেয়ে কি নেক্সট ইয়ারে কলেজে যাচ্ছে?'

—দু'বছর দেরি আছে।'

—'তারপর? তোমারও তো বাড়ি খালি হয়ে যাবে।'

—'জানি। ছেলেকেই এত মিস্ করি। মেয়ে চলে গেলে কী করব?'

—'ইটস্ হার্ড। আমার মেয়েরাও চলে গেল। একা একা ভাল লাগে না। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে জয়িতা বলেছিল—'আমি তো এমনিতেও একা। তবু ওরা ছুটিতে আসবে। মুনিয়াকে বেশি দূরের কলেজে পাঠাব না। ওর নিজেরও ইস্ট কোস্টের বাইরে অ্যাপ্লাই করার ইচ্ছে নাই।'

তার মাসখানেক বাদে শান্তনু মজুমদারের ফোন এসেছিল। জয়িতা অবাক না হলেও আশা করেনি। দু'চার কথার পর শান্তনু বলেছিলেন—

—'সেদিন দেখা হয়ে ভাল লাগল। আই এনজয়েড ইওর কোম্পানি।

—'ধন্যবাদ। আমারও সময়টা ভালই কেটেছিল।' শান্তনুর গলায় উচ্ছ্বাস—'টু লোন্লী হার্টস্ হ্যাড সাম্থিং ইন কমন।

স্পেশ্যালি, কনভারসেশন ওয়াইজ।'

জয়িতা উৎকর্ণ হল। ভদ্রলোক হৃদয়-টিদয় এনে ফেলছেন। হয়তো আরও কিছু বলতে চান। ভূমিকা শেষ করতে পারছেন না। সে ফোন ধরে রইল।

—'একটা কথা ভাবছিলাম জয়িতা।'

—'বলুন।'

—'মাঝে মাঝে দেখা করতে পারি না?

ক্যান্ট উই স্পেন্ড সাম্টাইম টু-গেদার?' জয়িতা সামান্য সময় নিল—'দেখা তো হয় মাঝে মাঝে। এমনিও একদিন চলে আসতে পারেন।'

—' তোমার কবে কী প্রোগ্রাম, সেটা জেনে তারপর আসতে পারি।'

—'আসলে এখন মেয়ের জন্যে অনেকটা সময় দিতে হচ্ছে। ওর জুনিয়র ইয়ার। স্যাট্, অ্যাচিভমেন্ট, কলেজ ভিজিটেশন, পরপর সবই আছে তো। আমি ঠিক ছেড়ে দিতে পারি না।'

—'আই ক্যান্ আণ্ডারস্ট্যাণ্ড।'

শান্তনু আর কথা বাড়াননি। পরে একদিন বলেছিলেন—'ছেলেমেয়েদের জন্যে আমরা সব সময় আছি। ওদের কিন্তু অত সময় নেই। উই হ্যাভ্ টু লিভ থ্রু আওয়ার সেলভ্।'

অনেকদিন পরে শান্তনু মজুমদারের পাঠানো গেট-ওয়েল কার্ড দেখে কথাটা মনে হল। একা বাড়িতে জয়িতার সময় কাটতে চাইছে না। সন্ধে থেকে হাওয়া উঠেছে। আকাশে মেঘ ছিল এবার ঝমঝম করে বৃষ্টি শুরু হল। এরকম দুর্যোগের রাতে ছেলেমেয়ে কেউ কাছে নেই। একটা ফোনও এল না। শান্তনু ঠিকই বলেছেন। শেষ পর্যন্ত শুধু নিজের সঙ্গে থাকা। জয়িতার ছোট সংসার আরও ছোট হয়ে আসছে। দেখতে দেখতে মুনিয়াও চলে যাবে। চার বছর পরে পড়াশোনা শেষ হলে কোথায় চাকরি পাবে, কতদূরে থাকবে কে জানে? তবু যতদিন কলেজ আছে, ওরা ছুটিতে বাড়ি আসবে। তারপর যে যেখানে, সে সেখানে। কেরিয়ার, সংসার কোনও কিছুর জন্যেই আর এ বাড়িতে ফিরে আসবে না। এই ছোট্ট শহরতলি ওদের শৈশবের স্মৃতি ছাড়া আর কিই বা দিতে পারে? শুধুমাত্র অতীত আর মাকে ঘিরে জীবন চলে না। এখানে ইন্দ্র, মুনিয়ার কোনও ভবিষ্যৎ নেই। ফিরে আসার মতো আকর্ষণ নেই।

এত কিছু উপলব্ধি করেও জয়িতা ভবিষ্যতের নিরবচ্ছিন্ন একাকিত্বের কথা ভেবে বিষণ্ণ বোধ করছিল। ফায়ার প্লেসের ওপরে অরিজিতের ছবির দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে সে যেন তাকেই প্রশ্ন করছিল—একা থাকার দুঃখ কখনও কি সয়ে যায় না? নিঃসঙ্গতার অভ্যেস হয় না?

কাছে কোথাও বাজ পড়ল। জানলায় বিদ্যুতের নীল আলো। ফায়ার ট্রাকের সাইরেন শোনা যাচ্ছে, জয়িতা টিভি বন্ধ করে দিল। ঝড় জলের আওয়াজে ইন্দ্র কিংবা মুনিয়ার ফোন এলে শুনতে পাবে না ভেবে শোবার ঘরে গেল। রাত বাড়ছে। শুয়ে পড়লেও হয়। আজ আর স্কুলের কাজ নিয়ে বসা হল না।

ঘরের আলো নিভিয়ে কতক্ষণ জয়িতা বিছানায় বসে থাকল। বাইরে গাঢ় অন্ধকার। ঝরঝর বৃষ্টির শব্দ। যেন সমস্ত চরাচর জুড়ে তার গোপন কান্নার প্রতিধ্বনি উঠছে। এই রাত বড় বিষাদের মধ্যে নিয়ে যায়। কত বছর হয়ে গেল অরিজিৎকে দেখেনি। এই ঘরে, এই বিছানায় আর কখনও অরিজিৎ এসে বসবে না। জয়িতার সঙ্গে এ জীবনে আর দেখা হবে না। মুহূর্তের ঘটনায় সবকিছু ওলোট পালট হয়ে গেল। অফিসের কাজে অরিজিৎ ডালাসে গিয়েছিল। সেদিন সন্ধের ফ্লাইটে ফেরার কথা, সেদিন মুনিয়ার তিন বছরের জন্মদিন। সকালে ডালাসের হোটেল থেকে অরিজিৎ ফোন করেছিল।

তারপর কোথায় কখন প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি হয়েছিল জয়িতা জানে না। বাচ্চাদের সঙ্গে নিয়ে মুনিয়ার জন্মদিনের বাজার করেছে। বেলুন, স্ট্রিমার দিয়ে বাড়ি সাজিয়েছে। বিকেলবেলা কেক কিনে আনল। তখনও এদিকে বৃষ্টি শুরু হয়নি। টিভি চলছিল। জয়িতা যখন ইভনিং নিউজে 'ডেলটা'র প্লেন ক্র্যাশের খবরটা শুনল, প্রথমে তার বিশ্বাসই হচ্ছিল না। ছুটে কিচেনে গিয়েছিল। ক্যালেণ্ডারে লেখা অরিজিতের ফ্লাইট নাম্বার দেখতে দেখতে জয়িতা চিৎকার করে উঠেছিল—ইন্দ্র। যেন তার পাঁচ বছরের ছেলে সব খবর আনতে পারবে। তখনও মুনিয়া বাবা আসবে বলে সোফায় দাঁড়িয়ে জানলা দিয়ে দেখছে।

কয়েক ঘণ্টা পরে এয়ারলাইন্স থেকে যা জানাবার জানিয়ে দিল। তখন আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নেমেছে। জয়িতা আচ্ছন্ন অবস্থায় প্লেন ভেঙে পড়ার ভীষণ শব্দ শুনেছিল। তারপর আরও কতবার ঘুমে, জাগরণে, তন্দ্রায় সেই ভয়ঙ্কর ধাতব শব্দ তার মাথার মধ্যে খান খান

হয়ে ভেঙে পড়েছে। রাতের আকাশে প্লেন উড়ে গেলে সে বিছানায় কান চেপে রেখেছে। এত বছর পরেও দুর্যোগের রাতে সেই স্মৃতি ফিরে আসে। বড় কষ্ট দেয়।

জয়িতা আজ নিজেকে শান্ত রাখতে চেষ্টা করছিল। সময় কিছু শক্তি দিয়েছে। অরিজিৎ নেই। তবু দিন কেটে গেছে। নিজেকে স্থির রাখার জন্যে, স্মৃতির যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে সে এইসব কথা ভাবতে চাইছিল। অথচ কী গভীর মমতা থেকে বহুকাল আগে হারিয়ে যাওয়া এক চেনা গন্ধের ঘ্রাণ নিতে সে বালিশে মুখ রাখল।

সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সেলিমা ভাবির ফোন এল। পথিক নামে একটি ছেলে ভাল গাইছে। তার গানের আসর করবেন। জয়িতা ভাবল সঙ্গে আবার সাহিত্য বাসর-টাসর হবে নাকি? সেই মৈনুলের দল? জিজ্ঞেস করল—'আবার মুর্গী জবাই-এর বন্দোবস্ত করছেন ভাবি?' ভাবি হাসলেন—'আরে না না। তোমার কোনও ভয় নেই। এবার শুধু গান। তাও অনেক লোক ডাকছি না।'

—'দেখি, মুনিয়ার আবার সেদিন কী আছে। পরে আপনাকে ফোন করব।'

'—ওকেও নিয়ে এসো না? পল্লীগীতি ভালই লাগবে।'

—'বলে দেখি। এমনিতে কটা নাগাদ শুরু করবেন ভাবছেন?'

—'সবাই সময় মতো এসে গেলে সাতটা নাগাদই শুরু করতে পারি। মাঝে ব্রেক দিয়ে ডিনার দিয়ে দেব। তারপর যতক্ষণ চলে।'

—'আমি একটা রান্না করে নিয়ে যাব ভাবি। কত জন আসছে?'

—'তোমার কিছু করতে লাগবে না। আগের দিন ছুটি নিচ্ছি। আমার আপা আসছেন। তাঁর হাতের বিরিয়ানী খাওয়াব।'

জয়িতা হেসে উঠল—'পথিকের গানের শেষে আপার হাতে বিরিয়ানী! দেখি, মেয়েকে রাজি করাই।'

মুনিয়া রাজি হল না। সেই এক কথা। হোমওয়ার্ক আছে। ক্লাস অ্যাসাইমেন্ট শেষ করতে হবে। আসলে এমনিতেই যাবে না। যে বাড়িতে ওর চেনাশোনা ছেলে, মেয়ে নেই, সে বাড়িতে কিছুতেই যাবে না। এই নিয়ে প্রতি উইক এণ্ডে সাধাসাধি। অর্ধেক সময় রাজি করানো যায় না। মাঝখান থেকে জয়িতারও অনেক জায়গায় যাওয়া হয় না। শেষ মুহূর্তে ফোন করে না বলে দিতে খারাপ লাগে। আগে তবু ইন্দ্র বাড়িতে থাকত। ভাইবোনে মিলে হোম-ওয়ার্ক, ঝগড়া, কমপিউটার গেম, ফোন নিয়ে টানাটানি, নয়তো ভি সি আরে মুভি টুভি দেখে তিন-চার ঘন্টা কাটিয়ে দিত। জয়িতা পার্টি কিংবা ফাংশন থেকে ঘুরে আসত। কিন্তু ইন্দ্র কলেজে চলে যাবাব পর মেয়েকে একা রেখে জয়িতার কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না। সতের বছর বয়সটাও এমন যে মেরে ধরে, ভাল ফ্রক পরিয়ে, গাড়িতে তোলা যাবে না। বেবি সিটার এনে বসিয়ে রাখা যাবে না। অথচ একা বাড়িতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা রেখে যেতেও ভাল লাগে না। হয়তো মার সঙ্গে সারাক্ষণ থাকবে না। ফোন কানে নিয়ে শুয়ে থাকবে। নয়তো বন্ধু জুটিয়ে মুভি দেখে আসবে। নতুন লাইসেন্স পেয়ে যখন তখন গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। তবু জয়িতা মেয়ের কাছাকাছি থাকতে চায়। দেখতে দেখতে ওরও কলেজের সময় হয়ে আসছে। আর কটা দিনই বা একসঙ্গে থাকতে পারবে।

জয়িতার সামাজিক গণ্ডি নেহাৎ ছোট নয়। এ দেশে এসে পর্যন্ত একই স্টেটে আছে। যতদিন অরিজিৎ ছিল, অনেকের সঙ্গেই আসা যাওয়া ছিল। মেলামেশা হয়েছিল। ও যখন

মারা গেল, জয়িতার সাতাশ বছর বয়স। বিদেশে দুটো বাচ্চা নিয়ে দিশেহারা অবস্থা। চাকরি করে না। হাই-ওয়েতে ড্রাইভ করতে ভয় পায়। ইন্সিওরেন্স, ইনভেস্টমেন্ট, অ্যাসেট, ট্যাক্স-রিটার্ন কোনও কিছুই বোঝে না।

অরিজিৎ বেঁচে থাকতে তার ওপর বড় বেশি নির্ভর করত। বাইরের জগৎ সম্পর্কে তখনও জয়িতার তেমন অভিজ্ঞতা হয়নি। অরিজিৎ যেন ওর চারপাশে আপাত নিরাপত্তার এক অলীক বাতাবরণ তৈরি করেছিল। বাইরের সব চাপ নিজের ওপরে নিতে চেষ্টা করত। জয়িতাকে ডে-কেয়ার সেন্টারে বাচ্চাদের রেখে চাকরি করতে দিত না। বলত—ইন্দ্র, মুনিয়া একটু বড় হোক। তারপর যা করতে চাও, করো। তখন জয়িতার শরীরটাও কি পলকা ছিল! কথায় কথায় ঠাণ্ডা লাগত। আজ টনসিলের ব্যথা, কাল জ্বর। অরিজিৎ সারা শীতকাল সাবধান করত। বরফ পড়লেই অফিস থেকে ফোন—'জয়ি, ঠাণ্ডায় বেরিও না। অসুখ ক রলে তোমার ডাবল শিফট্ কে সামলাবে? ও ভাবত দুটো বাচ্চা নিয়ে সংসার করাটাই সবথেকে শক্ত কাজ। রোজ অফিসে যাওয়া ছিল না বলে জয়িতার বেশী গাড়ি চালানোরও দরকার পড়ত না। শহরের মধ্যে চল্লিশ/পঁয়তাল্লিশ মাইল স্পিডে ড্রাইভ করতো। হাইওয়েতে উঠলেই নার্ভাস। চারটে প্যাচটা লেন জুড়ে সত্তর-আশি মাইল স্পিডে গাড়ি উঠছে। জয়িতার মনে হতো এত স্পীডে কন্ট্রোল রাখতে পারছে না। কোনওমতে একটা এক্সিট নিয়ে হাই-ওয়ে থেকে বেরিয়ে পড়ত। অরিজিৎকে স্টিয়ারিং ছেড়ে দিত। সে বিরক্ত হত। কিন্তু ওই পর্যন্তই। পরের সপ্তাহে ভুলে যেত। জয়িতাও আর উৎসাহ দেখাত না।

এখন ভাবে, কত অক্ষমতা নিয়েও সে কী নিশ্চিন্তে দিন কাটিয়েছিল। কখনও মনে হয়নি মুহূর্তের ঘটনায় নিরাপত্তার দুর্গ ভেঙে পড়বে। সমস্ত আশা, ভরসা প্রতিশ্রুতি অপূর্ণ রেখে অরিজিৎ চিরকালের মতো চলে যাবে। জয়িতার জীবনটাই বদলে যাবে।

সেই দুঃসময়ে কত মানুষ পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। দীর্ঘদিন ধরে জয়িতাকে সাহায্য করেছিল। স্বাবলম্বী হতে শিখিয়েছিল। ও তাদের আত্মীয়ের মতো ভাবে। রশিদভাই, সেলিমা, ভাবিও কম করেননি। অথচ মুনিয়া সে বাড়িতে যাবে না বলে দিল।

শেষ পর্যন্ত জয়িতাও আর পথিকের গান শুনতে গেল না। নিজের কিছু কাজ ছিল। সামনের সপ্তাহে স্কুলের ছেলে মেয়েদের সঙ্গে উইলিয়ামথ বার্গ যেতে হবে। সাইন-আপ করা ছাত্র ছাত্রীদের ফর্ম মিলিয়ে মিলিয়ে গ্রুপ প্রজেক্টর অ্যাসাইনমেন্ট তৈরি করল। এক গাদা বিল পেমেন্ট করার ছিল। তারপর লন্ড্রি শেষ করতে করতে বিকেল হয়ে গেল। সন্ধেবেলা মুনিয়া জিজ্ঞেস করল—'তোমার আজ কোথাও ইনভিটেশন নেই?'

জামাকাপড় ভাঁজ করতে করতে জয়িতা বলল—'ছিল। রশিদভাই-এর বাড়ি।'

—'সেই গানের প্রোগাম?'

—'তুই তো যাবি না বললি।'

—সেই জন্যে তুমিও গেলে না? মা, আমি কেন সব জায়গায় যাব?

—'ফোক মিউজিক শুনতে পারতিস। বাড়িতে তোর মিউজিক শুনে শুনে তো পাগল হয়ে গেলাম।'

—ইনস্ট্রুমেন্ট হলে যেতাম। বাংলা লাইট মিউজিক বেশ বোরিং। কিন্তু তুমি ক্যানসেল করলে কেন?'

—'দূর! একা একা যেতে আর ভাল লাগে না।'

মুনিয়া হঠাৎ চুপ করে গেল। সোফা থেকে ঝুঁকে পড়ে কফি টেবিলে রাখা ম্যাগাজিন তুলে নিল। পাতা ওলটাতে ওলটাতে মুখ তুলে বলল—'আমি কলেজে চলে গেলে কী করবে? কোথাও যাবে না?'

—'ইচ্ছে হলে যাব। তখন মনে হবে না উইক-এণ্ডে তুই একা একা বাড়িতে আছিস।'

কাচা জামাকাপড় ড্রয়ারে গুছিয়ে রেখে জয়িতা কিচেনে গেল। ফ্রিজ খুলে রাতের রান্না বার করে রাখল। ফ্যামিলি রুমের সোফায় ফিরে আসতেই মুনিয়া কাছে সরে এল। পাশ ঘেঁসে বসল। কিছু একটা বলবে বলবে করেও চুপ করে আছে দেখে জয়িতা একটু হাসল—'কীরে? বাইরে খেতে যাবার ইচ্ছে?' মুনিয়া ঘাড় নাড়ল। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ জিজ্ঞেস করল—'ক্যান আই অ্যাসক ইউ সামথিং?'

জয়িতা ভুরু কুঁচকে তাকাল—'কী বলবি?'

—'তুমি অন্য কিছু ভাবতে পারো না?'

—'কিসের ব্যাপারে?'

—'তোমার নিজের ব্যাপারে। তুমি কি এভাবেই থাকবে?'

—'এভাবে থাকব মানে?'

—'অল অ্যালোন! ফর দ্য রেস্ট অফ ইউর লাইফ?'

জয়িতা সহজভাবেই বলল—'কেন? তোরা আমাকে দেখতেও আসবি না?'

—'সে কথা বলছি না'—মুনিয়ার গলা ভার ভার শোনাল।

—'তাহলে কী বলছিস?'

—'এতদিন তুমি একা একা কী করে থাকবে মা?'

—'শরীরটা ঠিক থাকলে ভাবি না। অ্যাই ক্যান টেক কেয়ার অফ মাইসেলফ। যেদিন আর পারব না, তোরা নিয়ে যাবি।' মুনিয়া কোনও উত্তর দিল না দেখে জয়িতা যেন নিরাশ হল। গলার স্বরে অভিমান ফুটে উঠল—'নয়তো নার্সিংহোমে রেখে দিস। যদি সেনেলিটি এসে যায়, আমি তো চিনতেও পারব না কে আমার ছেলে মেয়ে।'

মুনিয়ার কষ্ট হচ্ছিল। খুব আস্তে আস্তে বলল—'জানতাম, তুমি এইসব বলবে। আমি জিজ্ঞেস করতেও চাইনি। ইন্দ্র যে কেন আজকাল এরকম কথা বলে...।'

জয়িতা সন্দিগ্ধ হল—'ইন্দ্র? কী বলেছে তোকে?'

মুনিয়া মার দিকে তাকাতে পারছিল না। কার্পেটের ওপর চোখ রেখে নীচু গলায় বলল—'মে বি উই শ্যুড অ্যাসক ইউ...ইউ ক্যানট লিভ লাইক দ্যাট। ইউ নিড সামওয়ান।'

ছেলেমেয়ে তাকে জীবনসঙ্গী খুঁজে নিতে বলছে। এ দেশে এমন বিবেচনায় অবাক হওয়ার কিছু নেই। তবু জয়িতা অবাক হল। ওরা কি মন থেকে বলছে? ইন্দ্র সত্যিই এতদূর ভেবেছে? উনিশ বছরে পৌঁছে মাকে আর তার আগের মতো দরকার নেই? মা নতুন করে জীবন শুরু করলে ওর অবাধ আধিপত্য হারিয়ে যেতে পারে ভেবেও কষ্ট হচ্ছে না?

মেয়েটার চোখে তবু জল ছিল। জয়িতা বোঝে ওদের স্মৃতিতে অরিজিতের ছবি ক্রমশ ঝাপসা হয়ে আসছে। ইন্দ্রর যেটুকু মনে পড়ে, মুনিয়ার তাও নয় কিন্তু চোদ্দ বছর পরে সেই অভাববোধ থেকে একজন 'ফাদার ফিগার' খুঁজছে—এ কথা জয়িতা বিশ্বাস করে না। ওদের সে ইচ্ছে, আবেগ, প্রত্যাশা কিছুই নেই। আজ যা কিছু ভাবছে, সে শুধু জয়িতার জন্যে। হয়তো বা ভবিষ্যতের দায়িত্ব এড়াবার জন্য। তীব্র অভিমান থেকে এরকম চিন্তাই তার মনে এল।

জয়িতার ধারণা ইন্দ্র খুব সম্প্রতি এইসব ভাবছে। কদিন আগে শান্তনু মজুমদারের মেয়ে নীতার সঙ্গে ইন্দ্রর দেখা হয়েছে। ওদের কলেজের সেমিনারে এসে ইন্দ্রকে নিয়ে লাঞ্চে গিয়েছিল। নীতাই ওকে বুঝিয়েছে। শান্তনু কি জয়িতা সম্পর্কে মেয়েদের কিছু বলেছিলেন? না হলে নীতা হঠাৎই ক্যালিফোর্নিয়া থেকে সেমিনারে এসে ইন্দ্রকে খুঁজে বার করবে কেন? মুনিয়াকে জিজ্ঞেস করে জয়িতার সেরকমই সন্দেহ হল। মুনিয়া বলল সাউথ-ইস্ট-এশিয়ান কনফারেন্সে এসে নীতা ওর বাবার কাছেই ছিল। নীতা ইন্দ্রকে বলেছে জয়িতাকে ওরা খুব পছন্দ করে। এর বেশী আর কী বলেছে, মুনিয়া ভাঙতে চাইল না। জয়িতার থমথমে মুখ দেখে ইন্দ্রর সব কথা আর বলতে সাহস করল না।

কয়েকদিন পর ইন্দ্র বাড়ি এল। মার সম্পর্কে তার নতুন চিন্তাভাবনার কথাগুলো বোনকে দিয়ে জানানো যে ঠিক হয়নি, বুঝেছে। নিজে থেকে সে প্রসঙ্গ সে তুলছিলো না। কিন্তু জয়িতা সোজাসুজি জিজ্ঞেস করল, ইন্দ্র তর্ক করে কিছু প্রমাণ করতে চাইছিল। ওদের জন্যে এখন আর মার 'স্যাক্রিফাইস' কবার কোনও দরকার নেই বলাতে জয়িতা হঠাৎ ফেটে পড়ল—'তুমি চাও আমি বিয়ে করি? সত্যি কথা বলো।'

—'তুমি যদি চাও, আমার দুঃখ হবে না। আমরা তো তোমার কাছে থাকছি না। কম্পানি দিচ্ছি না।'

—'সে জন্যে এত বছর পরে আমাকে একজন লোকের সঙ্গে থাকতে হবে? বাড়ি বিক্রি করে দিয়ে অন্য শহরে চলে যেতে হবে? কেন? তোমরা আর আমাকে চাও না? এই শহরে, এই বাড়িতে আর বেড়াতেও আসবে না?'

ইন্দ্র বলল—'তুমি ইমোশন্যাল হয়ে যাচ্ছো! প্রবলেমটা বুঝতেই চাইছো না।'

—কার' প্রবলেম? তোমার? তোমার গিলট ফিলিং-এর কথা ভেবে আমি কেন সব ছেড়ে চলে যাব ইন্দ্র?'

মুনিয়া বলে উঠল—'মাম, দিস ইজ ইওর লাইফ। ইন্দ্র ডোন্ট ইভন টক লাইক দ্যাট।

ঘর ছেড়ে যাওয়ার আগে ইন্দ্র বলল—'আ অ্যাম সরি ! আই ডিড্‌নট ওয়ন্ট টু হার্ট ইউ মাম্।'

জয়িতার দুঃখ হচ্ছিল। কার ওপর অভিমান করবে? ছেলেটা নিজের বিচারবুদ্ধি দিয়ে যা ভেবেছে, মার কথাই ভেবেছে। জয়িতা ওর ঘরে গেল। ইন্দ্র মাকে দেখে কী বলবে বুঝতে পারছিল না। জয়িতা ওর বিছানায় বসল। শান্তভাবে বলল—'আমার জন্যে ভাবিস না ইন্দ্র। নিজেকে নিয়ে ভালই তো আছি। স্কুল আছে, বন্ধুরা আছে। এখানে তো আমার কোনও কষ্ট নেই।'

—'তুমি কেন মুভ্ করে যাওয়ার কথা বলেছিলে, আমি বুঝতেই পারলাম না। তুমি কেন লাইফ স্টাইল চেঞ্জ করবে?'

—'তাহলে কি অন্য কেউ এখানে এসে থাকবে? সেটাও তো অ্যাডজাস্টমেন্ট। বিয়ে করব, অথচ কমপ্রোমাইজ করব না। লাইফ্ স্টাইল বদলাবে না, সেটা হয় না।'

—তোমরা এখনও এরকম ভাবো।'

—'ভাবি। ভাবতে ভাবতেই তো কোনদিন ডিসিশন নিতে পারলাম না। অ্যাণ্ড, আই ডোন্ট রিগ্রেট ফর দ্যাট।'

ইন্দ্র হাসল। মার সঙ্গে সহজভাবে কথা বলতে পেরে স্বস্তি পেল।

মাঝে অনেকদিন দীপান্বিতাদির সঙ্গে দেখা হয়নি। একদিন নিজেই চলে এলেন। ওঁর কাছেই জয়িতা শুনলো—শান্তনু মজুমদার বিয়ে করেছেন। 'ইন্ডিয়া অ্যাব্রড' কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে এক মাদ্রাজি মহিলার সঙ্গে আলাপ করেছেন। তার স্বামী বছর তিনেক আগে মারা গেছেন। মহিলার বয়স বেশি নয়। ছেলে মেয়েরাও ছোট ছোট, দায়িত্ব অনেক বেড়ে যাবে বুঝেও শান্তনু মন ঠিক করে ফেলেছেন। শিগগিরই বিয়ে।

দীপান্বিতাদি চায়ে চামচ নাড়তে নাড়তে বললেন—'ওঁর এই বয়সে রেসপন্সিবিলিটি একটু বেশি নিচ্ছে না? নিজের মেয়েরা সেটল করে গেছে! এখন আবার নতুন করে বাচ্চা মানুষ করা।'

জয়িতা অবাক হল—'তারা খুব ছোট নাকি?'

—'তাই তো শুনলাম। দুটোই এলিমেন্টরিতে পড়ে।'

—'তাহলে মহিলারই বা কত বয়স হবে? নিশ্চয়ই শান্তনু মজুমদারের চেয়ে অনেক ছোট?'

'—কে জানে? শান্তনুর কত হবে? মিড-ফিফ্‌টি?'

—'ওইরকমই বোধহয়।'

দীপান্বিতাদি হাসলেন—'তোমাকে তো ওঁর খুব পছন্দ ছিল। শুনলাম অ্যাপ্রোচও করেছিলেন?

জয়িতাও হেসে ফেলল — কি করে জানলেন?

—'নিজেই বলেছিলেন। আশা করেছিলেন তুমি বাজি হবে।

—'খুব পছন্দ ছিল কিনা জানি না। উনি সিঙ্গল মহিলা খুঁজছিলেন। বাঙালির বদলে মাদ্রাজিতেই তো রাজি হয়ে গেলেন! সঙ্গী পাওয়া নিয়ে কথা।'

—'তোমার সে কথা মনে হয় না?'

—'মনে হয়। মুশকিল হচ্ছে কাউকে 'খুব পছন্দ' হয় না!' দীপান্বিতাদি বললেন—'সিরিয়াসলি বলো তো, কেন তুমি আর বিয়ে করলে না?'

জয়িতা এক পলক থেমে থাকল। দীপান্বিতাদির দিকে চোখ তুলে ম্লান হাসল—'অনেক বাধা ছিল। কাটিয়ে উঠতে পারিনি।'

—'কিসের বাধা ছিল জয়িতা? তখন তোমার কত কম বয়স। দীপ্তেন্দু বিয়ে করতে চেয়েছিল। তুমি ওর কাছে সময় চাইলে।'

—'দীপ্তেন্দু অনেকদিন অপেক্ষা করেছিল। আমি মন ঠিক করতেই পারলাম না।'

—'তখন যদি ডিশিসন নিতে পারতে, হয়তো জীবনটা অন্যরকম হত।'

—'হয়তো হত। কী জানি?'—জয়িতা খানিক থেমে রইল। তারপর ধীরে ধীরে বলল—'আসলে অরিজিতের মৃত্যুটাই মেনে নিতে পারছিলাম না। মনে হত, হঠাৎ একদিন ফিরে আসবে। কতদিন যে একটা ঘোরের মধ্যে ছিলাম।

জয়িতা যেন নিজের সঙ্গে কথা বলছে। তার গলার স্বর ডুবে যাচ্ছে। দীপান্বিতা কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেলেন।

—'আপনারা বোঝাতেন। দীপ্তেন্দু আসত মাঝে মাঝে। কিন্তু কাউকে বোঝাতে পারতাম না। ভাবতাম অসম্ভব! রাতারাতি মানুষটাকে ভুলে যাওয়া যায়? এত সহজে আর একজনকে অ্যাকসেপ্ট করা যায়?'

জয়িতার গলায় বিষণ্ণতার আভাস। দীপান্বিতার মনে হল আজ অকারণ ওর বেদনা জাগিয়ে তুলেছেন। পরিবেশ হালকা করার চেষ্টায় বললেন—'জানি। ডিসিশনে আসা সহজ নয়। তবু ভবিষ্যতের কথা ভেবে...।'

জয়িতা সামান্য হাসল—'আর ভেবে কী লাভ? অনেকগুলো বছর তো কাটিয়ে দিলাম।'

সব কথা মানুষকে ঘোষণা করে বলা যায় না। ছেলে মেয়েকেও নয়। শুধু নিজের জন্যে নিজের কাছে কথা সাজানো যায়। জয়িতা পরে এই নিয়ে অনেকে ভেবেছে। নিজেকে বিশ্লেষণ করা আজ নতুন নয়। অরিজিৎ চলে যাবার পর থেকে দীর্ঘদিন এই বোঝাপড়া চলেছে। দ্বিতীয়বার বিয়ে করা নিয়ে কোথায় যেন সংশয় ছিল। মানুষ সম্পর্কে অবিশ্বাস ছিল। নিজের জন্যে যত না ভেবেছে, ইন্দ্র, মুনিয়াকে নিয়ে তার বেশি চিন্তা ছিল। ওদের সেভাবে শাসন করতে পারত না, ইন্দ্র তখন যেমন জেদী, তেমনি দুরন্ত। সারাক্ষণ এটা ছুঁড়ছে, সেটা ভাঙছে। মুনিয়ার সঙ্গে খাওয়া নিয়ে ঝামেলা। কথায় কথায় কান্না আর বায়না। দোকানে গিয়ে পুতুল আর খেলনার বাক্স টেনে নামাত। কিনে না দিলে কেঁদে অস্থির। জয়িতা বাধ্য হয়ে চড়-চাপড় দিত। বাড়ি ফিরে দেখত মুনিয়া আবার ওর হাতভাঙা পুতুল আর চোখের মণি খসে যাওয়া আধময়লা খরগোশ নিয়ে খেলতে বসেছে। টিভিতে নতুন নতুন খেলনার ছবি দেখে ঘাড় কাৎ করে জয়িতাকে বলছে—ভাল মেয়ে হলে দেবে?

জয়িতার মায়া হত। বাচ্চাদের কতরকম খেলনা থাকে। ও তাদের কিই বা কিনে দেয়? একটা বারবি ডল সেটের যা দাম, ওর মনে হয় তা দিয়ে তিন দিনের বাজার হয়ে যাবে। মুনিয়ার দুটো ড্রেস কিনতে পারবে। আসলে তার অভাব, অক্ষমতা কিছুই ছিল না। অরিজিতের ইন্সিওরেন্স ছিল। এয়ারলাইন্স থেকে কমপেনসেশন দিয়েছিল। কিছুটা অভিজ্ঞতার অভাবে, কিছুটা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের চিন্তায় জয়িতা কিভাবে কি খরচ করবে বুঝে উঠতে পারত না। ও নিজে তখন চাকরি করত না। মুনিয়া ফিফথ গ্রেডে যাওয়ার পর আবার পড়াশোনা শুরু করেছে। টিচিং লাইসেন্স পাস করেছে। ছেলে, মেয়ের কলেজে পড়ার খরচ আর নিজেদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে শখ শৌখিনতার জন্যে বেশী খরচ করতে পারত না। বাচ্চাদের যখন তখন খেলনা কিনে দেওয়া নিয়ে দীপ্তেন্দুও নানা কথা বলত। ওদের জেদ আর বায়না দেখে বিরক্ত হত।

সে সময় জয়িতা দীপ্তেন্দুর ব্যবহারে ধৈর্য্যের অভাব লক্ষ করত। এ জন্যে ভেতরে ভেতরে সতর্ক হয়ে উঠেছিল। দীপ্তেন্দুকে ইন্দ্র, মুনিয়ার স্টেপ ফাদার হিসেবে ভাবতে ভাল লাগত না। শব্দটার মধ্যে কেমন যেন দূরত্ব ছিল। চাইল্ড-অ্যাবিউজ্ আর রান-অ্যাওয়ে চিলড্রেন মানেই স্টেপ-ফাদারের অত্যাচার, টিভি আর কাগজের এইসব খবর জয়িতাকে বিভ্রান্ত করত। সব মানুষ সমান হয় না জেনেও সে দীপ্তেন্দুর ওপর বিশ্বাস রাখতে পারছিল না। জয়িতা ভয় পেত। দীপ্তেন্দুকে সে ওপর ওপর দেখেছে। একসঙ্গে না থাকলে মানুষকে চেনা শক্ত। দীপ্তেন্দুর কাছে অনাকাঙ্ক্ষিত দায় হয়ত কোনও দিনও বন্ধন হয়ে উঠবে না। স্নেহহীন, শীতল, ক্ষণভঙ্গুর এক সম্পর্কের মধ্যে জয়িতা কেন তার ছেলে মেয়েকে ঠেলে দেবে? মা হয়েও সে কত সময় ধৈর্য হারিয়ে ফেলে। বিরক্ত হয়। সেখানে অনাত্মীয়ের কাছে কতটুকু প্রশ্রয় আশা করা যায়? হয়তো বিয়ের পরে রোজ রোজ অশান্তি হবে। দীপ্তেন্দু ওদের শাসন করতে চেষ্টা করবে। অবাধ্যতার জন্যে ইন্দ্রকে মারধর করবে। মুনিয়াকে শাস্তি দেবে। ওদের শিক্ষা দেওয়া দরকার বলে জয়িতাকেও বোঝাবে। এইসব পরিস্থিতি কল্পনা করে জয়িতা

দীপ্তেন্দুকে ক্রমশই দূরে সরিয়ে দিচ্ছিল। এত অবিশ্বাস আর ভয় নিয়ে কি মানুষের হাত ধরা যায়?

অথচ মন থেকে বিয়ের চিন্তা একেবারে মুছে ফেলতে পারছিল না। কখনও মনে হত ইন্দ্র, মুনিয়াকে ভাল করে মানুষ করার জন্যেই তার বিয়ে করা দরকার। বিদেশে স্বজনহীন পরিবেশে সে একা একা কত দায়িত্ব নেবে?

কখন শীতের ঋতু এলে নিদারুণ শূণ্যতার প্রগাঢ় বিষণ্ণতা থেকে সে উপলব্ধি করত— এভাবে বেঁচে থাকার কোনও অর্থ হয় না। দেহ মনের তীব্র আকাঙ্খার দ্বার বন্ধ রাখার নিরন্তর যুদ্ধে সে ক্রমাগত হেরে যাচ্ছিল। অরিজিতের স্পর্শ ভুলে যাচ্ছে। তার কণ্ঠস্বর হারিয়ে যাচ্ছে। নিঃস্তব্ধ রাতে জয়িতার চেতনার গভীরে যেন অন্য এক বলিষ্ঠ পুরুষ তাকে আকর্ষণ করছে। আচ্ছন্ন আবেশে সে কখনও তার মুখ স্পষ্ট দেখেনি। দেহবোধ থেকে তার ঘ্রাণ, স্পর্শ, পৌরুষের প্রবল উত্তাপ অনুভব করেছে। তাকে আবিষ্কার করেছে। অবরুদ্ধ আবেগে, গভীর বাসনায় সে কোনও অপরিচিত অথবা অর্ধপরিচিত পুরুষের সান্নিধ্য কামনা করত।

শেষ পর্যন্ত দীপ্তেন্দু আর অপেক্ষা করল না। দেশে গিয়ে বিয়ে করে এল। জয়িতা ওর বউকেও দেখেছিল। এখন আর যোগাযোগ নেই। ওরা বোধহয় হিউসটনের দিকে চলে গেছে। তারপরেও চেনাশোনা লোকেরা বিয়ের কথা তুলেছে। কাগজের ম্যাট্রিমনিয়ল কলামে ডিভোর্সি নয়তো বিধবা মহিলার জন্যে ভারতীয়দের বিজ্ঞাপন চোখে পড়েছে। জয়িতা ভেবে দেখেছে ছেলে মেয়েরা ছোট থাকতেই বরং বিয়ে করা সহজ ছিল। এখন ওদের বয়ঃসন্ধির সময় সে আর জটিলতা বাড়াতে চায় না। এ এক স্পর্শকাতর বয়স। কখন যে রাগ হয়, কখন অভিমান, ওদের 'মুড্' বুঝতেই প্রাণান্ত। জয়িতা আর নতুন করে মান অভিমানের কারণ হতে চায় না।

ওর নিজের পক্ষেও একা থাকাটা ক্রমশ কনভিনিয়েন্ট হয়ে যাচ্ছে। অরিজিৎ বেঁচে থাকতে সংসারের অনেক ব্যাপারেই মাথা ঘামাত না। বাইরের কাজও তেমন আশা করত না। সেদিক থেকে দেখলে জয়িতা বারবার নিজের ইচ্ছেতে চলেছে। অরিজিতের সঙ্গে ওই ক'বছরে ভালই আণ্ডার-স্ট্যাণ্ডিং হয়েছিল। যখন চলে গেল পরিস্থিতির চাপে জয়িতা একাই সবদিক সামলাতে বাধ্য হল। সেই যে নিজের মতো করে বেঁচে থাকার শুরু, আজও সেভাবে চলছে। ইন্দ্র, মুনিয়া একটু বড় হলে জয়িতা শক্ত হাতে রাশ টানতে চেষ্টা করেছে। 'প্রোটেকটিং মাদার' থেকে 'ডমিনেটিং' মাদার হয়েছে। আমেরিকার এই মুক্ত সমাজে বাস করে দুটো টিন-এজারকে মানুষ করা সহজ নয়। ড্রাগ, ফ্রি-সেক্স, অ্যালকোহল, ডিপ্রেশন, সমস্যা তো একটা নয়। সব সময় সতর্ক থাকা। সিঙ্গল-পেরেন্ট হয়ে জয়িতার দায়িত্ব আরও বেড়ে গেছে। সেই সঙ্গে কর্তৃত্বও বেড়েছে। এ বাড়িতে জয়িতার ইচ্ছের বিরুদ্ধে কিছু করা কঠিন। মা বন্ধুর মতো ব্যবহার করতে চেষ্টা করলেও ইন্দ্র, মুনিয়া জানে তাদের স্বাধীনতার গণ্ডি কতদূর। এখনও পর্যন্ত মানিয়ে নেবার দায়টা তাদেরই বেশি।

এই অধিকার হারানোর কথা জয়িতা ভাবতে পারে না। ছেলেমেয়েকে একরকম বশে রেখেছে। কিন্তু চল্লিশের ওপরে পৌঁছে বিয়ে করা মানে, একজন নতুন লোকের অভ্যেস, চাহিদা, রুচিবোধ সবই তাকে মানিয়ে নিতে হবে। এ বয়সে কারুর চরিত্র বদলায় না। সে যা, তাই-ই থাকে। জয়িতা কীভাবে তার অভ্যস্ত জীবনকে বদলাবে? সূক্ষ্ম স্বার্থচিন্তা, অহংবোধ, কর্তৃত্বের প্রবণতা তাকে ক্রমশ আত্মকেন্দ্রিক করে তুলেছে। ছেলেমেয়ে ছাড়া তার

কোনও বন্ধন নেই। অবলম্বন নেই। দেশের আত্মীয় স্বজনের সঙ্গেও যোগাযোগ কম। বাকি যা কিছু, সামাজিকতা, সৌজন্যের সম্পর্ক। কোথাও কৃতজ্ঞতার টান। তার বেশী নয়। এ পর্যায়ে এসে কোনও ব্যক্তিগত স্থায়ী সম্পর্কের আশায় বড় রকম ঝুঁকি নিতে সাহস হয় না। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্ব বাড়বে। সেবা, যত্নের দায় থাকবে। প্রেম, ভালবাসা, মায়া, মমতা রাতারাতি জন্ম নেয় না। জয়িতা লক্ষ করেছে দিন দিন তার ধৈর্য্য কমে যাচ্ছে। কোনওরকম ইমপোজিশন ভাল লাগে না। ইন্দ্র, মুনিয়ার জন্যেই সে যা কিছু করতে ভালবাসে। অন্য কারুর সঙ্গে সেরকম সম্পর্ক হওয়া সম্ভব নয়। সময় খুব বড় জিনিস। আজ অরিজিৎ বেঁচে থাকলে দীর্ঘ দাম্পত্য জীবনের যাবতীয় অনুভূতি থেকে তাকে যা দেওয়া সম্ভব হত, জয়িতা জানে না, জীবনের মাঝামাঝি এসে তেমন সম্পর্ক গড়ে ওঠে কিনা? হৃদয়ের সেই উৎসমুখে আর কখনও ফিরে যাওয়া যায় কিনা? তার মাথার মধ্যে হাজার হিসেব নিকেশ ঢুকে পড়ে। সাহচর্যের ইচ্ছে, প্রয়োজন, কিছুই আর অনুভব করতে দেয় না। জয়িতা হঠাৎ হঠাৎ নিজেকে বোঝায়—বেশ আছি।

ক্রিসমাসের ছুটির শেষে স্কুল খোলার মুখে জয়িতা চেক বই নিয়ে বিল পেমেন্ট করতে বসেছিল। ক্রিসমাস শপিং-এর জন্যে ক্রেডিট কার্ডে অনেক বিল হয়েছে। নানা দিকে নানা খরচ। এ বছর আর দূরে কোথাও বেড়াতে যাবে না। ইন্দ্রর কলেজের পেমেন্ট করতে করতেই মুনিয়ার কথা ভাবতে হচ্ছে। স্টেট কলেজে পড়লে তবু একরকম। প্রাইভেট কলেজে পাঠানো মানে প্রায় ডবল খরচ। বছরে বাইশ/চব্বিশ হাজার ডলার। চার বছর টানতে হবে। মুনিয়া আই ভি লিগ কলেজে চান্স পেলে যেভাবেই হোক পড়াতে হবে। অরিজিৎ থাকলে এত ভাবতে হত না। তাও ওর ইন্সিওরেন্স আর সেভিংস ঠিকমতো ইনভেস্ট করে করেই এতদিন চালিয়ে আসছে। হয়তো প্রথম দিকে ছেলেমেয়েদের নিয়ে অকারণ কষ্ট করেছে, তখন সব মিলিয়ে যা হাতে এসেছিল, ইচ্ছে করলে অনেক খরচপত্র করেই থাকতে পারত। কিন্তু তখন এমন এক অনিশ্চয়তার ভয় পেয়ে বসেছিল, যে অপচয়ের চিন্তাই করতে পারত না। অথচ পরে কত ডলার নষ্ট হল। রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় ইনভেস্ট করে প্রচুর লস হল।

এখন যে গুজরাটি ফাইনান্সিয়াল প্ল্যানার জয়িতাকে স্টক, বন্ড কিনিয়ে দেন, তাঁর বুদ্ধি আর পরামর্শের ওপর নির্ভর করে মোটামুটি ভালই চলছে। জয়িতার চাকরিটাও অনেক দিনের। বিলগুলো পেমেন্ট করার পর জয়িতার খেয়াল হল কানাডার ম্যাগাজিন 'দেশান্তরীর' চাঁদা পাঠানো হয়নি। তারা আবার একটা গল্প চেয়ে পাঠিয়েছে। চাঁদার চেক আর গল্প একসঙ্গেই পাঠিয়ে দেবে। জয়িতা একটা মিষ্টি প্রেমের গল্প লেখার কথা ভাবছিল। পরপর দুঃখের গল্পের বদলে এবার একটা সুখের গল্প হোক। যেন মৈনুলদের উত্তর দেবে বলেই কাগজ কলম নিয়ে বসল।

দু-চার পাতার খসড়া করতে গিয়েই জয়িতা বুঝল কাজটা মোটেই সহজ নয়। ঝপ্ করে প্রেমের গল্প বানানো যায় না। নায়ক নায়িকাই খুঁজে পাচ্ছে না! চোখে দেখা চরিত্র বলতে এখানকার ইণ্ডিয়ানদের নিয়েই যদি লেখে, তো জয়িতাদের জেনারেশনে মিষ্টিমধুর প্রেমে মশগুল লোক কোথায়? সাজেগোজে বয়স ধরা যায় না ঠিকই। কিন্তু বেশীর ভাগ বাঙালি কেরিয়ার, ফ্যামিলি আর কমিউনিটির মধ্যে মাতব্বরী নিয়ে ব্যস্ত। প্রেমের সময় কোথায়? এক আধটা অ্যাফেয়ার যে হচ্ছে না, তা নয়। কিন্তু প্রেমপর্ব স্থায়ী হচ্ছে না। ঝটপট বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। যেমন শান্তনু মজুমদার। বিয়ের জন্যে একদম রেডি। এরকম 'স্বামী সিনড্রোম'

থাকলে জয়িতা তার মুখে কী ধরনের সংলাপ বসাবে? গভীর রাত পর্যন্ত টেলিফোনে কণ্ঠস্বর? দূর! এক লাইন অন্তর অন্তর ' লোনলি লোনলি' বলে দীর্ঘনিশ্বাস...নাঃ, আন্দাজে বয়স্কদের উচ্ছ্বাস বর্ণনা করা যাবে না।

অবৈধ প্রেমও এখন বিশেষ শোনা যাচ্ছে না। সেই কবে নিউইয়র্কের পান্না তার বরের বন্ধু অশোকের সঙ্গে 'এয়ার ইন্ডিয়ায়' আসার পথে এক ব্ল্যাংকেট গায়ে দিয়েছিল আর নিউইয়র্কে পৌঁছে তিন দিনের মাথায় অশোকের গাড়ি চেপে ভার্জিনিয়া চলে গিয়েছিল, কিংবা ওয়েস্ট চেস্টারের রূপক সরকার, যে নাকি ঘন ঘন প্রেমে পড়ে আগের দুটো বউকে তাড়িয়ে বাংলা সিনেমার এক নায়িকাকে বিয়ে করে এনেছে—এদের গল্প এখন বস্তাপচা হয়ে গেছে। কানাডাতেও চালানো যাবে না।

কিন্তু নতুন স্টকই বা কোথায় পাচ্ছে? অফিসে-টফিসেও খুচরো প্রেম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বোধহয়, 'অ্যাডালটারেশন', 'বিগ্যামী' চার্জ বিচ্ছিরি মামলা টামলার ভয়েই আর কেউ ও প্রেমের পথ মাড়াচ্ছে না। মিষ্টি প্রেমের সাহসই নেই। কিন্তু উদাহরণ না দেখলে একেবারে মন থেকে চরিত্র সৃষ্টি করা যায়? প্রথম জেনারেশনের মধ্যে পছন্দমতো স্পেসিফিকেশন না পেয়ে জয়িতা সেকেন্ড জেনারেশনের দিকে ঝুঁকল। তারা তো প্রায়ই প্রেমে পড়ছে। কথায় কথায় 'ক্রাশ'। কথায় কথায় ব্রেক-আপ। আবার নতুন বন্ধু হচ্ছে। এদের নিয়েই মিষ্টি গল্প হবে। জয়িতা অবশ্য নিজের ছেলে মেয়েকে এর মধ্যে টানবে না। মুনিয়ার বয় ফ্রেণ্ড নেই। থাকলে জয়িতা টের পেত। তাছাড়া মা হয়ে ওভাবে চিন্তা করে লেখা যায় না। ইন্দ্রকে পুনম ত্রিপাঠী নামে একটা মেয়ে খুব ফোন করত। ক্যারেনের সঙ্গেও ইন্দ্রর হাইস্কুল থেকে যোগাযোগ। কিন্তু এরা কেউ ওর গার্লফ্রেণ্ড নয়। এখন ক্যাম্পাসে প্রীতি আহুজার সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছে। মেয়েটা ধোপে টিকলে হয়। ইণ্ডিয়ান বউ হলেই জয়িতা খুশী হবে। হঠাৎ মন্দিরাদির কথাটা মনে পড়ে ভীষণ হাসি পেল। বলেছিলেন—'আমাদের বরাতে ঠিক সুজি/ক্যাথী জুটে যাবে।' ওঁর ছেলে জয় যখন ফিলিপিনো ডাক্তার মেয়েকে বিয়ে করল, তখন আবার যেন সুজি/ক্যাথীর জন্যেই দুঃখ উথলে উঠল। ওরিয়েন্টাল চেহারা পছন্দ নয়। কী আর করা যাবে? সবচেয়ে ভাল বলেছিলেন মিস্টার দুবে। ভাবলে এখনও হাসি পায়। বলেছিলেন—'লেড়কি তো ফরেনার সে শাদী করেগী।' দুবের মেয়ের আমেরিকান বয়ফ্রেণ্ড হল ফরেনার! কে যে কার দেশে এসেছে বোঝা মুশকিল!

জয়িতার গল্প কিন্তু একপাতাও এগোল না। পাত্র পাত্রীই ঠিক করতে পারছে না। চারদিকে নজর রাখতে হবে। নিজে জুনিয়ার-হাই স্কুলে পড়ায়। তাদের বয়স বেশি নয়। তা-ও হাইস্কুলের ছাত্রছাত্রীদেরও তো দেখছে। বন্ধু আর প্রতিবেশীদের ছেলে মেয়েদেরও দেখছে। গল্প একটা ঠিক দাঁড়িয়ে যাবে। সুখের গল্পের জন্যে জয়িতাকে একটু বেশী ভাবতে হবে, এই যা। জয়িতা সেদিনের মতো উঠে পড়ল।

জয়িতার স্কুল খুলে গেল। মুনিয়ার এ বছর পড়াশোনার খুব চাপ। তার ওপর হাইস্কুলের থিয়েট্রিক্যাল প্রোডাকশনে ঢুকেছে। ওদের ড্রামা টিম 'ওয়েস্ট সাইড স্টোরি' করছে। মিউজিক্যাল প্লে। নিউইয়র্কের গরিব পাড়ার পর্টুরিক্যাল মেয়ের রোলের জন্যে মুনিয়ার ট্রাই আউট করার ইচ্ছে ছিল। শেষ পর্যন্ত রিহার্সালে অনেকটা সময় যাবে বুঝে আর চেষ্টা করল না। জয়িতারও ইচ্ছে ছিল না। এখন মুনিয়া প্রোডাকশন টিমে ঢুকেছে। কসটিউমস আর স্টেজ ক্র্যাফট নিয়ে ব্যস্ত।

একদিন সন্ধেবেলা মন্ট্রিয়ল থেকে দেশান্তরীর' সম্পাদকের ফোন এল। জয়িতাকে বললেন—'আপনার গল্প তো পাঠালেন না? কবে নাগাদ মেইল করছেন?'

জয়িতা আন্দাজে একটা সময় বলে দিল। গল্পটার কথা মাথায় ছিল। কিন্তু সময় করে বসা হচ্ছিল না। সেদিন রাতে তোড়জোড় করে লিখতে বসল। আবার সেই কাটাকুটি। পাত্র পাত্রীর সংলাপ বদলানো। আশ্চর্য! কোনভাবেই যেন কাহিনী দানা বাঁধছে না! প্রেমের গল্প লেখা এত কঠিন? হতাশ হয়ে সে নিজেকেই প্রশ্ন করল—কেন আমি স্বাভাবিক অনুভূতি থেকে লিখতে পারছি না? স্মৃতি নিয়েও তো গল্প হয়। অরিজিতের ভালবাসার গল্প লেখা যায় না? কিন্তু কোথায় শেষ করব? তাকে কীভাবে বাঁচিয়ে রাখব? সুখের গল্পের জন্যে তার তো বেঁচে থাকার কথা ছিল।

জয়িতা ভাবছিল— আমিও কি সুখের মধ্যে বেঁচে আছি? কতো বছর ধরে নিজেকে ক্ষয় করে চলেছি। দীর্ঘ একাকিত্ব, বিচ্ছেদের যন্ত্রণার মাঝে আমার ভালবাসার গল্প হারিয়ে যাচ্ছে।... সে অসহায়ভাবে উপলব্ধি করল প্রেমহীন, শীতল, নিরুচ্ছ্বাস জীবন তার কল্পনাশক্তিকে অক্ষম করে রেখেছে। মাতৃত্বের ভারে তার ভোগ ও ইচ্ছাসুখের দুটি ডানা কবে পঙ্গু হয়ে গেছে।

শীত শেষ হয়ে বসন্ত এল। সারাদিন এলোমলো হাওয়া। ন্যাড়া ওক গাছে একটি দুটি নতুন পাতা উঁকি দিচ্ছে। সামনের ডগ-উড গাছ রাতারাতি ফুলে ছেয়ে গেছে। হাওয়ায় ভাসছে সাদা, সবুজ রেণু। বুনো ঝোপে নীল প্রজাপতি। শীতের ঘুম ভেঙে টিউলিপ মাথা তুলছে। পিটুনিয়ার গা ঘেঁসে ফুটে আছে অবহেলার ঘাসফুল। কেনেডিয়ান মেপ্‌লের লাল পাতায় সোনালী রোদের ঝিলিমিলি। কাচের দরজায় আলো ছায়ার রঙিন আলপনা। খুব হাওয়া উঠেছে। বসন্তের সকালে জয়িতা নামহীন এক পাখির ডাক শুনল—টুটুই টুটুই.....টুটুই টুটুই...

পাখিটা প্রতি বছর বসন্তের মুখে আসে। নাকি একই জাতের অন্য পাখি আসে? এক একা ডেকে ডেকে পাড়া মাতায়। সঙ্গী নেই। দল নেই রবিন্, ব্লু-জে, কার্ডিনাল কারুর সঙ্গে তার খেলা নেই। সারাদিন শুধু আপন মনে টুটুই টুটুই... টুটুই টুটুই...। সকালের রোদ বাগানের গাছগাছালি ছুঁতে না ছুঁতেই জয়িতা পাখিটার মিষ্টি ডাক শুনতে পায়। আজ বাগানে এসে চেরী গাছের নিচু ডালে তাকে দোল খেতে দেখল।

মুনিয়া কদিন ধরে অ্যালার্জিতে ভুগছে। নাক বন্ধ, মাথা ভার, জ্বর জ্বর ভাব। বাতাসে ফুলের রেণু উড়ছে। র‍্যাগউইড থেকে ওর অ্যালার্জি শুরু হয়েছে। এরপর অন্য গাছের ' পোলেন কাউন্ট' বাড়লেও হাঁচি কাশি আরম্ভ হবে। জয়িতা ওকে নিয়ে ডাঃ মহান্তির অফিসে গেল।

ডাঃ মহান্তির বউ লিপি খুব গল্প করে। ডাক্তারের অফিসে রিসেপশনের কাজ আর ফাইলিং করতে করতে সমানে রুগীদের সঙ্গে হাসি গল্প চালিয়ে যায়। জয়িতার সঙ্গে ওদের অনেকদিনের আলাপ। মুনিয়াকে দেখে ডাঃ মহান্তি 'হে ফিভার'-এর ওষুধ লিখে দিলেন। ওঁর অফিসে নতুন এক ডাক্তার এসেছে। ফর্সা, রোগা, ছোটখাট চেহারা। চিবুকে অল্প দাড়ি। নাম কৃষ্ণ ডুভুরি। জয়িতা আন্দাজে ধরে নিল— তেলেগু ডাক্তার? পূর্বপুরুষ বোধহয় ডুবুরী নয়তো নুলিয়া ছিল। কোস্টাল কানেকশন ধরে ডাঃ মহান্তির সঙ্গে ভাব হয়েছে। ওড়িয়া ডাক্তার তেলেগু ডাক্তারকে বিজনেস পার্টনার করে নিয়েছেন।

কিন্তু লিপি ভুল ভাঙাল। সে ঝড়ের বেগে কথা বলে। সেই টেম্‌পো বজায় রেখেই বলল— 'হিজ পেরেন্টস্ আর ফ্রম কর্ণাটক। বাট সেটলড ইন ক্যারিবিয়ানস্। দেয়ার ওরিজিন্যাল লাস্ট-নেম ওয়াজ দাভোরি।'

লিপি তার পরেই চোখ টিপল। আমেরিকান রুগি আর নতুন ডাক্তারের কান বাঁচিয়ে গুন গুন করে বলল—' চেনাশোনা ভাল মেয়ে আছে? ডাঃ ডুভুরির একটু বিয়ের ইচ্ছে হয়েছে।'

জয়িতাও গলা নামিয়ে জিজ্ঞেস করল—'বয়স কত? এতদিন কোথায় কাজ করেছে?' লিপি ফিসফিস করে যাচ্ছে—০'থার্টি ওয়ান।' বাবা, মা সেন্টমার্টিনে থাকে। ফ্যামিলিতে সবাই ডাক্তার। কৃষ্ণ ইনভেসিভ কার্ডিলজিতে স্পেশ্যালটি করেছে।

—'ঠিক আছে। চেনাশোনা মেয়েদের বলে দেখব।'

লিপি কপি-মেশিন থেকে কাগজ বের করতে করতে হাসল—'যদি ফোন নাম্বার দাও, ওকেই ফোন করতে বলব। নিজেরা কথা বলে নেবে।'

—'ঠিক আছে। ওর একটা বিজনেস কার্ড দিয়ে দাও। এত ডি-টেইলস মনে থাকবে না।'

গাড়িতে উঠে মুনিয়ার জেরা শুরু হল—'তুমি কার সঙ্গে বিয়ের কথা ভাবছ? হি ইজ থার্টি ওয়ান!'

—'কেন? ঋতুর সঙ্গে হতে পারে। ওর তো আঠাশ বছর। চোখ কুঁচকে মুনিয়া বলল—'মা! ঋতু কেন ওকে বিয়ে করবে? তুমি যা তা সম্বন্ধ দিচ্ছ।'

জয়িতা রেগে গেল—'বাজে বকিস না! এটা যা তা সম্বন্ধ? ইন্ডিয়ান ডাক্তার। জনস্ হপ্‌কিনস থেকে রেসিডেন্সি করেছে।'

'—তাহলেই বা কী? বেশ ফানি চেহারা! দাড়ি রেখে একদম বিলি গোট।'

—'ফানি চেহারা! ঋতুই বা কী দেখতে? তুমি কিন্তু ওর বোনকে কিছুছু বলবে না। আমি ফোন নম্বর দিয়ে দেব। তারপর ওরা বুঝবে।'

মুনিয়া গাড়ি চালাতে চালাতে হেসে উঠল—'একটু কিন্তু ফানি আছে মা! তার ওপর স্ট্যামার করছিল।'

—'তুই এত লক্ষ করলি কখন? কটা কথাই বা বলল যে স্ট্যামার করে বুঝে গেলি? নিজে তো সমানে হাঁচছিলি...।'

মার রাগ দেখে মুনিয়া মজা পাচ্ছিল—'দেখলে না কথা আটকে আটকে যাচ্ছিল? কিরকম থেমে থেমে বলছিল! অ্যান্টিহিস্ট্যামিন বলতে গিয়ে কতবার অ্যা অ্যা করে তারপর পুরোটা বলতে পারল।'

জয়িতা একটু দমে গেল—'একবার বলছিস ফানি দেখতে! একবার বলছিস তোতলা! এরকম ইম্প্রেশন দিলে ঋতু আর বিয়ে করতে চাইবে?'

—'তাই তো বলছি। ফোন নাম্বার দিও না। মিসেস মহান্তি বলেছে বলেই তোমাকে ম্যাচ মেকার হতে হবে? পরে দেখবে ঋতুরা আমাদের ওপরেই রেগে যাবে।'

জয়িতা কথা বাড়াল না। মনে মনে ঠিক করল মুনিয়ার বাজে কথায় কান দেবে না। ডাক্তারটাকে ওর বেশ লেগেছে। কী সুন্দর ব্যবহার! অরবিন্দ প্যাটেলের মেয়ের সঙ্গেই সম্বন্ধ করবে। ঋতুর কম বয়স হল? এরপর ভাল ছেলে পাবে কোথায়? একটু দাড়ি আর তোতলামোর জন্য ডুভুরিকে হাতছাড়া করা উচিত নয়। মুনিয়া তো আর বিয়ে করছে না। ওর অত কথা কিসের?

দু'দিন বাদে জয়িতা অরবিন্দ প্যাটেলকে ফোন করল। ডুভুরির ব্যাপারে অরবিন্দ বেশ আগ্রহ দেখালেন। গুজরাটি নয় বলে খুঁতখুঁত করলেন না। মেয়ের বিয়ের জন্যে ব্যস্ত হয়েছেন বোঝা গেল। অরবিন্দর ইচ্ছে নিজে আগে ডাঃ মহান্তির সঙ্গে কথা বলবেন। ডাঃ ডুবুরির সম্পর্কে

আরও খোঁজখবর নিয়ে তারপর ঋতুকে ফোন করার জন্য বলবেন। জয়িতা দুটো ফোন নম্বরই দিয়ে দিল।

সপ্তাহের পর সপ্তাহ কেটে যাচ্ছে। জয়িতার গল্প নিয়ে বসা হচ্ছে না। যেদিন লিখতে বসবে বসবে করছে, অরবিন্দ প্যাটেলের ফোন এল। মাঝে ওদের সঙ্গে আর কথা হয়নি। ঋতুর খবরটাও নেওয়া হয়নি। অরবিন্দ ফোনে বললেন—

—'কৃষ্ণ ডুভুরির বাবা, মা সেন্টমার্টিন থেকে এসেছেন। দেখা হয়েছে নাকি?'

—'আমি ওঁদের চিনি না। ডাঃ মহান্তির সঙ্গে কথা হয়নি অনেকদিন। ব্যাপারটা কিছু এগোল?

—'সে অনেক কাণ্ড!'

—'কেন? কী হল?'

—'ঋতুর সঙ্গে কৃষ্ণর আলাপই হচ্ছিল না। ছেলেটা এত 'শাই'। ফোনই করে না। এদিকে ঋতু বলে দিয়েছে আমরা কোনও ইনিসিয়েটিভ নিতে পারব না। যার বিয়ের ইচ্ছে, তাকে ফোন করতে হবে।'

জয়িতা সায় দিল—'ঠিকই তো—একটা অ্যাডাল্ট ছেলে! আমেরিকায় আছে। সে ফোন করতে পারছে না?'

অরবিন্দর গলায় স্নেহ ঝরে পড়ল—'এদেশে তো বড় হয়নি। ক্যারিবিয়ানে ছিল। একটু 'আউট-অফ প্লেস' ফিল করে বোধহয়। শেষ পর্যন্ত অবশ্য নিজেই ফোন করল।'

—'তারপর? ঋতুর সঙ্গে দেখা করেছে?'

—'প্রথমে তো দু'চার দিন ফোন করেই হয়ে গেল। ঋতুরও ইন্টারেস্ট দেখলাম না। ভাবলাম, ওদের যখন দেখা করারই ইচ্ছে নেই, বিয়ের কথা তো ওঠেই না।'

—'ডক্টর মহান্তিকে ফোন করেছিলে? ওঁরাই তো ডঃ ডুভুরির বিয়ে বিয়ে করে সম্বন্ধ দিলেন।'

—'মিসেস মহান্তি নিজেই ফোন করেছিলেন। কৃষ্ণ নাকি ওঁদের বলেছে, সে তো তিনবার ফোন করেছিল। আশা করেছিল ঋতু কল ব্যাক করবে। কেন ফোন করছে না বলে মিসেস মহান্তি আমাদেরই চাপ দিতে বললেন।

জয়িতা প্রমাদ গুনলো। ঋতু কি তবে ফোনেই টের পেয়ে গেছে? ডুভুরির তোত্‌লামো ধরে ফেলেছে? সেইজন্যেই পাত্তা দিচ্ছে না? অরবিন্দ প্যাটেলকে জিজ্ঞেস করল—'ঋতুর কি এখন বিয়ের ইচ্ছে নেই? তাহলে আর চাপ দিয়ে কী কববেন?'

—'না, না। চাপ দেব কেন? আমরা ঋতুকে কিছু বলিনি।' জয়িতা অবাক— 'তাহলে ডুভুরির বাবা, মার কথা বলছেন যে? ওঁরা এলেই বা কী হবে? বিয়ে তো করবে ছেলে।'

অরবিন্দ বললেন—'সেইজন্যেই এসেছেন। এনগেজমেন্টের পরে ফিরে যাবেন।'

—'তার মানে অ্যারেঞ্জড ম্যারেজ? ডাক্তারটা অদ্ভুত তো। অন্য মেয়ে দেখার আগে ঋতুকে একবার মিট করতেও পারল না!'

অরবিন্দ সায় দিলেন—'না, সে ঋতুর ফোনের ভরসায় বসে থাকল। এদিকে আবার ব্ল্যাক বেল্ট!'

জয়িতা আরও অবাক—'কে ব্ল্যাক বেল্ট? কৃষ্ণ ডুভুরি? আপনি এত খবর পাচ্ছেন কী করে?'

অরবিন্দ ফোনে খুবই সোচ্চার—'ক্যারাটের জন্যেই তো বিয়েটা হচ্ছে।' জয়িতা অরবিন্দ প্যাটেলের কথাবার্তা বুঝতে পারছে না। একটা ডাক্তার ছেলে হাতছাড়া হয়ে গেল, সেদিকে দুঃখ নেই। উল্টেতার বিয়ের খবর, ক্যারাটে শেখার খবর, সব জেনে বসে আছে। আশ্চর্য! জয়িতা তবু সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করল—'যাক্ গে। ঋতুর সঙ্গে হয়নি ভালই হয়েছে। মুনিয়া বলছিল ছেলেটা নাকি একটু ষ্ট্যামার করে । আমি অবশ্য বুঝতে পারিনি...।'

অরবিন্দ কথা কেড়ে নিলেন—'না, না, একটু সময় নিয়ে কথা বলে। বলুক। তাড়ার কি আছে? ডাক্তারগুলো তো আজকাল আমাদের একদম সময়ই দেয় না! কৃষ্ণ অনেকক্ষণ ধরে কথা বললে পেশেন্টরাও খুশী হবে।'

জয়িতা হতভম্ব। প্যাটেল এত খুশী কেন? তাহলে কি ঋতুর সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে? এত ভনিতা করছে কেন? মাঝখান থেকে জয়িতা নিজেই ডুভুরিকে 'তোত্লা' বলে ফেলল। প্যাটেল ডিফেন্ড করছে মানেই...অরবিন্দর হাসি ভেসে এল—'ঋতুর পছন্দ হয়েছে, এতেই আমরা রিলিভড্। আপনাকে থ্যাংকস দেবার জন্যে দু'দিন ফোন করেছি। পাইনি।'

জয়িতা খুশী হয়ে উঠল—'কী আশ্চর্য! ঋতুর সঙ্গেই বিয়ে হচ্ছে বলবেন তো! তা নয়, ডুভুরি তিনবারের বেশী ফোন করেনি, ঋতুর ইন্টারেস্ট নেই...আমি ভাবলাম সম্বন্ধটা আর কাজে লাগল না।'

অরবিন্দ হাসল—'সেরকমই হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ ওদের দেখা হয়ে গেল। কো-ইন্সিডেন্স. না ভগবানের যোগাযোগ বলতে পারি না। শেষেরটাই সম্ভব।'

জয়িতার গলায় কৌতূহল—'কী করে দেখা হল? ডক্টর মহান্তিরা কিছু অ্যারেঞ্জ করেছিলেন নাকি?'

—'না না। হসপিটালে আলাপ হয় গেল। ঋতুর বন্ধু ক্যারেনের বাবার বাইপাস হল। কৃষ্ণ তো সেন্ট ভিনসেন্ট হসপিটালে অ্যাটেন্ডিং ফিজিশিয়ান। ঋতু কদিন ক্যারেনের সঙ্গে দেখতে যাচ্ছিল। ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলার সময় ব্যাজে নাম দেখে বুঝতে পেরেছে। ও নিজের নাম বলতে কৃষ্ণও বুঝেছে। ক্যারেন তখন ওদের ক্যাফেটেরিয়ায় নিয়ে গেছে। তারপর এই ব্যাপার! আমরা খুবই খুশী।'

জয়িতা বলল—'খুব ভাল খবর অরবিন্দ ভাই। আপনাদের কনগ্র্যাচুলেট করছি। ঋতুকেও বলবেন। হসপিটালে গিয়ে যে বর পাওয়া যায় জানতাম না।'

এনগেজমেন্টের নেমন্তন্ন করে অরবিন্দ প্যাটেল ফোন রেখে দিলেন। মুনিয়া টিভি দেখতে দেখতে মার কথা শুনতে পাচ্ছিল। জয়িতা ফোন নামিয়ে রাখতেই জিজ্ঞেস করল—'ঋতু ডক্টর ডুভুরিকে বিয়ে করছে? সে কি মা?'

জয়িতা যেন জিতে গেছে—'কেন? হাসির কী আছে? ভাল ফ্যামিলি, প্রফেশন্যাল ছেলে। ঋতু আর কি এক্সপেক্ট করে?'

মুনিয়া পা নাচাতে নাচাতে হাসছিল—'বিলি গোট তোমাকে ভীষণ ইমপ্রেস করেছে।'

—'তোকে ছাড়া সবাইকে ইমপ্রেস করেছে! অরবিন্দরা কী খুশী!'

—'সে তো ইন্ডিয়ান আর ফিজিশিয়ান বলে। তোমরা সবাই যা চাও।'

জয়িতা হঠাৎ নিজেই হেসে ফেলল—'হ্যাঁরে, সত্যি ডুভুরি তোত্লা? তুই সিওর?'

—'হ্যাঁ মা! সমানে কথা আটকে যাচ্ছিল। কিন্তু তুমি যে কি করো? অরবিন্দ আংকলকে বলতে গেলে কেন? শুনলে বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে।'

—'আগে তো সেটা বলেনি। প্রথমে এমন ভাব দেখাচ্ছিল, যেন ডাক্তারটা অন্য কাউকে বিয়ে করছে। সেই জন্যে তোত্‌লা বলেছি।'

দু'জনে খানিক হাসাহাসি করল। গল্প করতে করতে রাত বাড়ছিল। টিভিতে এগারটার খবর শুরু হতে মুনিয়া মাঝপথে বন্ধ করে দিল। সোফা থেকে উঠে পড়ে জয়িতাকে হাত নেড়ে বলল—'আবার তুমি গল্প লাগিয়েছো। আমার কোনও কাজ হল না।'

'—এখন শুয়ে পড়। কাল তো ছুটি।'

মুনিয়া শুতে গেল না। কমপিউটার নিয়ে বসল। কলেজ অ্যাপ্লিকেশনের জন্যে 'এসে' লিখতে হচ্ছে। অনেক সময় চলে যাচ্ছে। আজও রাত হবে। জয়িতা ওর টেবিলে দুধ আর চকলেট চিপ কুকি রেখে দিল। বাড়ির সব আলো নিভিয়ে নিজের ঘরে গেল।

বিছানায় কাগজপত্র পড়ে আছে। গল্পটা এক পাতার বেশি এগোয়নি। প্রেমের গল্প লেখার দুঃসাধ্য সাধনায় জয়িতা বিছানায় উঠে বসল। জানলার পাশে ভিজে মাটির গন্ধ। অসময়ে বৃষ্টি নেমেছে। আকাশের ঘন অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে জয়িতা বহুদূরে লাল বিন্দুর মতো প্লেনের আলো দেখতে পেল। কোথাও ঝড় ওঠেনি। উন্মত্ত হাওয়ার গর্জন নেই। তবু এক ভীষণ শব্দে আক্রান্ত হবার আগে সে নিজের মধ্যে প্রতিরোধ তৈরি করছিল। যেন সে নিজেকে বোঝাতে চাইছিল—আমি তো সহ্য করে নিয়েছি। যা গেছে, তার জন্যে বিহ্বল হয়ে, যা আছে, তা হারিয়ে বসিনি। তবে কেন ওই শব্দে আবার প্রলয়ের ছবি দেখি? ভয়ঙ্কর অনুষঙ্গ থেকে মুক্তি পাই না?

জয়িতা তার গল্পের প্রথম পাতার দিকে চেয়েছিল। কিছু অন্যমনস্ক। ভালবাসার জন্যে অপেক্ষা করতে করতে প্রেমের গল্পের উপাদান খুঁজে পায়নি। শোক তাকে কতকাল অন্ধ করে রেখেছিল। বিষাদের ধূসর আবরণের আড়ালে, আচ্ছন্নতার মাঝে জীবনকে পূর্ণ দৃষ্টি মেলে দেখা হল না। অথচ আজ, এই লেখালেখির মুহূর্তে কাছে, দূরে অস্পষ্ট রেখাচিত্রের মতো একটি দুটি ঘটনার আভাস জেগে উঠছে।

জয়িতা যেন নিজের কাছে অঙ্গীকার নিল। তার সব গল্পের নদী দুঃখের মোহনায় হারিয়ে যাবে না। কেবলই 'ক্যাথারোসিস' নয়। বেদনা দিয়ে হৃদয়ের পরিশোধন নয়। তার ভালবাসার গল্পে পার্থিব জীবন বিচিত্র রঙে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। অরিজিৎ আসবে। দীপ্তেন্দু আর শান্তনু থাকবে। ঋতুর সঙ্গে কৃষ্ণ থাকবে। স্মৃতি, কল্পনা, সুগভীর প্রত্যয় থেকে সে বর্ণময় জীবনের ছবি আঁকবে।

জয়িতা লিখছিল। প্রথম সুখের গল্পের সংলাপ রচনা করতে করতে এক সময় থেমে গেল। কিভাবে শেষ করবে, এখনও ভেবে উঠতে পারছে না। সাহিত্যিক শংকরের কথা মনে পড়ল। জয়িতাকে বলেছিলেন—আসল কথা হচ্ছে টেক-অফ আর ল্যান্ডিং। ওই দুটি ভাল হলে গল্প নিজের গতিতে ভেসে চলে।

সারাদিনের ক্লান্তিতে জয়িতার ঘুম আসছিল। কাল রবিবার। দিনের বেলা আবার লেখা নিয়ে বসবে ভেবে কাগজপত্র টেবিলে সরিয়ে রাখল। মুনিয়ার ঘরে আলো নিভে গেছে। জয়িতা বিছানায় ফিরে এল। অন্ধকারে বৃষ্টির শব্দ শুনতে শুনতে সে 'পারফেক্ট' ল্যান্ডিং কথাটা ভাবছিল। নিয়ন্ত্রণের পূর্ণ অধিকার সে শুধু গল্পেই নিতে পারে। সেখানে আকাশ যাত্রায় অমোঘ নিয়তি বলে কিছু নেই। বিপর্যয় নেই। মৃত্যু নেই। জীবনের প্রথম ভালবাসার গল্পকে সে নিরাপদ অবতরণে পৌঁছে দেবে। যেখানে বসন্তের বাগানে সূর্যস্নানের মুহূর্তে একটি নামহারা পাখির ডানা স্পর্শ করবে আর একটি পাখি।

অন্য জীবন

দোতলার জানলা দিয়ে গাড়িটা দেখতে পেয়ে কাকা, কাকিমা নীচে নেমে গেলেন। রুম্পাও চটি ফট্‌ফটিয়ে এগোচ্ছিলো। মা বললেন, "তুই এ ঘরে থাক। আমি বরং সিঁড়ির মুখটায় গিয়ে দাঁড়াই।"

রুম্পা ফিরে এলো। পড়ার টেবিলে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললো— "বাবাঃ, একদম ঘড়ি ধরে চলে এসেছে। এগারোটা তো এগারোটা। ভাগ্যিস কারেন্ট এসে গেলো। ... ইস্‌, তোর মুখটা পুরো ঘেমে গেছে।"

রুমাল দিয়ে নাকের ঘাম মুছে বললাম— "এই গরমে সেজে গুজে বসে থাক্‌ না তুই। কখন থেকে কারেন্ট নেই। তার মধ্যে মা জোর করে সিল্ক পরালো।"

সিঁড়ি বেয়ে আসা জুতো, চটির শব্দ, কথার আওয়াজ পেয়ে রুম্পা চট করে পর্দার পাশ থেকে দেখে নিলো। খাটের কাছে এসে বললো— "শাশুড়ী কি সেন্ট্‌ মেখেছে রে। গন্ধ পাচ্ছিস?"

সত্যি। ঘরে দারুন একটা গন্ধ ঢুকে পড়েছে। কেমন বিদেশ বিদেশ গন্ধ। বিয়ে বাড়িতেও হঠাৎ করে পাই। সেই অচেনা সুগন্ধ এ মুহূর্তে আমাদের ঘর, বারান্দায় ভেসে বেড়াচ্ছে।

বসার ঘরে কথাটথা শুরু হয়েছে। তারপরেই হা হা হাসির শব্দ। রুম্পা ভুরু তুলে বললো— "কে আবার এত হাসছে রে? তোর শ্বশুর? না আরেকজন যিনি এসেছেন?"

আমি হেসে ফেললাম— "চুপ করতো। শ্বশুর আবার কি? চিনি না, শুনি না। ক-জন এসেছে রে?"

— "আমেরিকার পার্টি দু-জন। ছেলের দাড়িওয়ালা বাবা আর মা। সঙ্গে এক বুড়ো ভদ্রলোক আর তাঁর বউ বোধ হয়। আত্মীয়-টাত্মীয় হবে।"

আবার হাসির শব্দ। রুম্পা বলে উঠলো- "ঐ দ্যাখ্‌, আবার অট্টহাসি দিচ্ছে। এ নিশ্চয়ই ছেলের বাবা। চেহারাটাও দেখলাম পাগ্‌লা মাষ্টার টাইপের।"

হঠাৎ এত হাসির কি হলো? আমার কাকা তো চুপচাপ মানুষ। মাও নতুন আলাপে গল্প জুড়বেন না। কাকিমাই যা মজার মজার কথা বলেন। তা বলে আজ নয়। আজ শুধু ভদ্রতা করার দিন। আমাকে দেখানো, তার সঙ্গে বাড়িশুদ্ধু লোকের আতিথেয়তা আর ভদ্রতার পরীক্ষা হবে। হাসি, ঠাট্টা তাহলে যাঁরা এসেছেন, তাঁরাই শুধু করেছেন।

পর্দা সরিয়ে কাকিমা এলেন। আমাকে একবার ভালো করে দেখে নিয়ে হাত

বাড়ালেন— "চল্ পুপু, এবার ও ঘরে যাই। এমনি, একটু কথা-টথা বলে চলে আসবি ঐ, যা জিজ্ঞেস-টিজ্ঞেস করবেন ওঁরা ..."

রুম্পা জিজ্ঞেস করলো— "এত হাসছিলেন কে গো? ছেলের বাবা? সমানে গলা পাচ্ছি।"

কাকিমা হাসলেন— "হ্যাঁরে, ভদ্রলোক বেশ রসিক। এসেই গল্প জুড়ে দিয়েছেন। ওঁরা নাকি দশ/পনের মিনিট আগেই গলির মোড়ে এসে গিয়েছিলেন। কিন্তু এগারোটা বাজেনি বলে ওঁর বউ কিছুতেই গাড়ি থেকে নামবেন না। বাকি দুজন নেমে পড়ার জন্যে ব্যস্ত। গরমে ঘেমে সেদ্ধ হচ্ছে সবাই। তবু এগারোটা না বাজলে আমাদের বাড়িতে ঢুকতে পারছেন না ..."

কাকিমার কথার মাঝখানে মা এসে দাঁড়ালেন। কাকিমাকে বললেন— "তোমার কথা আর শেষ হয় না। পুপুকে এবার নিয়ে যাও। ওঁদের আবার যাওয়ার তাড়া আছে। খাবার দাবার গুলোও তো সাজাতে হবে।"

কাকিমা মাথা নাড়লেন— "সব গুছিয়ে রেখেছি। পরে আর একবার চা দেবো।"

রুম্পা কামিজের ওপর ওড়না জড়িয়ে নিয়ে বললো— "আমাকে বোলো কাকিমা। আমি করে দেবো।"

আমরা বসার ঘরে গেলাম। ঘর জুড়ে সেই মিষ্টি অপরিচিত গন্ধ। সোফার একধারে যে মহিলা বসে আছেন, তাঁর সঙ্গেই প্রথম আমার চোখাচোখি হোলো। কাকে দিয়ে প্রণাম শুরু করবো ভাবছি। আন্দাজে দাড়িওয়ালা ভদ্রলোকের সামনে দিয়ে নিচু হতে তিনি বাধা দিলেন। ওঁর স্ত্রীও পা ছুঁতে দিলেন না। আমার হাত ধরে পাশে বসালেন। রুম্পার কথা থেকে বুঝেছিলাম এঁরাই আমেরিকা থেকে এসেছেন। সুমিত আর শোভনা দত্ত।

মহিলা কথা শুরু করলেন— "তুমি পূর্বা? নামটা তো ভারী সুন্দর।"

ওঁর স্বামী মাথা নাড়লেন— " ইয়েস্, ভেরী সাজেস্টিভ নেম্! তুমি পূর্বা। আমরা পশ্চিম থেকে তোমায় দেখতে এসেছি। হাঃ হাঃ।"

কাকা বললেন— "আমার দাদা রেখেছিলেন। ও তো আমাদের ফ্যামিলিতে প্রথম জন্মেছিল। তাই পূর্বা। এ বাড়ির চার ছেলে মেয়ের নামই দাদার দেওয়া।"

দেওয়ালে বাবার ছবি। কাকা সেদিকে তাকিয়ে কথা শেষ করলেন। ওঁরাও বাবার ছবি দেখছিলেন। বয়স্ক মতো অন্য ভদ্রলোকটি বললেন— " উনি তো বেশ কম বয়সেই মারা গেছেন। কি হয়েছিলো? হার্টের প্রব্লেম।

মা উত্তর দিলেন— "ব্রেন ক্যানসার। মাঝে মাঝে মাথার যন্ত্রণা হতো। স্কুলে পড়াতেন। চোখের তো বিশ্রাম ছিল না। বলতেন ঐ জন্যেই মাথা ধরছে। রোগ যখন ধরা পড়লো, তখন আর কিছুই করা গেলো না।" সুমিত দত্ত বললেন— "ভেরী স্যাড্! ইট্স্ সাচ্ আ গ্রেট লস্ ফর দ্য ফ্যামিলি ..."

বাবার কথা হতে হতে ওঁরা আমার কথায় ফিরে এলেন। মহিলা যে খুব বেশী প্রশ্ন করলেন তা নয়। আমার পড়াশোনা কতদূর, "হবি" কি, আমেরিকায় যেতে ইচ্ছে করে কিনা এ সবই জানতে চাইছিলেন। শেষ প্রশ্নটা শুনে বললাম— "আমেরিকায় বেড়াতে যেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু পুরোপুরি থাকার কথা ভেবে দেখিনি।"

উনি একটু হাসলেন— "যদি এখনই ভেবে দেখতে বলি। তাহলে?"

— "তাহলেও একটু সময় লাগবে। বাড়ির সবাইকে ছেড়ে অতদূরে থাকা। ইচ্ছে হলেও তো আর চলে আসতে পারবো না।"

সুমিত দত্ত বললেন— "কেন পারবে না? মাঝে মাঝে বেড়াতে আসবে। মাকেও নিয়ে যাবে।"

আমি চুপ করে থাকলাম। শুধু তো মা নয়, আমার বোন রুম্পা, কাকা, কাকিমা, ওঁদের দুই ছেলে নীলু আর দেবু, বাবা যাদের নাম রেখেছিলেন নির্মাল্য আর দেবমাল্য, এদের ছেড়ে কোথাও থাকিনি কখনো। একবার অতদূর দেশে গেলে সহজে কি আসা হবে? হয়ত দু-তিন বছর ওদের দেখতেও পাবোনা।

শোভনা দত্ত আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন— "আমরাও তো কত কম বয়সে বাইরে চলে গিয়েছিলাম। তখন উনি ষ্টুডেন্ট। তিন-চার বছর দেশে আসতে পারিনি। তখন ফোন করাও অ্যাফোর্ড করতে পারতাম না। কবে একটা চিঠি আসবে বলে বসে থাকতাম। তবে ওখানে কাজের এত ব্যস্ততা যে দিনগুলো কেটেও যায় তাড়াতাড়ি। দেখতে দেখতে বছর ঘুরে যায়।"

অন্য মহিলা এতক্ষণ আমাকে মন দিয়ে দেখছিলেন। তিনি বলে উঠলেন—" আজকাল এদেশেও তাই। আমার মেয়ে পুণায় থাকে। ডাক্তার। ছেলে ব্যাঙ্গালোরে। বছরে যদি ওরা একবার কোলকাতায় আসে, তো তাই অনেক। সারাক্ষণই তাদের কাজ।"

শোভনা দত্ত এবার মার দিকে ঘুরে বললেন— "আপনার কি ইচ্ছে? মেয়েকে বাইরে বিয়ে দিতে আপত্তি নেই তো?"

মা আমার দিকে তাকালেন। তারপর বললেন— "না সেরকম কিছু নয়। মেয়ে যেখানেই থাক, ভালো থাকলেই হোলো। আমাদের এ পাড়ায় দুজনের কানাডায় বিয়ে হয়েছে। মাঝে মাঝে আসে। ভালোই তো আছে মনে হয়। তবে পুপু যা বললো, ভেবে চিন্তে দেখুক। আমরা দু-একদিনের ভেতরেই আপনাদের জানাবো।

ওঁরা কি একটু হতাশ হলেন? আমেরিকা থেকে এসে নিজেরা খোঁজ খবর নিয়ে মেয়ে দেখতে এসেছেন। আগেই কাকাকে ফোনে জানিয়েছেন বিয়েতে কোনো জিনিষপত্র নেবেন না। বিয়ে হবে রেজিষ্ট্রি করে। মেয়ের বাড়িকে ওঁরা রিলিফ্ দিতে চান। আমার ছবি দেখে ওঁদের পছন্দ হয়েছে। এরপর সামনা সামনি দেখে ডিসিশন নেবেন।

মাঝখান থেকে আমিই এখন ভেবে দেখার জন্যে সময় চাইছি। মাও সেটা সমর্থন করলেন। এটা বোধ হয় ওঁরা আশা করেননি। আমি তো সুন্দর-টুন্দর নই। ইউনির্ভাসিটিতেও যাইনি। বাড়ির অবস্থা খুবই সাধারণ। এরকম মেয়ের সঙ্গে আমেরিকার ছেলের বিয়ের সন্ধান এলে বাড়ীর লোকের তো খুশী হওয়ার কথা। কিন্তু আমার উত্তরের পরে ওঁরা যেন আর কথাবার্তা এগোতে পারছেন না।

কাকিমা খাবারের ট্রে নিয়ে এলেন। ওঁদের চারজনকে প্লেট-টেট্ সাজিয়ে দিচ্ছেন। সুমিত দত্ত সেদিকে তাকিয়ে বললেন— "আরে সর্বনাশ! এত খাবার? আমরা তো ব্রেকফাস্ট করে বেরিয়েছি। এখান থেকে আবার লাঞ্চে তাজবেঙ্গলে যেতে হবে।"

কাকিমা তবু মহিলার হাতে প্লেট তুলে দিতে যাচ্ছিলেন। উনি মাথা নাড়লেন— "অসম্ভব! এখন কিছু খেতে পারবো না। আমাদের এতবার করে খাওয়ার অভ্যেস নেই। ইস্ ... শুধু শুধু কত খাবার আনালেন।"

কাকিমা বললেন— "শুধু মিষ্টিটাই কেনা। কচুরি আর চপ বাড়িতে করেছি। একটা অন্ততঃ খান।"

আমি এই সুযোগে উঠে পড়ছিলাম। সুমিত দত্ত ডাকলেন— "ঠিক আছে। পূর্বা, তুমি বলো কোন্‌টা তুমি বানিয়েছো। আমি সেটাই খাবো।"

আমি অপ্রস্তুত হয়ে হাসলাম— "আমি কিছু করিনি। কাকিমা আর মা করেছেন।"

বাকি দুজন তখন প্লেট নিয়ে বসেছেন। সেই মহিলা কচুরী খেতে খেতে বললেন— আপনি দেখছি আগেকার শ্বশুরদের মতো কোয়েশ্চেন করছেন সুমিত দা। আমেরিকায় কি রান্নার জন্যে বউ নিয়ে যাচ্ছেন?"

কাকিমা হেসে ফেললেন— "না, না, পুপু রান্না মোটামুটি জানে। বই থেকে নতুন খাবার টাবার বানায়।"

মা বললেন— "আপনারা একটু কিছু তো খাবেন। প্রথম দিন এলেন ...।"

শোভনা দত্ত একটা চপ্‌ তুলে নিয়ে বললেন— "হয়তো আবার আসবো। আমাদের তো পূর্বাকে ভালোই লেগেছে। এবার আপনারা ভেবে চিন্তে দেখুন। একটু তাড়াতাড়ি জানাবেন কেমন?"

কাকা উত্তর দিলেন— "নিশ্চয়ই। আমি দু-চার দিনের ভেতরেই আপনাকে জানাবো। হ্যাঁ, আর একটা কথা। আপনাদের ছেলের ছবি আনবেন বলেছিলেন ...।

সুমিত দত্ত স্ত্রীর দিকে তাকালেন— "ছবিটা আনা হয়েছে তো? ওঁদের দিয়ে যাও।"

চলে আসছিলাম। ওঁদের ছেলের ছবি দেখার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকবো কেন? কৌতূহল যে হচ্ছিলো না তা নয়। কিন্তু পরে তো দেখবোই। ওঁদের নমস্কার করে বললাম— "আমি একটু ভেতরে যাচ্ছি।"

গিন্নী মতো মহিলা বললেন "হ্যাঁ, এসো"। ওঁর স্বামী চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে বললেন— "পূর্ব থেকে পশ্চিমে যাবে কিনা ভাবো। ভালো করেছো দুদিন সময় চেয়েছো। বিয়ে তো তোমার। আমরা হচ্ছি শুধু অ্যারেঞ্জার আর স্ক্যাভেঞ্জার। যেখানে খাবার দেখবো, ঝাঁপিয়ে পড়বো!"

সকলে হেসে উঠলেও শোভনা দত্ত মুখ তুললেন না। ব্যাগ খুলে কি যেন খুঁজছেন। আমি বেরিয়ে এলাম।

সেদিন কথাবার্তা সেরে ওঁরা চলে গেলেন। মা তখনো গয়নার বাক্সটা হাতে বসে আছেন। শেষকালে ওঁরা কেন যে এটা দিয়ে গেলেন। আমি তখন খাটে রুম্পার পাশে শুয়ে আছি। গরমে অস্থির হয়ে সিল্কের শাড়ী ছেড়ে চুড়িদার পরে নিয়েছি। ও ঘরে কি হোল না হলো সব বলছি। রুম্পা অবশ্য পরে গিয়ে দেখা করে এসেছিল। মা চাননি ও প্রথমেই ওঁদের সামনে যাক। রুম্পা মার মতো হলুদ হলুদ গায়ের রং পেয়েছে। এ-বাড়ির হাইট পেয়েছে। আমরা ওকে বেশ সুন্দরী ভাবি। মার বোধহয় মনে হয়েছিল, ওঁরা যদি আমার বদলে রুম্পাকেই পছন্দ করে বসেন। তাই একেবারে যাওয়ার মুখে ওকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

তারপরে যখন আমরা নিজেদের মধ্যে গল্প করছি, আবার পর্দার ওপার থেকে সেই সেন্টের গন্ধ এলো। কাকিমার গলা পেলাম— "পুপু, রুম্পু তোরা কি এঘরে?" বলতে বলতে ভেতরে ঢুকলেন। সঙ্গে মা আর দুই মহিলা।

তাড়াতাড়ি উঠে বসলাম। ওঁরা চলে যাচ্ছেন। বোধ হয় আমাদেরও সিঁড়ির কাছে যাওয়া

উচিৎ ছিল। কিন্তু বাড়িতে মেয়ে দেখানোর পরে সে ও আবার এগিয়ে-টেগিয়ে দিতে যায় কিনা কে জানে? এখন দেখছি এঁরাই চলে যাওয়ার আগে দেখা করতে এসেছেন। আমরা খাট থেকে নেমে দাঁড়ালাম।

শোভনা দত্ত বলে উঠলেন— "বোসো, বোসো। তখন তোমায় দেওয়া হয়নি। তোমার জন্যে একটা গিফ্‌ট্ এনেছিলাম। এই নাও, ধরো।"

মেরুন রং-এর ভেলভেটের বাক্স খুলে আমার হাতে দিলেন। ভেতরে লম্বা চিক্‌চিকে সোনার হার। সঙ্গে ঝোলা দুল আর আংটি।

মা, কাকিমা অবাক হয়ে গেছেন। আমি ঠিক বুঝতে পারছি না কি করবো? এরকম গয়নার সেট্ তো দেখি বিয়েতে দেয়। আমার জন্যে উনি এত দামি জিনিষ নিয়ে এসেছেন। নিতে খুব অসোয়াস্তি হচ্ছিলো। উনি বুঝতে পেরেছিলেন। হারটা খুলে আমাকে পরিয়ে দিয়ে বললেন— "তোমার লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই। মনে করো, এক মাসী তোমাকে গিফ্‌ট দিলেন"।

আমি কেমন অভিভূত হয়ে পড়লাম। গয়না পাওয়ার জন্যে নয়। বিয়ের ব্যাপারে কোনো আশ্বাস না পেয়েও উনি জিনিষটা দিয়ে দিলেন? আমার প্রতি এক অচেনা মহিলার এই অযাচিত দান হাতে পেয়ে নিতে পারছিলাম না।

কাকিমা আমার মন বোঝেন। শোভনা দত্তর হাত ধরে বললেন— "আজ থাক্ না। বিয়ের কথা পাকাপাকি হোক। তখন দেবেন।"

মা ভীষণ কুণ্ঠিত— "আমিও তাই বলছি। কথাবার্তা তো একরকম হয়েই রইল। তবু, ধরুন যদি কিছু এধার ওধার হয় ...। এত দামি জিনিষ নিয়ে বড় লজ্জায় পড়ে যাবো।"

শোভনা দত্ত কারুর কথা শুনলেন না। মা কে বললেন— "হাতে করে পরিয়ে দিলাম। ফিরিয়ে দেবেন? না হয় আমার ছেলের সঙ্গে বিয়ে না ই হোলো। যেখানেই পূর্বার বিয়ে হোক, ওর জন্যে একটা প্রেজেন্ট্ রেখে গেলাম প্লীজ, না বলবেন না।"

মা কাকিমা আর জোর করতে পারলেন না। আমায় গলায় চিক্‌চিকে লম্বা হার। হাতে ধরা বাক্সে দুল আর আংটি। ওঁকে প্রণাম করবো কিনা ভাবছি। বারান্দা থেকে কাকা ডাকলেন— "বউদি, এঁদের দেরি হয়ে যাচ্ছে।"

ওঁরা চলে যাবার পর হারটা খুলে মার হাতে দিয়ে দিলাম। ব্যাপারটা আমাদের বেশ অসোয়াস্তিতে ফেলেছে। কাকা শুনে বললেন— "গয়নাটা বোধ হয় আশীর্ব্বাদ-টাদ করবেন বলে এনেছিলেন নাকি? তা, এত তাড়া কিসের? আমি তো দু দিন পরেই জানাতাম।"

রুম্পার সোজাসুজি কথা— "আমার মনে হোচ্ছে দিদিভাইকে রাজি করানোর জন্যে গয়নাটা আগেই দিয়ে রাখলেন। কিন্তু ওঁদের ছেলেকে আনলেন না কেন? শুধু ছবি দেখে তোমরা রাজি হয়ে যাবে?"

মা বললেন— "আমিও তাই ভাবছি। এঁরা হয়ত লোক ভালো। বাইরে থাকা শিক্ষিত ফ্যামিলি। কিন্তু ছেলেকে না দেখে বিয়ের কথা দিই কি করে। সে নাকি বিয়ে ঠিক হলে আসবে ..."।

কাকিমা বললেন— "ছবি দেখে কিন্তু ভালোই লাগলো। মুখখানা শান্ত ধরনের। পুপু, ছবি দেখেছিস?"

আমি মাথা নাড়লাম। ছবি আর দেখবো কখন? গয়না নিয়েই তো কথা শেষ হচ্ছে না। কাকিমা তখন খামটা এনে দিলেন।

ছবি দুটো দেখছি, রুম্পাও ঝুঁকে পড়লো। এক ঝলক দেখে নিয়ে মন্তব্য করলো— "মুখটা পাগ্‌লা মাষ্টারের সঙ্গে মেলে। শুধু দাড়ি নেই।"

কাকা অবাক— "পাগ্‌লা মাষ্টার? সে আবার কে?" কাকিমা টেবিলে ভাত দিচ্ছিলেন। হাসতে হাসতে বললেন— "তোর সব তাতে ইয়ার্কি। কেন? ছেলের চেহারা কিছু খারাপ? কি রে পুপু? তোর পছন্দ হয়েছে?"

আমি তখনও ছবি দেখছি। এর নামই তাহলে সুমন? রোগা রোগা চেহারা। চশমার আড়ালে শান্ত, উদাস দৃষ্টি। একটা ছবিতে কালো কোট, টাই পরে দাঁড়িয়ে আছে। হাতে বেহালা। কোনো ফাংশানে তোলা বোধ হয়।

শুধু দুটো ছবি দেখে একজন মানুষকে আন্দাজ করে নিতে হবে। একবার সামনা সামনি দেখা হবে না। কথা হবে না। অথচ তাকে ঘিরেই আমার ভবিষ্যত। আমার আশা, আকাঙ্খা, স্বপ্নের পরিণতি। এই মুহূর্তে যদি আমি না বলে দিই, জানি কেউ আমার ওপর জোর করবে না। কিন্তু না যে বলবো, সেরকম কোনো স্পষ্ট কারণও যে খুঁজে পাচ্ছি না।

— "কি রে? ছবি দেখা যে শেষই হচ্ছে না! খেতে বসবি না? বেলা দুটো বেজে গেলো।"

কাকিমার ডাকাডাকিতে রান্নাঘরের দিকে যাওয়ার সময় মার গলা শুনলাম—" আসল কথা হোলো ভাগ্য। আমরা তো বিয়ের রাতেই বরকে দেখেছিলাম। খারাপ মানুষের হাতে তো পড়িনি। আর তোদের এখন যতো প্রেমের বিয়ে, ততো ঝগড়া, ততো ডিভোর্স"।

রুম্পা তর্ক চালিয়ে যাচ্ছিলো। আমি খেতে বসে শুনছিলাম। যেন আমারই মনের কথা। একবার রুম্পার কথায়, একবার মার কথায়, দুই বিপরীত ভাবনার প্রতিধ্বনি শুনছি।

সন্ধ্যেবেলা দেবু, নীলু কলেজ থেকে ফিরে সব শুনলো। ছবি-টবি দেখলো। দেবু জিজ্ঞেস করলো— "ছেলেকে না দেখিয়ে ওঁরা বিয়ে ঠিক করতে চাইছেন কেন? দিদির মতো, তারও নিশ্চয়ই মতামত আছে?"

কাকা উত্তর দিলেন— "ছেলের এখন ছুটি নেই। মানে, এঁদের একটা বিজ্‌নেস আছে। ছেলে সেটা দেখাশোনা করে। বেশি দিনের জন্যে আসতে পারবে না। এঁরা মেয়ে পছন্দ করে রাখলে অল্পদিনের জন্যে সে আসবে। তখন আলাপ পরিচয় করানো হবে।"

—"ধরো, যদি দিদির তাকে পছন্দ না হয়? কিংবা তার আপত্তি থাকতে পারে। তখন তোমরা কি করবে? লাস্ট্‌ মোমেন্টে সম্বন্ধ ভেঙে দেবে?"

—"উপায় কি? সে কথা আমি বলে নিয়েছি! এ জন্যে ওঁরা বলছেন আগে থেকে খরচপত্র করে বিয়ের জোগাড় না করতে। পুপুর কথা মতো আমরা রাজি হলে, ছেলে কোলকাতায় আসবে। তখনই দেখাশোনা হবে। তারপর রেজিষ্ট্রি বিয়ে"।

নীলু জিজ্ঞেস করলো— "শুধু রেজিষ্ট্রি? বাঙালি মতে বিয়ে হবে না?"

কাকিমা বললেন— "আজ তো সেরকমই বলে গেলেন। ওঁদের নাকি তিন দিন ধরে অনুষ্ঠান করার সময় হবে না। বিয়েতে কোনো জিনিষপত্রও নেবেন না। যাক্‌ গে, সে সব তো পরের কথা। কিন্তু এটা ঠিক, যে ছেলেকে না দেখে আমরা কোনো মতেই রাজি হবো না।"

পরে কাকা, কাকিমা চলে যেতে দেবু বললো— "ছবিতে তো চেহারাটা ভালোই লাগছে। হাইট্‌ কতো কিছু বলেছে?"

নীলু হাতে বেহালার ছড় টানার ভঙ্গি করে হাসতে লাগলো— "বেহালায় বেহালা বগলে আসবে যেদিন, সেদিন দেখিস। আমিও এবিসিডির "ক্যালি" টা দেখে নেবো।"

মার যেন গায়ে লাগলো— "হ্যাঁ, তুমি একেবারে মহাপন্ডিত। আমেরিকার ছেলে তোমার কাছে আসবে এবিসিডি শিখতে।"

দেবু, নীলু হেসে অস্থির। আমরা কিছু না বুঝেই হাসছি। শেষে নীলু মার পিঠে মাথা দিয়ে ঢুঁশ মারার মতো করে বললো— "তুমি কিচ্ছু জানো না বড় মা! এদিকে এবিসিডির শাশুড়ি হতে যাচ্ছো। এবিসিডি কি জানো? পুরো কথাটা হোচ্ছে আমেরিকান বর্ন কনফিউস্‌ড্‌ দেশী। মানে, আমেরিকায় জন্মানো কন্‌ফিউজড মানে, বিভ্রান্ত ইন্ডিয়ান"।

আমি জিজ্ঞেস করলাম— "কনফিউজ্‌ড্‌ জানলি কি করে? তুই কজনের সাথে মিশেছিস"? নীলু কাঁধ ঝাঁকালো— "শুনেছি। অন্য দেশে থাকে বলে ওরা আইডেন্‌টিটি ক্রাইসিসে ভোগে"।

দেবু ধমক লাগালো— "তুই সব জেনে বসে আছিস। বাজে কথা বাদ দে তো। বম্বে, দিল্লিতে কারা একটা নাম দিলো, সেটাই চালু হয়ে গেলো। এদিকে আমেরিকা যাবার জন্যে তো সব পা বাড়িয়ে আছে। তুইও চান্স্‌ পেলে চলে যাবি।"

নীলু দু হাত তুলে শান্তি রক্ষার ভঙ্গি করলো— "আচ্ছা, এবার তুমি থামবে? ওঃ, একটু ঠাট্টা করার উপায় নেই। এনি ওয়ে, দিদি, বরের ছবি দেখে মনে হচ্ছে নিরীহ টাইপ। রাজি হয়ে যাও। ওখানেও ছড়ি ঘোরাতে পারবে।"

রুম্পা হাসছে— "সে গুড়ে বালি! ওখানে ওর শ্বশুর শাশুড়িও থাকবে।"

—"সেরেছে! তাহলে ছোড়দিকেও নিয়ে যাও। দুদিনে সবাইকে সাইজ করে দেবে।"

ভাইবোনদের হাসি ঠাট্টার মধ্যেই আমি যেন মন থেকে কেমন ভরসা পেলাম। সত্যি তো, ভবিষ্যৎ নিয়ে এত ভাবছি কেন? বিয়ে মানেই তো একটা চান্সের ব্যাপার। যে দেশেই থাকি, ভাগ্যে সুখ, শান্তি থাকলে পাবো। নয়তো পাবো না। আগে থেকে কি কিছু বোঝা যায়?

সেদিন রাতে ছেঁড়া ছেঁড়া ঘুম হলো। বাইরে বৃষ্টি নেমেছিল। ঝর ঝর জলের শব্দ। ভেজা হাওয়ায় কোথা থেকে ভেসে আসা যুঁই ফুলের গন্ধ। আমি বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম। রাতের মেঘলা আকাশের নীচে আধো অন্ধকারে এই চেনা গলি, দূরের মাঠ, শিবমন্দির দেখতে দেখতে ভাবছিলাম সামনের বর্ষায় আমি হয়তো আর এখানে থাকবো না।

একমাস বাদে আমাদের বিয়ে হয়ে গেলো। সুমন এসে পৌঁছোলো প্রায় শেষ মুহূর্তে। নিউইয়র্কে তখন ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার পুড়ে গেছে। আমেরিকায় সব কিছু ওলট-পালট। সুমনের প্লেন ছাড়েনি তিনদিন। এখানে দু-বাড়িতেই তখন কি টেন্‌শন! আমিও কত কি ভাবছি। এতদিন ভাবছিলাম সুমনকে আমার পছন্দ হবে কিনা। শেষে দিন যত কাছে আসতে লাগলো, মনে হচ্ছিলো হয়ত আমাকে দেখেই ও নিরাশ হবে। আমরা পৃথিবীর দু প্রান্তে জন্মেছি, বড় হয়েছি। হয়ত ওর মনে হবে আমাদের কোনো কিছুই মিলবে না।

কি আর হবে? সম্বন্ধটা ভেঙে যাবে। দুটো ছবিকে ঘিরে এই যে একটু একটু স্বপ্ন দেখছি, সে আর কখনো সত্যি হবে না।

সুমন আসার পর একবার মাত্র দেখা হলো। ছবির মানুষ যখন সামনে আসে, কথা বলে, প্রথমবারের দেখাতেও তাকে একটু তো বোঝা যায়। সুমন দেখলাম বেশ চুপচাপ। কথা

যদিবা বললো, ওর আমেরিকান ইংরেজী ঠিক মতো বুঝতে পারছিলাম না। ও বাংলা বোঝে মোটামুটি। বলতে পারে না। আমি পাড়ার বাংলা স্কুলে পড়েছি। কলেজ পাশ করেছি। ইংরেজী শিখেছি পড়াশোনার জন্যে। বলার অভ্যেস হয়নি। আমাদের এ অঞ্চলে ইংরেজী সিনেমা-টিনেমা দেখার সুযোগ পাই না। বাড়িতে ভিসি আর, কেব্‌ল্‌ চ্যানেল্‌ও নেই। আমেরিকান ইংরেজী শুনি কোথায়?

সুমন জিজ্ঞেস করেছিল আমি বই পড়ি কি না। ভায়োলিন শুনতে ভালো লাগে কিনা। একবার জানতে চাইলো আমেরিকায় গিয়ে আমি কি আরো পড়াশোনা করবো?

এরকম দু-চার কথার পর দুজনেই চুপচাপ। আমার যে কিছু প্রশ্ন ছিল, সেও আর মনে আসছে না। আমরা আজ দুপুরে পার্ক স্ট্রীটে খেতে এসেছি। তিনটের সময় ওদের গাড়ি আসবে। আমাকে বেহালায় নামিয়ে দিয়ে সুমন নিউ আলিপুরে ফিরে যাবে। ওখানে মামার বাড়িতে উঠেছে। গতকাল কাকার সঙ্গে মা, কাকিমারা সে বাড়ীতে গিয়ে সুমনের সঙ্গে আলাপ করে এসেছেন। এরপর শুধু আমার হ্যাঁ কিংবা না বলার অপেক্ষা। সুমনের দিক থেকেও নিশ্চয়ই তাই।

খাবার নিয়ে নাড়াচাড়া করছি। মাঝে মাঝে ঘড়ি দেখছি। সুমন হাসলো— "টাইম ফ্লাইজ্‌। অ্যান্ড উই হ্যাভ টু মেক্‌ আ বী - - -ই - - -গ্‌ ডিসিশন। রাইট?"

কাঁটা, ছুরি সরিয়ে রেখে বললাম— "সত্যি কথাই। দু ঘন্টার আলাপে বাড়ি ফিরে গিয়ে ইয়েস্‌ অর নো বলতে হবে। আপনার মনে হচ্ছে না বিয়ের ডিসিশন নেওয়ার জন্যে টাইমটা ভীষণ শর্ট?"

আমার ইংরিজী বাংলা মেশানো কথা শুনে সুমন মাথা নাড়লো— "দ্যাট্‌স্‌ ট্রু। উই শুড হ্যাভ মোর টাইম টু টক্‌ অ্যাবাউট আদার থিংগ্‌স্‌ - - -"।

বাড়িতে ফিরে যাচ্ছি। রাস্তায় বিরাট জ্যাম্‌। সুমন কোলকাতার জনসমুদ্র দেখতে দেখতে চলেছে। একবার জিজ্ঞেস করলো— "তোমার এই ভিড়ের শহর ছেড়ে চলে যেতে খারাপ লাগবে না? আমরা কিন্তু সাবার্ব-এ থাকি।"

— "আমরাও প্রায় তাই। ওদিকটা এত জমজমাট নয়"।

— "তুমি আমার প্রথম কথাটার জবাব দিলে না। এখান থেকে চলে যাওয়ার কথা ভাবছো কিনা?" আমি চুপ করে আছি দেখে সুমন হাসলো— "আই থিংক্‌ উই আর লাইকিং ইচ্‌ আদার।"

— "কিন্তু আমাদের কমিউনিকেশনটা ভালো হচ্ছে না। আপনাকে বাংলা শিখতে হবে।" সুমন আমার হাত ধরে বললো— "শিয়োর আই উইল। বাট্‌ ইউ হ্যাভ টু টীচ্‌ মী ফ্রম দ্য ডে ওয়ান।"

কিছুক্ষণ হাতটা ধরে বসে রইল। তারপর যেন প্রতিশ্রুতি চাওয়ার মতো করে বললো— "আই হোপ্‌ ইউ উইল্‌ লুক আফটার মী।"

সুমনের গলার স্বরে কেমন যেন করুণ নির্ভরতা ছিল। পুরুষ মানুষ এত ইমোশন্যাল কথা বলবে আশা করিনি। এরকম প্রত্যাশা তো আমার থাকার কথা। এত কালের চেনা পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবো। আমেরিকায় আমার আপনজন বলতে কেউ নেই। ওরই আমাকে ভরসা দেওয়ার কথা। অথচ একদিনের দেখায় আমাকেই সেই ভার নিতে বলছে। হয়ত একেক জন মানুষ এমন হয়। সহজেই নির্ভর করতে পারে। বিশ্বাস করতে পারে।

কথা দিয়ে সব কথার উত্তর হয় না। আমি চুপ করে ছিলাম। শুধু বাড়ির কাছাকাছি এসে সুমনকে একবার নামতে বলেছিলাম। ও ঘড়ি দেখলো। তারপর বললো— "না। এখন বাড়ি যাবো। মা বলে দিয়েছেন বিয়ের ডিসিশনটা আগে ওঁকে জানাতে হবে।"

সেই আমাদের বিয়ের আগে প্রথম আলাপের শেষ কথা।

বিয়ের সাত মাস বাদে আমেরিকায় এলাম। সুমন আমেরিকার সিটিজেন। তাও আমার ভিসা পেতে এতদিন লাগলো মাঝের ঐ সময়টা দুজনের মধ্যে যোগাযোগ বলতে ছিল ফোনে কথা বলা। কাকা একবছর আগে ফোন নিয়েছিলেন। সুমনের বাবা বলে গিয়েছিলেন ওঁরাই মাঝে মাঝে ফোন করবেন। যখন কথা হতো, ওঁদের সঙ্গেই বেশি কথা হতো। এমনও হয়েছে দুজনে কথা বললেন, অথচ সুমনকে ডেকে দিলেন না। শাশুড়ি বললেন ও ভায়োলিন প্র্যাক্টিস করছে। তাহলে ওঁরা এ সময় ফোন করতে গেলেন কেন? মাঝে মাঝে ওঁদের এই অদ্ভুত ব্যবহার, শাশুড়ির কর্তৃত্বের ভাবটা একদম ভালো লাগতো না। সুমনের ওপর অভিমান হতো। নিজে থেকে ও কি একবার ফোন করতে পারে না? চিঠি লিখতে পারে না? আশ্চর্য। একজন অ্যাডাল্ট লোক তার বাবা, মার কথায় চলবে কেন? নিজের ইচ্ছে অনিচ্ছে নেই? শাশুড়ির ওপরেই রাগটা বেশি হতো। বিয়ের সময়ও দেখলাম ছেলেকে যেন চোখে চোখে রাখছেন।

আবার যখন ওঁরা ফোনে বলতেন আমার জন্য নতুন করে ঘর সাজিয়েছেন, কবে ভিসা পাবো বলে অপেক্ষা করে বসে আছেন তখন রাগটা চলে যেতো। ভাবতাম দূরে থেকে মানুষকে শুধু শুধু ভুল বুঝি। এখানে তো ওঁরা খুবই স্নেহ, ভালোবাসা দেখালেন। বাড়ির অবস্থা বুঝে বিয়েতে খরচপত্র করতে দিলেন না। মা, কাকা, কাকিমাদের সঙ্গে যথেষ্ট ভালো ব্যবহার করেছেন।

তবু মা হয়তো কিছু বুঝেছিলেন। যেদিন চলে আসি, আগের রাতে মার কাছে শুয়ে খুব কেঁদেছিলাম। এই পরিচিত ঘর, স্নেহ ভালোবাসার আশ্রয় ছেড়ে চিরকালের মতো চলে যাবো ভেবে বড় কষ্ট হচ্ছিলো। যার কাছে যাবো, তার সঙ্গে ভালো করে চেনা শোনা হলো না। আজ কতোদিন হয়ে গেলো সুমন একটা ফোনও করেনি। সেই বিষণ্ণ মুহূর্তে মা আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলেছিলেন— "বিয়ে না হলে জীবনের সাধ, আকাঙ্খা মেটেনা। গরীবের ঘরে মেয়েদের বিয়েটাও জানবি মুক্তি। ঠাকুরই তো যোগাযোগ করে দিলেন। ভয় কিসের? তাঁকে ধরে থাকবি।"

আজ এতদিন পরে ভাবি মা সেদিন কোন্ মুক্তির কথা বলেছিলেন? মা কি বলতে চেয়েছিলেন দারিদ্র্য থেকে বৈভবের মধ্যে পৌঁছনোর নাম মুক্তি? রক্ষণশীল বাড়ি থেকে আধুনিক পরিবারের বউ হওয়া মানে মুক্তি? হবে হয়তো। কিন্তু মা বোধ হয় আরো কিছু বোঝাতে চেয়েছিলেন। জীবনের সাধ আকাঙ্খা মেটানো বলতে দুজন মানুষের দেহমনের একান্ত সম্পর্কের আভাস দিয়েছিলেন। মার মূল্যবোধের বিচারে বিয়ে ছিল সেই সম্পর্কের বৈধ ছাড়পত্র। নিজের মেয়েকে এর চেয়ে স্পষ্ট করে আর কি'ই বা বলতে পারতেন।

আমেরিকায় আসার পর কদিন আমার বিছানাতেই কেটে গেলো। প্লেন থেকে ধুম জ্বর নিয়ে নামলাম। তারপর চিকেন পক্স্। শরীরে এত কষ্ট কোনোদিন পাইনি। নতুন দেশ, নতুন সংসার, প্রায় অপরিচিত তিন জন মানুষ। আয়নায় নিজের ক্ষতবিক্ষত মুখ দেখে মন খারাপ হয়ে যায়। এমনিতেও বড় অসহায় লাগছিল। এঁরা খুবই দেখাশোনা করছিলেন। তবু মা নেই, কাকিমা নেই। মনে হচ্ছিলো একটা নার্সিং হোমে অসুখ করে পড়ে আছি। সেবা যত্ন সবই হচ্ছে। শুধু

বাড়ির লোকজন কেউ আমায় দেখতে আসছে না। কি জানি কার ওপর প্রচ্ছন্ন অভিমান থেকে আমি একা একাই কতগুলো রাত কাটিয়ে দিলাম। আর সুমনও রাতে মাঝে মাঝে দেখে যাওয়া ছাড়া আমার কাছাকাছি এলোনা। অথচ তখন প্রায় সেরে উঠেছি।

এদেশে এসেছি জুনের শেষাশেষি। তারপর প্রায় একমাস কেটে গেলো। এখনও তেমন গরম পাইনি। সারাদিন সিরসিরে হাওয়া। এ বাড়ির কাছাকাছি একটা ঝিল্ আছে। বাগানের গাছপালার ফাঁক দিয়ে রুপোলি জলের রেখা চোখে পড়ে। ওদিকটায় একদিন হাঁটতে যাবো ভাবছিলাম। এসে পর্যন্ত একবার ডাক্তারের অফিসে গিয়েছি। আর একদিন সুপার মার্কেটে। দুটোই গাড়িতে। ঝিল্‌টাই নিজে নিজে হেঁটে দেখে আসতে পারি। সারাদিন বাড়িতে একা থেকে থেকে বোর হয়ে যাচ্ছি। শ্বশুর কাজে চলে যান সকাল সাড়ে-সাতটায়। শাশুড়ির সঙ্গে সুমন বেরোয় ন-টা নাগাদ। ওদের দোকান খোলে সাড়ে নটায়। একা একা ঝিলের ধারে বেড়াতে যাবো শুনে শাশুড়ি বললেন— "শরীরটা ভালো লাগছে যখন, আমাদের সঙ্গে কাল দোকানে চলো না। টায়ার্ড লাগলে সুমন বাড়ি পৌঁছে দিয়ে যাবে। রোদ্দুরে না হেঁটে বরং একদিন বিকেলের দিকে সিলি পন্ড্-এ যেও।"

তাহলে তাই যাবো। ওঁদের ফার্মেসীটাও তো দেখিনি। ওষুধের দোকানের সঙ্গেই কার্ড অ্যান্ড গিফ্‌ট্ স্টোর খুলেছেন। একজন ফার্মাসিষ্ট্ রেখেছেন। দু-জন পার্ট টাইম কাজ করে। শাশুড়ি ফেরেন রাত আটটা নাগাদ। সুমন দেখি ইচ্ছে মতো আসে যায়। মাঝে আমার অসুখের জন্যে কদিন বাড়িতে ছিল। দু দিন বেহালা বাজিয়ে শুনিয়েছে। ও নিজেদের বিজ্‌নেস ঠিক কতোটা দ্যাখে বুঝিনা। বাড়িতে বসে এধার ওধার ফোন করে। কতো রাত পর্যন্ত ইন্‌টারনেট দ্যাখে। অথচ শ্বশুর রোজ প্রায় দশ-এগার ঘন্টা দোকানে থাকেন। শনিবারেও যান। শ্বশুরের তো ফুলটাইম চাকরি, বাড়ি ফিরতে সন্ধ্যে হয়ে যায়। আমার একটু অবাক লাগে বাবা, মা খেটে মরছেন। তাঁদেরও কোনো বিরক্তি নেই। ছেলেও উদাসীন। আমার দিদিমা বলতেন আতুপুতু করে ছেলে মানুষ করা। এঁরাও দেখছি তাই করেছেন।

পরদিন ওদের "রিজফিল্ড্ ফার্মেসীতে" গেলাম। বেশ বড় দোকান। একদিকে প্রেস্‌ক্রিপ্‌শান মেডিসিনের কাউন্টার। তার পাশে দুটো আইল্ জুড়ে ওভার দ্য কাউন্টার মেডিসিন সাজানো। অন্য দিকে গ্রীটিংস্ কার্ড, কসমেটিক্‌স্ আর সুন্দর সুন্দর পোর্সেলিনের জিনিষ। নানা দেশের কস্‌টিউম জুয়েলারীর সঙ্গে আমাদের দেশের ইমিটেশন গয়নাও আছে। থাইল্যান্ডের কাঠের সরস্বতীর পাশে কালো পাথরেব গনেশ — কারা এসব কেনে কে জানে? ওষুধের দিকটাতেই বেশি ভিড় দেখছিলাম।

সন্ধ্যেবেলায় শ্বশুর জিজ্ঞেস করলেন— "আজ কোলকাতায় ফোন করবে? অসুখ বিসুখ গেলো। মাঝে তো আর কথা হয়নি। ওঁরা চিন্তা করবেন বলে আমরাও বেশি কিছু বলিনি।"

একটু রাত করে বেহালায় ফোন করলাম। মা শুনেছিলো আমি জ্বরে পড়েছিলাম। চিকেন্ পক্স হয়েছিলো শুনে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। এখন যে সেরে গেছি, সে আর বোঝাতে পারিনা। কাকিমা, ঝুম্পা দুজনেই জিজ্ঞেস করলো— "মুখে অনেক বেরিয়েছিলো, দাগ মিলিয়ে যাচ্ছে? তোরা ডাবের জল পাস না? ... কাকা বাজারে গেছেন। তাই ওঁর সঙ্গে কথা হলো না।

রাতে বিছানায় শুয়ে কাকিমার কথাটা মাথার ভেতর ঘুরছিল। ফোনে জিজ্ঞেস করেছিলেন— "হ্যাঁ রে, বরকে নিয়ে আনন্দে আছিস তো?"

প্রশ্নটা এড়িয়ে যেতে না পেরে বলেছিলাম— "ভালো আছি কাকিমা। এ জায়গাটা খুব

সুন্দর। এবার অনেক জায়গায় বেড়াতে যাবো। তোমাদের ছবি পাঠাবো।"

কেমন আছি, এত দূর থেকে কি করে বোঝাবো ভালো যে নেই, সে ওঁদের জানিয়ে কষ্ট দিতে চাই না। কি বলবো? সুমনের সঙ্গে চেনাশোনাটা সেই প্রথমদিনের আলাপের মধ্যেই ঠেকে আছে। বিয়ে হলো। কোলকাতায় তিনটে রাত একসাথে কাটালাম। তারপর দীর্ঘ সাত মাস বাদে আবার দেখা। আজ পর্যন্ত আমাদের মধ্যে এর বেশি ঘনিষ্টতা হলো না। সুমন মাঝে মাঝে আমার হাত ধরে একেক সময় পিঠে হাত রেখে কথা বলে। সান্নিধ্য বলতে এইটুকুই। এদেশে আসার পর থেকে আমাদের ঘর খালি, প্রথমে ভেবেছিলাম আমার অসুখের জন্যে সুমন আলাদা শুচ্ছে। হতেই পারে। কিন্তু এখন তো আমি ভালো হয়ে গেছি। এখনও কেন ব্যবস্থাটা বদলালো না? এত বড় ঘর, বিশাল খাট বিছানা, জোড়া আয়না বসানো ড্রেসিং টেবিল, দুজনের জামাকাপড় রাখার মতো ওয়ার্ডরোব, ওঁরা নিশ্চয়ই আমার একার জন্যে সাজিয়ে রাখেন নি?

তাহলে? সুমন যে এ ঘরে শোয় না, সে নিয়ে ওঁরা তো কিছু বলেন না। সারাজীবন আমেরিকায় আছেন, এই স্বাভাবিক ব্যাপারটা ছেলেকে জিজ্ঞেস করা যায় না? শাশুড়ি আমাকেও কোনো প্রশ্ন করেন না। যেন দুদিনের অতিথি হয়ে এসেছি। স্বাচ্ছন্দ্যের বেশি আর আমার কিছু পাওয়ার নেই।

কিন্তু, আমি তো এদেশে শুধু বৈভবের মধ্যে বাঁচবো বলে আসিনি। অর্ধপরিচিত এক পুরুষের জন্যে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে এসেছি তার ভালোবাসা আর সান্নিধ্যের প্রত্যাশায়। কত রাত কেটে গেলো, একবারের জন্যেও পরস্পরের কাছাকাছি এলাম না। তবে কি আমাকে ওঁর ভালো লাগছে না? এত কাছে থেকে দেখে কোলকাতার সেই প্রথমদিনের রেশটুকু মিলিয়ে যাচ্ছে। মনে মনে আমেরিকান মেয়েদের সঙ্গে তুলনা করে আমাকে ওর নিতান্ত সাধারণ বলে মনে হোচ্ছে? না আমি চেহারার দিক থেকে তাদের কাছাকাছি পৌঁছোতে পারছি, না অন্য কোনো দিকে। দেশে থাকতে সেরকম স্কুল, কলেজে পড়লে অনেক স্মার্ট হতে পারতাম। সে সুযোগ পাইনি। না কোনো ইংরিজী বই সম্পর্কে আলোচনা করতে পারি, না বুঝতে পারি ওয়েস্টার্ন ক্ল্যাসিকাল মিউজিক। সুইমিং, ড্রাইভিং, হাইকিং কিছুই পারি না। সুমন যে বিষয়েই কথা বলতে চায়, আমার অজ্ঞতা ধরা পড়ে। অন্য দেশে, সম্পূর্ণ আলাদা পরিবেশে মানুষ হয়েছি। কি করে আমি রাতারাতি নিজেকে শিক্ষিত করবো? দুজনের ভাবনা, অনুষঙ্গ, অভিজ্ঞতার মধ্যেও কতো তফাৎ! গল্প করার মতো 'কমন্' কথাও খুঁজে পাই না। আমার পড়া যতো বই, আমার শোনা যতো গান, শুধু আমারই স্মৃতিতে থাকবে।

তবু, আমি তো মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছি। ধীরে ধীরে অনেক কিছুই শিখে যাবো। কিন্তু সুমন যে কেন এমন নিরুত্তাপ ব্যবহার করছে? এতো যদি অপছন্দ ছিল, বাড়ির কথায় বিয়েতে রাজি হোলো কেন? ওর উদাসীনতা আর উপেক্ষায় নিজেকে বড় অবাঞ্ছিত মনে হচ্ছে। এসব কথা কাউকে বলতে পারি না। ভাবি শাশুড়িই হয়ত একদিন খেয়াল করবেন। তখন যা বলার তাঁকেই বলবো।

শ্বশুর আমাকে ড্রাইভিং স্কুলে ভর্তি করে দিলেন, গাড়ি চালানো শিখছি। বাড়িতে তেমন কাজকর্ম করতে হয় না। ক্লিনিং সার্ভিস্ কোম্পানীর মেয়েরা এসে সপ্তাহে সপ্তাহে বাড়ি পরিষ্কার করে দিয়ে যায়। রান্নাবান্নার পাট তো শাশুড়ি তুলেই দিয়েছেন। এক বাঙালি মহিলার কেটারার আছেন। তিনি এ বাড়িতে সারা সপ্তাহের রান্না সাপ্লাই দেন। রোজ যে

বাঙালি রান্না দেন তা ও নয়। দেশী-বিদেশী মিলিয়ে মিশিয়ে খাওয়া। সোমবারে সোমবারে ভ্যান্ চালিয়ে এসে ডেলিভারী দিয়ে যান। আমরা সারা সপ্তাহ্ ধরে তাই খাই। বাংলাদেশী এই রাঁধুনির নাম নাজমা।

একদিন কি যে হলো, মাঝরাত থেকে হঠাৎ পেটে অসোয়াস্তি। তারপরেই প্রচন্ড বমি। ওপাশের ঘর থেকে সুমন উঠে এলো। আমার তখনও বেশ হাঁপ ধরছিল। সুমন জল-টল দিলো। আমি ঘরে এসে শুয়ে পড়ার পর বিছানায় এসে বসলো। তারপর পেটের একপাশে হাত রেখে জিজ্ঞেস করলো— "কোথায় কষ্ট হচ্ছে বলো তো? পেটে এখনও যন্ত্রণা হচ্ছে? হসপিটালে নিয়ে যাবো। নিজেকে আর সংযত রাখতে পারলাম না। অভিমানে গলার স্বর বুজে এলো—" না, কোথাও নিয়ে যেতে হবে না। আমার জন্য তোমাকে কিছু করতে হবে না। আমি আর এখানে থাকতে চাই না ...। সুমন, প্লীজ্ আমাকে দেশে পাঠিয়ে দাও।"

সুমন স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো। আধো অন্ধকারে সেই বিষন্ন মুখ, অসহায় দৃষ্টি দেখে আমার কেমন ভয় হলো। তবে কি আমি যা ভেবেছি সেটাই ঠিক? আমাকে ও বউ হিসেবে মেনে নিতে পারছে না? কিন্তু কেন, ওর কি কেউ বান্ধবী ছিল, যাকে এখনও ও ছাড়তে পারছে না? এ জন্যই কি আমাকে ফোন করতো না? চিঠি লিখতো না? এখনও যে দূরে সরিয়ে রেখেছে, তার একটাই কারণ। বিয়েটা ভেঙে দিতে চাইছে।

অবচেতনের গভীরে তীব্র বেদনার উপলব্ধি থেকে একসময় প্রশ্ন করলাম— "সুমন, তুমি বিয়ে করলে কেন? আমাদের সঙ্গে তোমাদের ঠিক মেলে না। সেটা জেনেও তোমার বাবা, মার ইম্‌পোজিশনটা মেনে নিলে কেন?

সুমন মাথা নাড়লো — "জানিনা, তোমাকে আমার ভালো লেগেছিল। আমি বোধহয় একটা চান্স্ নিতে চেয়েছিলাম। পূর্বা, এখনই চলে যাবার কথা বোলোনা। আমাকে আর একটু সময় দাও।

সুমন হঠাৎ করে ঘর ছেড়ে চলে গেলো। ক্লান্ত শরীর, অবসন্ন মন নিয়ে শুয়ে আছি। বাইরে ভোরবেলার ধূসর নীল আকাশ। আবার একটা দিন। আবার একটা রাত। সুমনকে আর কতো সময় দেবো? কি অনিশ্চিত এই সম্পর্ক। যদি ভেঙেই যায়, কোথায় গিয়ে দাঁড়াবো? আবার সেই বেহালার বাড়ি, মার ম্লান মুখ, কাকার ক্লান্ত ব্যথিত চাউনি ...। ভাবতে ভাবতে একসময় শ্বশুরের স্নানের শব্দ পেলাম।

দেড়মাস পরে গাড়ির লাইসেন্স হোলো। এবার শ্বশুর জানতে চাইলেন আমি কি করতে চাই? ওঁর ইচ্ছে কোনো কোর্স-এ ভর্তি হই। শাশুড়ির ইচ্ছে ওঁদের ফার্মেসীতে কাজ করি। আমি কোনো কিছুই ঠিক করতে পারছি না। যতদিন যাচ্ছে একটা বোঝাপড়ার জন্যে তৈরী হচ্ছি। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি — এঁরা জেনে শুনে আমার ওপর দুর্ভাগ্যের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছেন। সুমনের আমেরিকান গার্ল ফ্রেন্ড ছিল বলেই আমার ধারণা। সেই বিয়েটা বন্ধ করার জন্যে তাড়াহুড়ো করে দেশে গিয়ে আমায় পছন্দ করলেন। সুমনও বাধ্য ছেলের মতো রাজি হয়ে গেলো। আসলে মার হাতের পুতুল। ওঁর ব্যক্তিত্বের সামনে দাঁড়াতে পারেনা। এই যে ব্যবসা পত্র নিয়ে মাথা ঘামায় না, নিজের ইচ্ছেমতো সময় কাটায়, সেও মায়ের প্রশ্রয় আছে বলেই পারে। মহিলাকে ঠিক বুঝিনা। নিজের কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্যে একমাত্র ছেলেকেও স্বাবলম্বী হতে দিলেন না। আমি জানি, আমাদের বিয়েটা যদি টিকেও যায়, আলাদা সংসার করার প্রচন্ড বাধা আসবে। এ বাড়ির যা প্রাচুর্য আর আরামের বন্দোবস্ত, সুমন

এই অভ্যস্ত জীবন ছেড়ে যেতে পারবে কিনা সন্দেহ। তবে ওসব কথা আর ভাবিনা। আমাকে নিজের মতো করে বাঁচতে হবে। তার জন্যেও একটা কাজকর্ম যোগাড় করা দরকার। শ্বশুরের কথা মতো কোনো কোর্স্ নেওয়াই বোধহয় ভালো।

হঠাৎ শুনি আমাদের বিয়ের রিসেপ্‌শন দেওয়া হচ্ছে। বছর ঘুরতে চললো, এতদিন পরে কোন হোটেলে এঁরা পার্টি দেবেন। আমি আজকাল সোজাসুজি প্রশ্ন করি। শাশুড়িকে জিজ্ঞেস করলাম — "আপনাদের তো সোশ্যালাইজ্ করতে দেখিনা। এতদিন এসেছি, কারুর বাড়ি-টাড়িও নিয়ে গেলেন না। রিসেপ্‌শনে কাদের ডাকছেন?"

শাশুড়ি ইন্‌ভিটেশন লিস্ট্-এ দাগ দিতে দিতে থেমে গেলেন। মুখ তুলে এক মুহূর্ত চেয়ে থেকে বললেন — "এদেশে আমরা নিজে থেকে কারুর বাড়ি যাই না। উইক্-এন্ডে কেউ ডিনারে ডাকলে তখন যাই। এক তো শনিবারে আমার সময় নেই তার ওপর তুমি আসার পর যারা ইন্‌ভাইট করেছিল, তাদের বলে দিয়েছি একেবারে রিসেপ্‌শনের দিন বউ দেখবে — এ জন্যেই কারুর বাড়ি নিয়ে যাইনি।"

— "সেদিন কি আমাকে নতুন বউ সেজে ঘুরতে হবে? তাহলে আগেই বলে দিচ্ছি, আমি আপনাদের দেওয়া শাড়ি, গয়না কিছুই পরবো না। ইন্‌ফ্যাক্ট্, আমার যেতেই ইচ্ছে করছে না।"

শাশুড়ি থতমত খেয়ে গেছেন — "তার মানে? তুমি লোকজনদের সঙ্গে মীট্ করতে চাওনা? একটা ফর্মাল পার্টিতে তোমাকে ইনট্রোডিউস্ করাবো বলে ....।"

আমি চিৎকার করে উঠলাম — "না চাইনা। আপনাদের এই মিথ্যে নাটক বন্ধ করুন। এসে পর্যন্ত একটা কথাও বলিনি। বাট্ দিস ইজ্ হাইটাইম্ ....।"

. আমার উত্তেজিত গলা শুনে শ্বশুর ওপর থেকে নেমে এলেন। আমাকে ধরে সোফায় বসালেন। শাশুড়ির মুখ বিবর্ণ। হাতের কাগজপত্র ফেলে রেখে পাথরের মতো বসে আছেন। দুজনেই যেন আমার শান্ত হওয়ার অপেক্ষায় আছেন। মনে হলো আজ আমার সব কথা বলা দরকার। সুমন দুদিন হলো বাড়িতে নেই। সারাটোগা হিল্‌স্-এ জ্যাজ্ ফেস্টিভ্যালে গেছে। সঙ্গে যেতে চেয়েছিলাম। রাজি হলোনা। সেই থেকে মন মেজাজ খারাপ হয়ে আছে। ফেটে পড়ার জন্যে শুধু একটা সুযোগ খুঁজছিলাম। আজ আমি আর চুপ করে থাকবো না।

অথচ এখন আর কথা শুরু করতে পারছি না। যে জন্যে এত প্রতিবাদ করে উঠলাম, সে কথায় ফিরতে হলে আরো খোলাখুলি হতে হবে। সেখানেই আমার অসোয়াস্তি হচ্ছিল।

শ্বশুরই কথা তুললেন — "পূর্বা, তুমি আমাদের মেয়ের মতো। এখন এটাই তোমার বাড়ি। যদি কিছু প্রব্লেম হয়, আমাদের বলো। আমরা তোমায় সাহায্য করবো।"

ম্লান হেসে বললাম — "ব্যাপারটা আপনাদের হাতের বাইরে। বোধহয় আমারও হাতের বাইরেই থেকে যাবে। কেন যে আপনারা আমাকে বিয়ে দিয়ে নিয়ে এলেন।"

শাশুড়ি বললেন — "আমরাও ঠিক বুঝতে পারিনি পূর্বা। ইচ্ছে হয়েছিল দেশ থেকে বাঙালি মেয়ে বিয়ে দিয়ে নিয়ে আসবো। সুমনও তো সেভাবে আপত্তি করেনি। এখন কি ও তোমার সাথে অ্যাডজাস্ট্ করতে পারছে না? আমাকে একটু প্রব্লেমটা খুলে বলো তো, দরকার হলে তোমাদের ম্যারেজ্ কাউন্‌সেলারের কাছে নিয়ে যাবো।"

— "সুমন এই বিয়েটা অ্যাক্সেপ্ট্ করতে চাইছে না। বোধহয় ওর গার্ল ফ্রেন্ডের কাছে ফিরে যেতে চাইছে। আপনারা তাকে চেনেন?"

শ্বশুর অবাক হলেন — "গার্ল ফ্রেন্ড? সুমনের কোনো স্টেডি অ্যাফেয়ার ছিল বলে তো জানিনা। অন্ততঃ আমাদের কখনো জানায়নি। তাহলে, সেটাই মেনে নিতাম। আপত্তি করবো কেন?"

শাশুড়ি আমার পিঠে হাত রেখে বোঝালেন — "আমরা জেনে শুনে ওকে জোর করে বিয়ে দিইনি পূর্বা। একটা অ্যাডাল্ট ছেলে, তার কোনো অ্যাফেয়ার নেই। বেসিক্যালি একটু অমিশুক। ওর এই 'লোনার' স্বভাবের জন্যে বন্ধু-টন্ধুও তেমন নেই। তাই ভেবেছিলাম আমরা দেশে গিয়ে ওর বিয়ের ব্যবস্থা করবো।"

আমার তখনও সন্দেহ যায়নি — "আপনারা বলছেন ওর কোনো অ্যাফেয়ার ছিল না। কিন্তু কাকে ও সারাক্ষণ এত ফোন করে? কতো রাত অবধি ইন্টারনেটে বসে থাকে জানেন?"

শ্বশুর মাথা নাড়লেন — " না, না। এ তুমি অকারণ সন্দেহ করছো। ইন্টারনেট দেখাটা রুটিন্ ব্যাপার। সেখানে ও রাতের পর রাত কারুর সঙ্গে চ্যাট্ করছে বলে আমি বিশ্বাস করি না।"

— "তাহলে আর আমাকে এত কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন? ছেলেকেই জিজ্ঞেস করুন কেন সে বিয়েটা ভেঙে দিতে চাইছে?"

শাশুড়ি চমকে উঠলেন — "কি বলছো তুমি? সুমন তোমাকে এ কথা বলেছে? এতদিন জানাওনি কেন? আমি তো ভাবতেই পারছি না ...।"

— "আপনি কি কখনো জানতে চেয়েছেন? আমাদের সম্পর্কটা যে স্বাভাবিক নয়, আপনার চোখে পড়েনি? রাতের পর রাত আমরা আলাদা ঘরে শুই। আমাদের মধ্যে কোনো ফিজিক্যাল রিলেশনশীপ নেই। একই বাড়িতে থেকে আপনি কিছুই বোঝেননি?"

দুজনে নিশ্চুপ হয়ে আছেন। এতদিন ভেবেছি যখন বোঝাপড়ার সময় আসবে, তখন একদিকে ওঁরা তিনজন, অন্যদিকে আমি একা। আমার পাশে কেউ থাকবে না। আজ বুঝতে পারলাম এক অমোঘ ঘটনাচক্রে ওঁরাও আমার দুর্ভাগ্যের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছেন।

শাশুড়ি বললেন — "এতদিন পর্যন্ত ভেবেছি হয়ত সাময়িক ভুল বোঝাবুঝি চলছে। সারাদিন বাড়িতে থাকিনা। রাত করে ফিরি। তোমাদের মধ্যে কখন কি কথা হয়, জানিনা। তবে এটা বুঝতে পারছিলাম যে সুমন বেশ অদ্ভুত ব্যবহার করছে। আর এটাই আমার ভয় ছিল। ছোটবেলা থেকে কয়েকটা ব্যাপারে ও একটু 'স্লো' ছিল। লার্নিং প্রগ্রেস্টাও দেরীতে হয়েছে। ইমোশন্যাল স্ট্রেস্ হ্যান্ডল্ করতে পারতো না। কিন্তু তারপর তো স্কুল, কলেজ সবই শেষ করেছে। ম্যাচিওর্ড্ হয়ে গেছে। নতুন করে যে কোনো প্রব্লেম শুরু হবে ভাবিনি। পূর্বা, ওকে ম্যারেজ্ কাউনসেলর দেখাবো। দেখো, সব ঠিক হয়ে যাবে।"

শ্বশুর শুধু বললেন — "তুমি কি চাও আমরা সুমনের সঙ্গে আগে কথা বলবো? না, তুমিই যা জিজ্ঞেস করার করবে?"

উঠে আসার সময় বললাম — "কতগুলো প্রশ্ন আছে, যার উত্তর সরাসরি ওর কাছ থেকে শুনতে চাই। বাবা, আমাকেই সেগুলো জিজ্ঞেস করতে হবে।"

ফোন বাজছিল। শাশুড়ি ধরলেন। কেটারার নাজমা ফোন করেছেন। রিসেপ্শনের খাবারের কন্ট্র্যাক্ট পাওয়ার আশায় দেখা করতে আসছেন। শাশুড়ি বলে দিলেন — "আজ ব্যস্ত আছি। হয়ত রিসেপ্শনের ডেট্টাও বদলাতে হবে। পরে জানাবো।"

অনেক রাতে সুমন ফিরলো। শ্বশুর, শাশুড়ি নিজেদের ঘরে। জানি, জেগেই আছেন। অপরাধবোধ, ক্ষোভ, দুঃখ মিলিয়ে শ্বশুর খুবই বিচলিত। শাশুড়ি যেন হার মানতে চাইছেন না। সুমনের যে ছোটবেলায় কিছুটা সাইকোলজিক্যাল্ প্রব্লেম ছিল সে কথা স্বীকার করলেন ঠিকই। কিন্তু এখনকার ব্যবহার সম্পর্কে ওঁর ধারণা এটা কোনো জটিল ব্যাপার নয়। নতুন বিয়ের পর অনেক ছেলে মেয়েরই মানিয়ে নিতে সময় লাগে। দেশে নাকি এ সব নিয়ে খোলাখুলি কথা হয় না। এদেশে ম্যারেজ-কাউনসেলিং আর সেক্স্ থেরাপী করে সেই জড়তা কাটিয়ে ওঠা যায়। আমি নাকি সুমনকে ভুল বুঝেছি। ও বিয়ে ভেঙে দিতে চায় না। কোনো একটা 'ইন্হিবিশন' থেকে ঘনিষ্ঠ হতে পারছে না। সবই শুনে গেলাম। কিন্তু ওঁর থিয়োরী নিয়ে তো আর আমার জীবন কাটবে না। যা সত্যি, তার মুখোমুখি হতে হবে। সুমন আমার কাছে সময় চেয়েছে মানে কোথাও একটা বাধা নিশ্চয়ই আছে। আজ ওর কাছে স্পষ্ট করে জানতে চাইবো।

অতো রাতে আমাকে ওর বিছানায় গিয়ে বসতে দেখে সুমন কৈফিয়ত দেওয়ার চেষ্টা করলো — "সরি, পূর্বা, ঘুম ভাঙালাম বোধহয়। আসলে রাস্তায় এত বৃষ্টি পেলাম, ফিরতে দেরি হয়ে গেলো।"

— "কেমন হলো জ্যাজ ফেস্টিভ্যাল?"

— "এবার ওয়েদারের জন্যে লোক বেশি হয়নি। দুদিন ধরে সমানে বৃষ্টি। এখানে?"

— "একই অবস্থা। ভেবেছিলাম একবার সাসেক্স্ কাউন্টি কলেজে যাবো। ঝড়বৃষ্টির মধ্যে গাড়ি নিয়ে বেরোলাম না।"

সুমনকে ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। বললাম — "তুমি নিশ্চয় খুব টায়ার্ড? বেশি সময় নেবো না। সুমন, কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই।"

সুমন উঠে দরজা বন্ধ করলো। আমার পিঠের কাছে বালিশ এগিয়ে দিয়ে বললো — "ঠিক করে বোসো। আমারও তোমাকে কিছু বলার আছে। তবু, প্রশ্নগুলো তোমার দিক থেকেই আসুক।"

— "সুমন, বিয়ের একবছর হয়ে গেলো। এক বাড়িতে থেকে ও আমরা স্বামী, স্ত্রীর মতো থাকি না। কোনো রিলেশন্শীপ-ই হয়নি। কেন সুমন? তুমি কি অন্য কারোকে ভালোবাসো?"

সুমন হতাশ ভাবে মাথা নাড়লো — "না, পূর্বা। যা ভাবছো তা নয়। আমার কোনো গার্ল ফ্রেন্ড নেই।"

— "বিশ্বাস হয় না। আসার পর থেকে দেখছি আমাকে অ্যাভয়েড করছো। মাঝে মাঝেই বাইরে চলে যাও। কতো রাত অবধি সেল্ ফোনে কথা বলো। এর পরেও বিশ্বাস করতে বলো তোমার কোনো অ্যাফেয়ার নেই?"

সুমন অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালো — "জানিনা কিভাবে তোমাকে কনভিন্স্ করবো? পূর্বা, বিশ্বাস করো, কোনো মেয়ে এখানে ইনভল্ভড নয়। ঘটনাটা অন্য।"

— "বলো কি ঘটনা। বিয়ে ভেঙে যাওয়ার আগে কারণটা জানতে চাই।"

সুমন বিছানা ছেড়ে উঠে গেলো। বাইরে অঝোরে বৃষ্টি নেমেছে। জানলার কাছে রাখা টেবিলের ধার ঘেঁষে সামান্য ঝুঁকে দাঁড়ালো। বুঝতে পারছি এই শেষ রাতে দুজনে এক কঠিন সত্যের মুখোমুখি হতে চলেছি।

সুমন বললো — "পূর্বা, আমার বিয়ে করা উচিৎ হয়নি। তোমার ওপর চূড়ান্ত ইন্‌জাস্টিস্‌ হয়েছে। জানিনা কেন এই ভুল করলাম ...।"

ওর এই নাটকীয় ভঙ্গি আর সহ্য করতে পারলাম না। রাগে, দুঃখে ভেঙে পড়ে বললাম — "ভুল তুমি জেনে শুনে করেছো। তুমি, তোমার মা, বাবা সবাই মিলে আমার জীবনটা নষ্ট করে দিলে। কেন?"

সুমন বোঝাতে চেষ্টা করলো — "ইচ্ছে করে নয় পূর্বা। আমি নিজেকে বুঝতে পারিনি। ভেবেছিলাম আর পাঁচ জন পুরুষের মতো আমারও বিবাহিত জীবন হবে। মনে আছে, তোমাকে বলেছিলাম আমাকে তুমি দেখবে তো?"

— "সুমন, এ সব ঘটনা আগে ঘটতো। বাড়ির চাপে পড়ে একজন অক্ষম পুরুষ বিয়ে করে বসতো। আমি ভাবতে পারিনা, এ যুগে আমেরিকায় বসে তোমরা ...।"

হঠাৎ সুমন দরজার কাছে গেলো। দরজা খুলে দিতে দেখলাম শ্বশুর, শাশুড়ি এসে দাঁড়িয়েছেন। নিজেকে বড় বিপর্যস্ত লাগছিল। কিছুক্ষণ একা থাকা দরকার। আমি নিজের ঘরে এলাম।

সকাল হয়ে গেছে। ঘর থেকে বেরোইনি। বিছানায় শুয়ে এখনও যেন দুঃস্বপ্নের ঘোরের মধ্যে আছি। বুকের ভেতর বেদনার নিঃশব্দ বৃষ্টিপাত। কোথাও পাড় ভাঙছে। ধ্বস নামছে। ছিন্ন বিচ্ছিন্ন অস্তিত্ব নিয়ে কখনো অতীত, কখনো ভবিষ্যতের কথা ভাবছি। জীবনের ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেলো। কোথায় যাবো? কার কাছে সাহায্য চাইবো?

দরজায় টোকা দিয়ে শাশুড়ি এলেন। আমি মুখ ফিরিয়ে নিতে গিয়েও পারলাম না। শ্বশুর দূরে দাঁড়িয়ে ভাঙা ভাঙা স্বরে অনুমতি চাইছেন — "একবার ঘরে আসবো?"

সেদিন ওঁরা কাজে গেলেন না। সারাদিন অপেক্ষার পর সন্ধ্যে নাগাদ শ্বশুর জিজ্ঞেস করলেন — "সুমন যে সকাল থেকে বেরিয়ে গেছে, কোথায় গেছে কিছু জানো?"

প্রশ্নটা আমাকে, না শাশুড়িকে বুঝতে পারলাম না। সুমন কখন বেরিয়েছে, জানিও না। ওঁদের সঙ্গে কাল রাতের ঘটনার ব্যাপারে কথা হয়েছে কিনা তাও জানিনা। ভাবছি নিজেই এবার বলবো। ওঁরা তো ভয়ে ভয়ে কথাই তুলছেন না।

ডিনারের পর শ্বশুরকে বললাম — "কাল আপনাদের সুমন কিছু বলেছে?"

দুজনেই যেন অসোয়াস্তিতে পড়েছেন। শাশুড়ি একবার শ্বশুরের দিকে তাকিয়ে বললেন — "সেভাবে তো কিছু বললো না, সাত সকালে উঠে বেরিয়ে গেলো। কি হলো বলো তো?"

— "সুমনের ফিজিক্যাল প্রব্‌লেমটা জানার পর আমি ওকে সোজাসুজি অ্যাকিউজ করেছিলাম। তখন আপনারা এসে পড়লেন। কথাগুলো শোনেননি?"

শ্বশুর আক্ষেপের সুরে বললেন — "আমরা ভাবতেই পারিনি পূর্বা। তাহলে ওর বিয়ে দিতাম না। ও নিজেও বোধহয় কন্‌সিকোয়েন্সটা বুঝে উঠতে পারেনি। ছোট থেকেই ওর সেন্সটা একটু কম ...।"

শাশুড়ি রেগে উঠলেন — "এমন ভাবে বলছো, যেন ওর বুদ্ধি সুদ্ধি নেই। ফিজিক্যালি ইন্‌কেপেব্‌ল একটা ছেলে ঝোঁকের মাথায় বিয়ে করে এসেছে। নিজের ছেলে সম্পর্কে একি কথা?"

আমি বললাম — "কিন্তু ও তো নিজেই স্বীকার করেছে যে বিয়ে করাটা উচিৎ হয়নি।"

— "সে এখন অশান্তির ভয়ে বলছে। পূর্বা, এটা একটা মাইনর প্রব্‌লেম। টেম্‌পোরারি ব্যাপার। থেরাপী করলে ঠিক হয়ে যাবে। আমি কতদিন থেকে বলছি তোমাদের কাউনসেলিং দরকার। এবার আমাকেই খোঁজ নিতে হবে।"

শাশুড়ি ভেবেছিলেন উনি চেষ্টা করলেই আমাদের সমস্যা মিটে যাবে। শ্বশুরের কিন্তু সে ভরসা নেই। তবু কেন যে ক্ষীণ আশা পোষণ করছেন। আমি তো জানি এ বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার সময় হয়ে গেছে। তাও শাশুড়ির কথায় ম্যারেজ কাউন্‌সেলারের কাছে যেতে রাজি হলাম কারণ, শ্বশুর আমাকে লুকিয়ে বুঝিয়েছেন যে আরো কয়েকদিন আমার এ বাড়িতে থাকা দরকার। গ্রীনকার্ড এই ঠিকানাতেই আসছে। ইমিগ্রেশন না থাকলে চাকরি পাবো না। ডিভোর্সের পরে কম্‌পেনসেশন পেতেও অসুবিধে হবে। শ্বশুর আমাকে এ-সব পরামর্শ দিচ্ছেন। আসলে নিজেকে বড় অপরাধী মনে করছেন। ভবিষ্যতে আমাকে নার্সিং কলেজে পড়ার সমস্ত খরচ দেবেন বলেছেন।

বেহালার বাড়িতে প্রথম দিকে ওঁরা জানাতে দিচ্ছিলেন না। আমিও ভেবেছিলাম দূরে থেকে দুশ্চিন্তা দেবো না। কিন্তু কতদিন মনের কষ্ট লুকিয়ে রাখা যায়। সুমনের সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারছি না জেনে ওঁরা খুবই আশাহত। যখন সময় হবে, তখন সব কথা জানাবো।

যেদিন গ্রীনকার্ড পেলাম, সেদিনই রাতে ম্যারেজ কাউনসেলরের কাছে যাওয়ার কথা। সুমন বেশ কিছুদিন ধরে অন্য অ্যাপার্টমেন্টে আছে। শাশুড়ি আপত্তি করেছিলেন। কিন্তু থাকার জন্যে জোর করেননি। আমার উপায় থাকলে নিজেই কোথাও চলে যেতাম। শাশুড়িকে বলেও ছিলাম সে কথা। বললেন — "আমাকে শেষ চেষ্টা করতে দাও। সুমন যাই করুক, এ বাড়িতে তুমি নিজের অধিকারে আছো। চলে যাবে কেন?"

সবচেয়ে মুশকিল, এদেশে এসে পর্যন্ত কাছাকাছি বাঙালিদের সঙ্গেও সেরকম আলাপ হলো না। শ্বশুর, শাশুড়ি কয়েকটা ফ্যামিলির সঙ্গে মেলামেশা করেন। তাঁরাও ওঁদের বয়সি লোকজন। ছেলে মেয়েরা আলাদা থাকে। আমি যে ক-বার বেড়াতে গিয়েছি, আমার বয়সের কাউকে পাইনি। এ জন্যে আর যেতেও চাইনি। আমার আপত্তি ছিল বলে সেই 'রিসেপ্‌শনটা'ও ওঁরা দিতে পারেননি। লোকজনের সঙ্গে আর চেনাশোনা হবে কি করে? চেনা বলতে এঁদের দু-তিন জন আমেরিকান প্রতিবেশী আর "রিজফিল্ড ফার্মাসী"র কাজের মেয়ে দুটি। মাঝে মাঝে নাজমা ভাবি খাবার ডেলিভারী দিতে এসে খানিকক্ষণ গল্প করে যান। এই সামান্য পরিচয়ে নিজের দুঃখের কথা কি জানাবো? লোকেদের আমেরিকায় কতো আত্মীয়স্বজন থাকে। আমার তাও নেই। এ বাড়িতে আর কটাদিন থাকতেই হবে। তারপর দেখি কোথায় যাই।

ম্যারেজ কাউনসেলরের কাছে যেতে হবে শুনে সুমন সোজাসুজি না বলে দিলো। তাই নিয়ে ফোনে শাশুড়ির সঙ্গে ঝগড়া হচ্ছে বুঝলাম। হঠাৎ উনি রেগে ফোনটা আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন — "তুমি কথা বলো। সুমনকে বোঝাও।"

অনেকদিন পরে ওর গলা শুনলাম — "পূর্বা, মাকে বলো কাউনসেলিং-এর কোনো দরকার নেই। আমরা নিজেদের মধ্যে কথা বলতে চাই। বাড়িতে নয়। বাইরে। কালকে তোমার সঙ্গে দেখা করবো।"

— "কি লাভ? কথা তো সেদিন হয়েই গেছে। আমার পক্ষেই এখন তোমাকে অ্যাক্‌সেপ্ট্ করা সম্ভব নয়।"

— "তাহলে কাউন্সেলিং এর জন্যে যাচ্ছিলে কেন?"

— "তোমার মা চাইছেন বলে। কিংবা তোমারও যদি আরো কিছু বলার থাকে সুযোগটা পাওয়া উচিৎ।"

— "সেই জন্যেই কাল দেখা করতে চাইছি। সেদিন তোমাকে সব কথা বলিনি। পূর্বা, তোমার ধারণাটা ঠিক নয়। ফোনে এত কথা বোঝানো যায় না। কাল দেখা করো।"

পরদিন সুমনের অ্যাপার্টমেন্টে গেলাম। জায়গাটা "রিজফিল্ড্ ফার্মাসী"র কাছাকাছি। এদিকটা বেশ বড় শহরের মতো। দোতলার ব্যাল্কনি থেকে নীচের দোকান পাট, একের পর এক রেস্তোরাঁ চোখে পড়ে। আমরা একটা কোরিয়ান রেস্তোরাঁয় লাঞ্চও খেতে গেলাম। কথাবার্তা যা হচ্ছে, ওপর ওপর। সুমনের নতুন করে কি বলার আছে জানিনা। ও কি আরো সময় চাইছে? জড়তাটা ওর শারীরিক না মানসিক বুঝে উঠতে পারছে না? শাশুড়ি র তো ধারণা ও চিকিৎসা করালেই সব ঠিক হয়ে যাবে। আমরা সুখে ঘর সংসার শুরু করে দেবো কিন্তু আমি যে নিজের ভেতর থেকে কোনো সাড়া পাচ্ছি না। সুমনকে ঘিরে এত যে আকর্ষণ ছিল, প্রতীক্ষা ছিল, উন্মাদনার সেই অনুভূতি হারিয়ে যাচ্ছে। হয়ত শেষ অবধি শুধু ক্ষোভ, অসন্তোষ আর করুণাই অবশিষ্ট থাকবে। তার ওপর কি এই সম্পর্ক ধরে রাখা যায়?

লাঞ্চের পর সুমনের অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে এসেছি। দু-চার কথার পর বললাম — "আমার জন্যে তুমি বাড়ি ছেড়ে চলে এলে, তোমার মা খুব আপ্সেট। আমি শীগগীরই চলে যাবো। ইচ্ছে করলে এখনও ফিরে আসতে পারো।"

ম্যাগাজিনের পাতা থেকে চোখ তুলে সুমন উত্তর দিলো — "না। বাড়িতে আর পুরোপুরি থাকবো না। অন্য একটা অ্যাপার্টমেন্টে মুভ করে যাবো। ইন্ফ্যাক্ট্, অনেক আগেই যেতে পারতাম। ঐ, যেটা আমার প্রব্লেম, কি চাই বুঝে উঠতে অনেক দেরি হয়ে যায়।"

— "যেমন, বিয়ের ব্যাপারে হলো? বিয়ের কমিট্মেন্ট্টা যে কি, রিয়ালাইজ-ই করলে না?"

সুমন কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থেকে বললো — "এটাই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল। আমার সেক্শুয়্যাল ওরিয়েন্টেশনকে ডিনাই করতে গিয়ে তোমার ক্ষতি করলাম।"

আমি থতিয়ে গেলাম — "তার মানে?"

সুমন দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে বললো — "আমি হেট্রোসেক্শ্যুয়াল নই। মেয়েরা আমাকে অ্যাট্র্যাক্ট্ করে না। আমার একজন পুরুষ প্রেমিক আছে।"

স্তম্ভিত হয়ে গেছি, কি বলছে সুমন? ওর পুরুষপ্রেমিক আছে? ও তাহলে হোমোসেক্শুয়্যাল! আমেরিকায় যাদের "গে" বলে, সেই পুরুষ সমকামীদের একজন?

আশ্চর্য! ওকে সন্দেহ করেছি। অক্ষম ভেবে করুণা করেছি অথচ একবারের জন্যেও মনে হয়নি ওর জীবনে এরকম একটা গোপন, অস্বাভাবিক দিক আছে। ওর বাবা, মা কি বিশ্বাস করতে পারবেন?

তখনো বিস্ময় কাটেনি। সুমন বলে যাচ্ছিলো — "ভাবছো, বিয়ে করলাম কেন? আসলে কি জানো, আমি এই প্যাশনটাকে অস্বীকার করার চেষ্টা করেছিলাম। একটা সময় গেছে, কিভাবে যে মনের সঙ্গে যুদ্ধ করেছি, তোমাকে বোঝাতে পারবো না। জানো তো, ইন্ডিয়ান ফ্যামিলিতে বাবা, মার কতো এক্স্পেক্টেশন থাকে। আমি ওঁদের একমাত্র ছেলে। কি করে

সত্যি কথাটা ওঁদের জানাবো? তাই বিয়ের ব্যাপারটা কন্‌সিডার করেছিলাম। ভেবেছিলাম স্বাভাবিক সম্পর্ক তৈরী করতে চেষ্টা করবো। স্বাভাবিক বলতে তোমরা যা ভাবো, সেই জীবন বেছে নিতে চেয়েছিলাম।"

— "কিন্তু সুমন, কতো কারণেই তো লোকে বিয়ে করে না। তুমি অন্য এক্সকিউজ দিতে পারতে। ওঁরা নিশ্চয়ই তোমায় জোর করতেন না।"

— "এখন তাই মনে হচ্ছে। ঠিক জোরের ব্যাপারও নয় পূর্বা। আমি নিজেও তো তোমাকে বন্ধুর মতো চেয়েছিলাম। অনেক বাইসেক্‌শুয়্যাল লোক থাকে, যারা একসঙ্গে দুটো লাইফ্ এন্‌জয় করে। কিভাবে পারে জানিনা ...।"

আমার এত বিতৃষ্ণা হলো, ওকে থামিয়ে দিয়ে বললাম — "থাক সুমন। আর এ সব কথা শুনতে ইচ্ছে করছে না। একটা কথা বুঝে গেলাম, তোমার সাহস নেই। তোমার বাবা, মাকে কি আমাকেই সব জানাতে হবে?"

সুমন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বাইরের দিকে চেয়ে রইলো।

ওর সঙ্গে আর আমার দেখা হয়নি। ডিভোর্সের পর দেশে গিয়েছিলাম। ফিরে এসে নার্সিং কলেজে ভর্তি হলাম। সুমিত দত্তর কাছ থেকে পড়ার খরচ নিইনি। ওঁরা যা কমপেন্‌সেশন দিয়েছিলেন, তার সঙ্গে পার্ট টাইম চাকরি করে পড়াশোনা শেষ করেছি। এখন পীট্‌সবার্গের হাসপাতালে কাজ করি। ওঁদের সঙ্গে একটা ক্ষীণ যোগসূত্র রয়ে গেছে। খ্রীসমাসে কার্ড পাই। দেখা হয় না।

এখানেই বিয়ে করেছি। স্বামী মহারাস্ট্রিয়ান প্রফেসর। সুমনের বাবা গ্রীটিংস কার্ড পাঠিয়েছিলেন। ইংরেজী শুভেচ্ছার নীচে জড়ানো অক্ষরে এক লাইন বাংলা আর্শীবাদ — "জীবনের হলাহল যেন অমৃত হয়ে ওঠে।"

আজ আর মনে হয় না এদেশে আমার আর কেউ নেই।

রাজকাহিনী

এই জীবন মানুষকে কতো ছবি দেখায়। বিচিত্র চিত্রশালার মাঝখান দিয়ে যেতে যেতে যে দু'চোখ মেলে দ্যাখে, সে দ্যাখে। যদি প্রকাশের উপযুক্ত ভাষা থাকে, লেখার মধ্যে দিয়ে বহুজনের জন্যে আরো বর্ণময় ছবি আঁকো।

দীপংকর ভাবে তার সবদিক থেকেই অভাব রয়ে গেছে। সাদামাটা জীবনে তেমন কোনও দুলর্ভ মুহূর্তের সঞ্চয় নেই, যা থেকে অন্তত একটা সাড়াজাগানো গল্পও লেখা যায়। শুধু যখন উদয়নারায়ণের কথা মনে পড়ে, দীপংকর যেন কিছু অনুপ্রেরণা পায়। অবচেতনে একটি রূপকথার শুরু থেকে শেষ কল্পনা করতে থাকে। উদয়নারায়ণের চরিত্রে উপন্যাসের বীজ আছে কিনা এ সম্পর্কে দীপংকর সম্ভ্রম মেশানো বিস্ময় বোধ করেছিল। যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না উদয় এখানে থাকে।

কুমার উদয়নারায়ণ রাই দেব তার সহপাঠী। ততোদিনে রাজাদের প্রি.ভি. পার্স গেছে। তবু ঠাটবাটের অনেকটাই ছিল। মধ্যপ্রদেশের নেটিভ স্টেটে উদয়ের পূর্বপুরুষরা একসময় যে বিলাসবৈভবের মধ্যে জীবন কাটিয়েছে, উদয় সে ঐশ্বর্যের একাংশ ভোগ করেছিল। রায়পুরের ''রাজকুমার কলেজে'' পড়েছে। ওর শৈশব কৈশোরের সঙ্গী সহপাঠীরা প্রায় সকলেই ছিল রাজা-রাজড়ার বাড়ির ছেলে। তারপর কলকাতায় পড়তে এসেছিল। ইন্দিরা গান্ধীর ওপর উদয়ের তখন বেশ রাগ। দীপংকর ঠাট্টা করে বলত —''ভদ্রমহিলা রাজ্য কেড়ে নিয়ে তোর বিদ্যেবুদ্ধির বহর বাড়িয়ে দিলেন। নয়তো ইঞ্জিনীয়ারিং পড়তে আসতিস না।''

উদয় হাসতো। বলত —''আমার বাবাকে গিয়ে বুঝিয়ে আয়।''

এইসব পুরোনো কথা দীপংকর এখনো মনে রেখেছে। এখানকার ম্যাগাজিনে একটা গল্প লিখবে ভেবে আরো বেশি করে ভাবতে চেষ্টা করছে। উদয়নারায়ণকে সে গল্পের নায়ক করতে চায়। তার পরের চিন্তাগুলো এখনও সাজিয়ে উঠতে পারেনি। গল্পের খাতিরে অসম বন্ধুত্বের জন্যে উদয়নারায়ণকে রাজপুত্র আর নিজেকে ছিন্নমূল পরিবারের সংগ্রামী যুবক সাজিয়ে দুজনের মাঝখানে এক আপাত দূরত্ব রচনা করা যেত। ক্রমশ উদয়নারায়ণের চরিত্রে সমাজবাদের প্রভাবে, দীপংকরের দারিদ্র্যের অহংকার অথবা হীনমন্যতাবোধ নিয়েও গতানুগতিক দ্বন্দ্বের ছবি আঁকা যেত। কিন্তু দীপংকর সেভাবে লিখতে চায় না। সে তার হারানো দিনের গোপন মুগ্ধতাবোধের স্মৃতি ধরে রাখতে চায়। একসময় এই বোধ তাকে প্রায় আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। উদয়দের ঐশ্বর্য, সেই সম্ভ্রান্ত

পরিবেশ, বিশিষ্ট ব্যবহার, আদর, আপ্যায়ন তিল তিল করে কি এক সম্মোহন সৃষ্টি করত। প্রসন্নতা ছড়িয়ে দিত। দীপংকরের মনে হত রূপকথার রাজ্যে তারও কোনো ভূমিকা আছে।

কখনও সন্ধেবেলা উদয়ের ঘরে বসে বাগান থেকে ভেসে আসা ঘন্টা শুনতে পেত। তখন গোপীনাথ জিউ-এর মন্দিরে সন্ধ্যারতির সময়। পূজো শেষ হলে রূপোর রেকাবিতে প্রসাদ আসত। কোনদিন থালাভরা জলখাবার। দীপংকর কেমন খুশী হয়ে উঠত। সেই প্রসন্নতাবোধ বলত—আহা রাণীমা আমার জন্যে পাঠিয়েছেন।

কখনও বিশাল দালান পার হয়ে যাওয়ার সময় রাজদর্শন হত। ইজিচেয়ারে শুয়ে বই পড়ার ফাঁকে রাজামশাই এক পলক চেয়ে দেখতেন। একটি-দুটি কথা বলতেন। দালানে ঝাড়লণ্ঠনের আলোয় সারি সারি মার্বেল-মূর্তির লক্ষ্যহীন নিষ্পলক দৃষ্টির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দীপংকরের ঘোর লাগত। পর্দার আড়ালে সেতারের রিমঝিম সুর— কে যে রেওয়াজ করত! দীপংকর সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে নেমে আসত। সমস্ত স্নায়ু জুড়ে রিম্‌ঝিম রিমঝিম....

উদয়ের বোনকে সে একবারও দ্যাখেনি। তখন তার স্বপ্ন দেখার বয়স। সত্যিই সে তো আর রাজকন্যাকে পাওয়ার আশা করত না। সেই মেয়ে শুধু দীপংকরের বুকে আলতো একটু যন্ত্রণা রেখে ময়ূরভঞ্জ নয়তো কুচবিহারের রাণী হয়ে চলে যেতে পারত। রাজবাড়ীতে গিয়েও রাজকন্যা দেখার কৌতূহল তার মিটল না।

ফাইন্যাল ইয়ারের আগেই উদয় কলেজে পিছিয়ে গেল। দীপংকরের সঙ্গে ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করা হল না। ও তখন গানবাজনা নিয়ে মেতেছে। নামকরা গাইয়ে-বাজিয়েরা কলকাতায় এলে উদয়দের বাড়িতে আসর বসত। দীপংকরও একবার সরোদ শুনতে গিয়েছিল। যার কোনদিন বারোয়ারি কন্‌ফারেন্সে যাওয়ারই সুযোগ হয়নি, সে একেবারে রাজবাড়িতে বসে বাজনা শুনেছিল।

গানবাজনার ঝোঁকে উদয় মাঝেমাঝেই কলেজ করত না। দুম্ করে আজ বেনারস, কাল গোয়ালিয়র, নয়তো লক্ষ্ণৌ চলে যেত। কুমার গর্ন্ধবের জন্যে পাগল। যখন-তখন ইন্দোরে গিয়ে বসে থাকত। এই করে শেষ পর্যন্ত কলেজে দুটো বছর নষ্ট করল। দীপংকর ততোদিন পাশ করে রাঁচীতে চাকরি করছে।

সত্তরের দশক বাঙালি ইঞ্জিনীয়ার-ডাক্তারদের জীবনে নতুন সুযোগ এনে দিল। আমেরিকায় জন কেনেডির দৌলতে ইমিগ্রেশনের দরজা খুলে গেছে। শুধু মেধা সম্বল করে শত শত বাঙালি বিদেশ পাড়ি দিচ্ছে। চোখের সামনে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের রঙিন স্বপ্নময় ছবি। ভাগ্য অন্বেষণের জন্যে অনেকেই নিউইয়র্ক-এ এসে পৌঁছোচ্ছে। জাতবিরাদরির দেখা মিলবে, কিছুটা ভরসা পাওয়া যাবে—তারপর নিজের নিজের ভাগ্য।

ম্যানহ্যাটনের "সিক্‌স হানড্রেড ওয়েস্ট" আর "ক্লিনটন আর্মস হোটেলে" ঘর ভর্তি হয়ে যাচ্ছে। আরো একটা দুটো সস্তার হোটেলেও সদ্য আসা বাঙালি ইমিগ্র্যান্টের ভিড়। কেনেডি এয়ারপোর্ট থেকে এইসব ঠিকানার কোনও একটাতে প্রায় দিনই কেউ না কেউ সুটকেস হাতে এসে দাঁড়াচ্ছে। ক্রমশ স্বচ্ছলতা, সাফল্য, প্রতিষ্ঠার স্বপ্নের সাথে বাস্তবের কঠিন লড়াই আর মোকাবিলার মধ্যে দিয়ে রচিত হচ্ছে বাঙালির স্বতন্ত্র ইতিহাস।

এদেরই মাঝে দীপংকর এসে পৌঁছোল। দুঃসহ শীতের সকালে বেঢপ সাইজের সেকেন্ডহ্যান্ড কোট আর বাটার অ্যামব্যাসাডর জুতো পরে মরিয়া হয়ে "লাইনের চাকরি" খুঁজে বেড়ানো শেষ দুপুরে সেন্ট্রাল পার্কের বেঞ্চে বসে বসে আত্মসমীক্ষা, কুয়াশা জড়ানো

সন্ধ্যায় একরাশ ক্লান্তি আর হতাশা নিয়ে হোটেলে ফিরে ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের দাদাদের অমৃতবাণী শ্রবণ—"অড জব" নেওয়া আর না নেওয়া নিয়ে তর্কবিতর্ক বেশিক্ষণ স্থায়ী হত না। যার সঞ্চিত ডলারের পুঁজি শেষ হতে চলেছে, তার কাছে ইনসিওরেন্স কোম্পানীর মামুলি চাকরি, নয়তো ব্যাংকের টেলারের কাজই আপাত ভরসা। দীপংকর যখন এই ভেবে মনকে একরকম প্রস্তুত করছে, ঠিক তখনই ভাগ্য প্রসন্ন হল। "স্টার অ্যান্ড মিলার" নামে এক ইঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানীতেই চাকরি হয়ে গেল, "অড্ জব"নিতে বাধ্য হল না।

"ক্লিনটন আর্মস্ হোটেলে"র সন্ধ্যের আড্ডায় ক্রমশ যেন নৈরাশ্যের ছায়া নামছিল! প্রফেশন্যাল ডিগ্রী থাকা সত্ত্বেও মার্কিন অভিজ্ঞতার অভাবে কতজন চাকরি পাচ্ছে না। বাধ্য হয়ে দোকানে, সুপার মার্কেটে, পোস্ট অফিসে টেমপোর‍্যারি কাজ নিচ্ছে। নাইটগার্ডের কাজও নিয়েছে কয়েকজন। সাময়িক উপার্জনের তাগিদে আপস করে নেওয়া ছাড়া উপায় কি? এরই মাঝে ছোট ছোট ঈর্ষা, প্রতিযোগিতার মনোভাব প্রচ্ছন্ন থাকছে না। দীপংকরের "ডিজাইনারের" চাকরি নিয়েও দু-চারজনের অবিশ্বাস, ঈর্ষা, ঠাট্টা, রসিকতার চেষ্টা ওকে আহত করেছিল। ইংল্যান্ড থেকে আসা মোহন বিশ্বাস নিজেকে ভীষণ কোয়ালিফায়েড ভাবতেন। অথচ মনোমত চাকরি পাচ্ছেন না। আমেরিকান কোম্পানীগুলো যে শিবপুর-যাদবপুরের ছেলেদের সঙ্গে মোহনদাকেও এক করে ফেলছে, ইউ. এস. ডিগ্রী বা ওয়ার্কিং এক্সপিরিয়েন্স নেই বলে হাঁকিয়ে দিচ্ছে, এতে উনি ভীষণ বিরক্ত। সেই মোহন বিশ্বাস দীপংকরের চাকরির খবরে বেশ মুষড়ে পড়েছিলেন। "স্টার অ্যান্ড মিলার" গিয়ে হাজির হয়েছিলেন। তিনি "বিলেত ফেরৎ", আর সুযোগ দিলে দীপংকরের চেয়ে কম মাইনেতেই কাজটা নিতে রাজি আছেন বলে আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। পরে ইহুদী মালিকের কাছে এই ঘটনা শুনে দীপংকর যত না লজ্জা পেয়েছিল, দুঃখ পেয়েছিল তার বেশি। নৈরাশ্য আর ব্যর্থতাবোধ মানুষকে কখন যে কোন্ প্রবণতার মধ্যে নিয়ে যায়!

অথচ অতীন চ্যাটার্জির মতো শুভাকাঙ্খী মানুষও ছিল। দীপংকর-অনুপ আর শ্যামলের নতুন চাকরির খবরে ক্লিনটন আর্মস-এ পার্টি লাগিয়ে দিল। মাংস-ভাত রেধেঁ কি আনন্দ! চাঁদা করে শ্যাম্পেনের বোতল কিনে এনে গেলাসে গেলাসে ঠোকাঠুকি। তিনজন বাঙালি অড্ জব না করেই সোজাসুজি ইঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানীতে ঢুকে গেছে—অতীনের কাছে এটা নাকি সেলিব্রেট্ করার মতো খবর।

ছ'মাসের ভেতর দীপংকর ডিজাইন্ ইঞ্জিনীয়র হল। ইহুদী মালিকরা কথা রেখেছেন, মাইনে অনেকের কাছেই আশাতীত ছিল। সব মিলিয়ে দীপংকরের দিনগুলো ভালোই কাটছিল। পার্টটাইম পড়াশোনা শুরু করবে ভেবে ইউনিভার্সিটিতে খোঁজখবর নিচ্ছিল।

একবছর পরে উদয়ও চলে এল। কলকাতা থেকে দীপংকরকে চিঠিতে ফ্লাইট নম্বর দেওয়াতে ও এয়ারপোর্টে গিয়েছিল। দেড় বছর পরে দেখা—এদেশে উদয়ের আরো চেনাশোনা লোকজন থাকা সত্ত্বেও ও যে দীপংকরের কাছেই উঠতে চায়, এ ব্যাপারটা দীপংকরকে খুশী করেছিল। খানিক উচ্ছ্বাস বিনিময়ের পর দীপংকর উদয়ের মালপত্রের বহর দেখে অবাক। ঢাউস হাতব্যাগে একজোড়া তবলা এনেছে, এক্সেস লাগেজ-এর ভাড়া দিয়ে কালো বাক্সে হারমোনিয়ম। কোনও ইমিগ্র্যান্টকে প্রথমবারে এমন বাজনাবাদ্যি নিয়ে আমেরিকায় ঢুকতে দ্যাখেনি দীপংকর। ঠাট্টা করাতে উদয় যেন অবাক হয়ে বলল—"কেন. এদেশে লোকেরা গান গায় না?"

দীপংকর বলেছিল—"এরা আর আমরা? রুটির জোগাড় করতেই প্রাণ যাচ্ছে!"

উদয় কথাটা কানে নিল না। আমেরিকার চাকরি-বাকরির বাজার নিয়ে কিছু জানতেই চাইল না। দীপংকরের সঙ্গে বাস্-এ চড়ে সারা পথ পুরোনো গল্পগুজব চালিয়ে গেল।

দীপংকর ক্লিনটন আর্মস্ হোটেলে ওর নিজের ফ্লোরেই উদয়ের জন্যে একটা ঘর ভাড়া নিয়ে রেখেছিল। তিনতলায় পৌঁছে চাবি খুলে ঘরে ঢুকল। পুরোনো কার্পেট, সাধারণ ফার্ণিচার। জানলার কাচ তুলে দিলে রাস্তার হট্টগোল,চলন্ত গাড়ি থেকে ঝিংচাক্ বাজনা ভেসে আসে। আপটাউনের ঘিঞ্জি পাড়া। কাছেই সাব্-ওয়ে আর মোড়ের মাথায় জ্যান্ত মাছের দোকান বলে বাঙালির খুব সুবিধে। ক্লিনটন আর্মস্-এর কিচেন্সুদ্ধু অ্যাপার্টমেন্টে তারা প্রায়দিনই মৎসমুখ করে। চাঁদা করে বাজার আসে। দল বেঁধে রান্না করে।

এরকম পরিবেশে উদয় থাকতে পারবে বিনা সন্দেহ। কিন্তু রাজপুত্র হলেও বেকার বন্ধুর জন্যে আপাতত দীপংকর এর চেয়ে ভালো বন্দোবস্ত আর কি করবে? প্রথম সপ্তাহের ভাড়াটা নিজেই দিয়ে দিয়েছে। উইক্লি পঁয়ত্রিশ ডলার। তারপর দেখা যাক, উদয় কি ঠিক করে! দেশ থেকে হয়তো যথেষ্ট ডলার নিয়ে এনেছে, ওর আর চিন্তা কিসের?

উদয়ের ঘরে জিনিসপত্র রেখে দীপংকর ওকে নিজের ঘরে নিয়ে এল। ইলেকট্রিক কেটলিতে কফির জল বসাল। ওর বিছানায় বসে ক্লান্ত গলায় উদয় বলল—"জার্নিটা কি লম্বা রে! অ্যাটলান্টিক আর শেষ হয় না...!"

দীপংকর হাসল—"এখনই টায়ার্ড হয়ে পড়ছিস? প্রচুর লড়তে হবে বন্ধু! রয়্যাল লাইফ্স্টাইল ছেড়ে কেন যে এদেশে এলি!"

উদয় জিজ্ঞেস করল—"চট করে চাকরি পাব না বলছিস?"

কফি তৈরি করতে করতে দীপংকর জবাব দিল—"চট্ করে মানে দু-এক সপ্তাহের মধ্যে হয়ত কিছু পাবি না। দেখা যাক।"

কফি খেতে খেতে কথা হচ্ছিল। শেষ করে কাপ এগিয়ে দিল উদয়—"আর এক কাপ দে তো, নইলে ঘুম ছাড়বে না।"

"আজ আর জেগে থাকার দরকার কি? তাড়াতাড়ি ডিনার খেয়ে শুয়ে পড় —খিদে পায়নি?"

"ডিনার? কি খাওয়াবি কি? ভাত-টাত পাওয়া যাবে?"

"ভাত-ডাল সব পাবি—নীচের অ্যাপার্টমেন্টে কিচেন আছে। দু-চারজন রান্না করে, ইচ্ছে করলে ওদের সঙ্গে "শেয়ার" করে খাওয়া যায়। আমি অবশ্য রোজ 'ইন্ডিয়ান' খাই না।"

"আমার জন্যে ঝামেলা করিস না। যা হয় খেয়ে নেব।"

একটু পরে নীচে গিয়ে জয়দেব শংকরদের অ্যাপার্টমেন্টেই দীপংকররা খেয়ে নিল। মাংসের খুব সুখ্যাতি করল উদয়। জয়দেব উৎসাহিত হয়ে ওদের রান্নার টিমে জয়েন করতে বলল। উদয় রাজী। দীপংকরদের হাসি পাচ্ছিল,উদয় রান্না করবে। অবশ্য দলে না ভিড়ে উপায় কি?

সে রাতে উদয় আর বেশিক্ষণ জেগে থাকতে পারেনি। খানিক আড্ডা দিয়ে নিজের ঘরে চলে গেল।

দু-চারদিন পরে উদয় ঘরভাড়ার জন্যে ডলার দিতে চাইল, দীপংকর প্রথম সপ্তাহের পঁয়ত্রিশ ডলার নিল না। এটুকু সৌজন্য দেখানোর মতো অবস্থা তার হয়েছে। তবে পরের

সপ্তাহের জন্যে উদয়কে নীচের রেন্টিং অফিসে গিয়ে চেক্ জমা দিতে হবে। দীপংকর খোলাখুলি জিজ্ঞেস করল—"এভাবে থাকতে পারবি, না অন্য পাড়ার অ্যাপার্টমেন্ট দেখব? উইক্লি পঞ্চাশ ডলার মতো দিলে ছোট্ট অ্যাপার্টমেন্ট পেয়ে যাবি, তবে অফিসটফিস কাছে হবে না।"

উদয় অবাক হল—" কেন. অন্য পাড়ায় যাব কেন? তোরা তো এখানে আছিস?

শেষ পর্যন্ত ঐ তীর্থস্থানেই উদয় থেকে গেল। ততদিনে অনেকে ভালো চাকরি পেয়ে ক্লিনটন আর্মস্ ছেড়ে চলে গেছে। দেশ থেকে ফ্যামিলি আসার পর অ্যাপার্টমেন্টে সংসার পেতেছে। ক্লিনটন আর্মস-এ আবার একদল ভাগ্যসন্ধানী এসে পৌঁছেছে। দীপংকর কোথাও যায়নি। এ হোটেলে তার ঘরটি বেশ একটেরে। দু'পা দূরে সাব্ওয়ে। সন্ধ্যের পরে হোটেলে ফিরে ইচ্ছে হলেই একদল বাঙালি ছেলের সঙ্গে আড্ডা দেওয়া যায়। কেউ কেউ সদ্য সদ্য দেশ থেকে এসেছে। দীপংকর তাদের চাকরির খোঁজখবর নিয়ে আসে, রেসিউমে লিখে দেয়, দুজনকে এর মধ্যেই নিজের অফিসে ঢুকিয়েছে। "স্টার অ্যান্ড মিলার"-এ ক্রমশ তার প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়ছে। অবশ্য মাইনেপত্র সে তুলনায় বাড়ছে না। মিলার সাহেব এজন্যেই নাকি দীপংকরকে ঠিকমতো "রেইজ" দিতে পারছেন না। সামনের বছর নিশ্চয়ই অবস্থা ভালো হবে। দীপংকর এধার-ওধার অ্যাপ্লাই করছে, সেরকম কিছু পেলে এ চাকরি ছেড়ে দেবে। আমেরিকার কেউ প্রথম চাকরিতে পড়ে থাকে না।

উদয় সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করে এসেছিল। কিন্তু নিউইয়র্কে এসে মাত্র সপ্তাহ তিনেক লাইনের চাকরি খুঁজে বেড়াল। দীপংকর ওকে সাহায্য করতে চাইছিল—ওর নিজের অফিসে দুজন বাঙালি ছেলেকে ঢুকিয়েছে, উদয়ের জন্যেও একরকম বলে রেখেছিল। রাতারাতি তো আর চাকরির ব্যবস্থা করা যায় না। একটু সময় লাগছিল। উদয়কে দিয়ে রেসিউমে লেখানো, তার কপি করে আনা, ওকে ইন্টারভিউ-এর জন্যে তৈরি করা—দীপংকর সবই করেছিল কিন্তু উদয় ধৈর্য ধরতে পারল না, তিনসপ্তাহের মাথায় ব্রংক্সের একটা অফিস সিকিওরিটি গার্ডের চাকরি নিয়ে নিল। অন্যের যে কাজ নিরুপায় হয়ে করেছে, উদয়ের তো সেরকম মরিয়া অবস্থা ছিল না। দেশ থেকে ছ-সাতশো ডলারের ওপর নিয়ে এসেছিল, তাছাড়া দীপংকর তো ছিল—উদয় একবারও ওর মতামত নিল না। তাও দীপংকর গায়ে পড়ে অনেক বুঝিয়েছিলো, বলেছিলে—"আমি তো অফিসে চেষ্টা করছি, ততদিন তুই একটা ব্যাংকে-ট্যাংকে কাজ নিয়ে নে। গার্ডের চাকরি করবি কেন? ব্রংক্স-এর ঐসব পাড়ায় দিনের বেলায় খুন হয়....!'

উদয় এককথায় উড়িয়ে দিল—"দূর! ওসব হিসেবপত্রের মধ্যে কে যাবে? ব্যাংকের চাকরি কি বিগ্ ডীল্? খুন-টুনের কথা বলিস না! ব্যাংকের হোল্ড-আপ্ হচ্ছে না?"

দীপংকরের খুব রাগ হয়েছিল। এত চেষ্টা করে কি লাভ হল। উদয় যেন ইচ্ছে করেই এটা করলো। দীপংকরের অফিসে চাকরি পেলে তো ওর ডিভিশনেই কাজ করতে হবে, সেটাই আসলে উদয় মেনে নিতে পারছে না। এইজন্যেই কায়দা করে এড়িয়ে গেল। অন্য কোথাও ঠিকই চেষ্টা করছে, চাকরি পেয়ে গেলে গার্ডের চাকরিটা ছেড়ে দেবে। উদয়ের এখন অনেক উপদেষ্টা জুটছে। তাদের বুদ্ধিতেই চলছে। তারা তো জানে না উদয় রাজবাড়ির ছেলে, যদি টুপি আর দারোয়ানের পোশাক পরে কারখানা পাহারা দিতে চায় দিক, ও আর সে নিয়ে মাথা ঘামাবে না।

আশ্চর্য, দেশে থাকতে দীপংকর উদয়কে রাজার ছেলে বলে কখনো বাড়তি খাতির করেনি, অথচ আমেরিকায় ইমিগ্র্যান্টদের প্রাথমিক লড়াই-এর দিনে, সস্তার হোটেলে আর পাঁচটা সাধারণ ঘরের ছেলের সঙ্গে উদয় যখন পেয়াঁজ কেটে রান্নার যোগাড় দিতে লাগল, মাটিতে কাগজ বিছিয়ে সকলের সঙ্গে বারোয়ারি ভাত-মাংস খেতে বসল, বাসন মাজতে শুরু করল, ছাড়া জামাকাপড়ের বস্তা দুলিয়ে ঐ বাজে পাড়ায় মাতাল আর বেশ্যার ভিড় ঠেলে রাস্তায় লন্ড্রোম্যাটে কাপড় কাচতে যেতে লাগল—দীপংকরের বারবার মনে হল, মানায় না উদয়কে, আমাদের দলে মানায় না! ঝোঁকের মাথায় বিদেশে এসে পড়েছে। ওর ব্যবহারের সুযোগ নিয়ে সবাই যেন ওর ঘাড়ে কাজের বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছে।

উদয়ের মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা দেখে দীপংকর অবাক হয়ে যেত। সারাদিন ঐ পাহারদারির চাকরি করে এসে সন্ধ্যেবেলা রান্নাঘরে ঢুকত—আজ বাধাঁকপি ব্রকোলির ঘ্যাঁট রাঁধছে, কাল মাংস কাটতে বসেছে, যে যা পারে করিয়ে নিচ্ছে। পনেরো-কুড়িজনের রান্না উদয় একাই নামিয়ে ফেলছে, এক ফোঁটা বিরক্তি নেই।

খাওয়াদাওয়া মিটতেই গানের আসর। হারমোনিয়ম নিয়ে নিজের ঘরেই দল জোটাত উদয়। তবলা দুটো অবশ্য যাকে তাকে পেটাতে দিত না। কমবয়েসি ছেলেগুলো অন্য হোটেল থেকেও চলে আসত। গানের তালে তালে চামচে দিয়ে ফ্রাইপ্যান্ বাজাত। দীপংকর ঐ প্রথম উদয়ের কাছেই মেহেদী হাসানের নাম শুনেছিল—"রফ্‌তা রফ্‌তা" গানটা ওর মুখেই প্রথম শোনা।

মাঝে মাঝে ড্রিংক্ করে উদয় বেশ 'হাই' হয়ে যেত। উইক্-এন্ডে রাত জেগে হৈহল্লোড়। কমবয়সী ছাত্রগুলো মজা পেত—গানবাজনা থামিয়ে উদয়ের জ্ঞানী-জ্ঞানী লেক্‌চার শুনে তর্কে ভিড়ে যেত। সময়ের এই অপচয় দীপংকরের অসহ্য লাগত। উদয়ের কি ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই? আমেরিকায় গার্ডের চাকরি করেই জীবন কাটিয়ে দেবে? উদয়ের কথা ভাবতে বসে দীপংকরের স্মৃতিতে হারানো সময়ের ছবি ভেসে উঠত। উদয়দের সুন্দরগড়ের সেই সাদা দুর্গের মতো রাজপ্রাসাদে, আলিপুরে ফোয়ারা আর শ্বেত পাথরের পরী দিয়ে সাজানো বাগানঘেরা বিশাল বাড়ি, সম্ভ্রান্তচেহারার মানুষজন...কত কিছু মনে পড়ত। দীপংকর আশ্চর্য হয়ে ভাবত, সে তো কিছুই ভোলেনি—অথচ উদয় কি অনায়াসে তার আভিজাত্য ভুলে যাচ্ছে! দীপংকর একদিন রেগে উঠে বলেছিল—"তোর কোনো অ্যাম্‌বিশন নেই? ফালতু আড্ডা দেওয়ার জন্যে তুই দেশ ছেড়ে এত দূরে এলি?"

উদয় রাগ করেনি। খানিক চুপ করে থেকে বলেছিল—"তুই একটা কিছু ব্যবস্থা করে দে, আমার দ্বারা ঘুরে ঘুরে চাকরি পাওয়া অসম্ভব।"

তখন আর দীপংকর কিছুই করে উঠতে পারেনি। নতুন চাকরি নিয়েছে, সে-অফিসেও তখন নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতেই ব্যস্ত। বড় কোম্পানীতে সবেমাত্র ঢুকে অন্যের জন্যে কিছু ব্যবস্থা করা শক্ত, দীপংকর চেষ্টাও করেনি।

চাকরি বাকরি পাল্টাতে পাল্টাতে দীপংকর একসময় নিউইয়র্ক ছেড়ে ওহায়ো চলে এল। ততদিনে নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটি থেকে এম. এস্ করেছে। প্রফেশন্যাল ইঞ্জিনীয়র-এর লাইসেন্স্ পরীক্ষায় পাশ করেছে। মাঝে কিছুদিন পেনসিল্‌ভানিয়াতে ছিল, উদয়ের সঙ্গে তখনও ফোনে কথা হত। উদয় তখন "নিউইয়র্ক টেলিফোন" কোম্পানীতে টেক্‌নিশিয়ানের চাকরি করছে, মনে খুব প্রশান্তি। কার কাছে যেন তবলা শিখছে। দীপংকর বিয়ে করলো

চুয়াত্তর সালে। ওর বউ সুমনা ডাক্তার। চাকরির ব্যস্ততা, সংসার, ছেলেমেয়ে মানুষ করা—এই সব নিয়ে বছরগুলো হু-হু করে পার হয়ে যাচ্ছিল।

ক্রমশ উদয়ের সঙ্গে দীপংকরের যোগাযোগ কমে আসছিল। উদয় মাঝে মাঝে খোঁজ নিত। দীপংকরেরই ফোন করা হয়ে উঠতো না। মাঝে কার কাছে খবর পেলো উদয় টেক্সার চলে গেছে। একবার একটা বাংলা ম্যাগাজিনে ট্র্যাভেল্ এজেন্সী আর ফোন্ নম্বর চোখে পড়েছিল। দীপংকর ফোন করল। সেদিন উদয় অনেক খবর দিল।

দীপংকর জিজ্ঞেস করেছিল—'বিয়ে করেছিস?''

''অনেক দিন। তোর সঙ্গে কন্ট্যাকট্ নেই,। তাই জানিস না।''

''কোথায় বিয়ে করলি? এখানে না ইন্ডিয়ায়?''

''ইন্দোরে। তোরা একবার আয় না—আমিও তো তোর বউকে দেখেনি।''

দীপংকর সেদিন এই ভেবে স্বস্তি পেয়েছিল যে বিয়েটা অন্তত উদয় নিজের বাড়ির কথায় করেছে—ইন্দোরে শ্বশুরবাড়ি মানে রাজবংশ-টংশ হবে আর কি! নিউইয়র্কে থাকার সময় ব্রুকলীনের এক ডিভোর্সী মহিলাকে নিয়ে এধার ওধার গান শুনতে যাচ্ছিল উদয় তারপর বোধহয় ঘনিষ্ঠতা আর বেশিদূর এগোয়নি। যা হোক্ বিয়ে যখন হয়ে গেছে, সংসারী উদয়কে একবার দেখে এলেও হয়। দীপংকর হিউস্টনে গেলে দেখা করবে নিশ্চয়ই। কিন্তু ঐ পর্যন্তই, ড্যালাস্ গেলো দু-তিনবার—হিউস্টনে আর যাওয়া হল না।

বছরকয়েক বাদে অফিসের মিটিং-এ দীপংকর প্রথমে হিউস্টনে গেল। মাথার মধ্যে ঘুরছে, এবার ঠিক উদয়ের সঙ্গে দেখা করবে। হোটেলে থেকে রণেনকে ফোন করল। রণেন ওদের ক্লাসমেট। পরের দিনই হোটেলে চলে এল। এ কথা সে কথার পরে দীপংকর জিজ্ঞেস করল—''উদয়নারায়ণকে মনে আছে? রাইভঞ্জ দেব? ও এখানে থাকে জানিস?''

রণেন বলল—''প্রায়ই দেখা হয়। তোর খবর নেয়। একটা ফোন করতে পারিস।''

ভাবছি একবার দেখা করবো। কোথায় থাকে জানিস?''

রণেন ঘড়ি দেখে বলল—''এখন যাবি? দোকানটা প্রায় ডাউন টাউনেই—মিনিট কুড়ির ড্রাইভ্!''

রণেনের গাড়িতে যেতে যেতে নানা কথা হচ্ছিল। রণেন বলছিল, ওর মেয়েরা মাঝেমাঝেই উদয়ের দোকানে আসতে চায়। দীপংকর বুঝতে পারছিল না ইন্ডিয়ান গ্রোসারী স্টোর আর ট্র্যাভেল্ এজেন্সীতে ছোটদের কি আর্কষণ থাকতে পারে।

রণেন একটা শপিং সেন্টারের পার্কিং লটে গাড়ি পার্ক করল। দীপংকরকে নিয়ে একটু হেঁটে গিয়ে একটা পিৎজার দোকানে ঢুকল। দীপংকর ভাবছিল, অসময়ে রণেন তাকে পিৎজা খাওয়াতে নিয়ে এল কেন? ঠিক তখনই উদয়কে দেখতে পেল— দোকানের কাউন্টারে রাখা কাগজের বাক্সে গরম পিৎজা সাজাচ্ছে। পেছনে গনগনে আগুন। সেখান থেকে বড় বড় ট্রে বের করে আনছে। হুবহু পিৎজাওলাদের মতো হাবভাব।

রণেন আর দীপংকরকে দেখে উদয়ের মুখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। গায়ের রং তামাটে মেরে গেছে। ঘাড় পর্যন্ত লম্বা চুল। গায়ে ইটালীয়ান দোকানদারদের মতো রঙীন টি-শার্ট। শুধু হাতের ওপর উল্‌কি আঁকা নেই। কাউন্টার থেকে বেরিয়ে এসে দীপংকরকে একহাতে জড়িয়ে ধরল। দেশে থাকতে উদয়ের শরীরের ঘাম, চীজ, টমেটো, পেঁয়াজ—সব কিছু মিলিয়ে অন্যরকম একটা গন্ধ পেল অথবা আরোপ করতে চেষ্টা করল। রূপকথার শর্ত

পূরণের দায় থেকে উদয় কবেই ছুটি নিয়েছে, তবু দীপংকর জিজ্ঞেস করল—"তোর নিজের বিজনেস্ কে দেখছে? নাকি এ দোকানটাও ফ্র্যান্‌চাইস্?"

উদয় হা-হা করে হাসল—"কেন, আমি এখানে কাজ করতে পারি না?"

সেদিন বিকেলে উদয় কিছুক্ষণের জন্যে ওদের নিজের বাড়িতে নিয়ে গেল, গাড়িতে যেতে যেতে দীপংকর আবার একই কথা জানতে চাইল।

উদয় বলল—'আগের বিজনেস বিক্রি করে দিয়েছি। এটা পার্টনারশীপে চালাচ্ছি। ইটালীয়ান পার্টনার।"

দীপংকর এবারও যেন স্বস্তি পেল। উদয় যে পিৎজার দোকানের কর্মচারী না হয়ে তার অর্ধেক অংশের মালিক হয়েছে এই অনেক। চাকরি-বাকরি যখন করবেই না, ব্যবসাই ঠিকমতো চালিয়ে যাক। উদয়ের ভালোমন্দ দেখার দায় কেউ কখনো দীপংকরের ওপর চাপিয়ে দেয় নি, তবু উদয়কে কষ্ট করতে দেখলে কেমন যেন দুঃখ হয়।

ওদের সেদিন উদয়ের বাড়িতে বেশিক্ষণ থাকা হল না। হোটেলে বিজনেস ডিনার আছে। উদয় আর তার বউ অনেক করে বলা সত্ত্বেও দীপংকর ওদের কাছে ডিনার খেতে পারল না। উদয়ের বউ-এর নাম ভাগ্যলক্ষ্মী। উদয় 'লছমী' বলে ডাকছিল। কার মতো যে দেখতে দীপংকর ভাবতে চেষ্টা করছিল। খুব চেনা চেহারা, অথচ ইন্দোরের রাজকন্যাকে ও আগে কোথাও দেখেনি। চা খেতে খেতে গল্প হচ্ছিল। হঠাৎ ডোরবেল বাজিয়ে তিনটি ছোট ছেলেমেয়ে বাড়ি ফিরল। মোমের পুতুলের মতো একটা বোন, আর তার রোগা রোগা দুটো দাদা। উদয় বলল—"দিস ইজ্ ইওর দীপ্ আংক্‌ল্।" ওদের নাম ওরা নিজেরাই বলল—রণজয়, সঞ্জয়, সোহিনী।

আর কখনো ওদের সঙ্গে দীপংকরের দেখা হয়নি। এত বছর পর গল্প লিখতে বসে সে উদয়ের ভাবনাচিন্তাগুলো অনুধান করতে চেষ্টা করছিল। দীপংকর লিখছিল—"অনেকদিন আমাদের মধ্যে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। তবু মাঝে মাঝে উদয়ের কথা মনে হয়। আমেরিকা চলে আসার পেছনে আমাদের কতজনের কত গল্প ছিল। সুখের এক অর্থ যদি প্রাচুর্য হয়, উচ্চাশার সংজ্ঞা যদি হয় আরও পড়াশোনা, বড় চাকরি—তবে সে সুখের মুখ অনেকেই হয়ত দেখেছে। আমার নিজের জীবনও কি সেই অর্থে সফল নয়? আমেরিকা আমাকে আশার অতিরিক্ত দিয়েছে। দেশে থাকলে একটা ভালো চাকরি নিশ্চয়ই করতাম। কিন্তু আজ পর্যন্ত আত্মীয়স্বজনকে যতখানি সাহায্য করতে পেরেছি, তা কখনোই পারতাম না। আমার উপার্জনের ডলার আমার বৃদ্ধ বাবাকে বেহালায় ছোট্ট বাগানঘেরা নতুন বাড়িতে বসে শীতের রোদ পোহানোর অধিকার দিয়েছে। মা পাড়াপড়শীদের নিয়ে ভি.সি.আর-এ আমার মেয়ের সুইট সিক্‌সটিন্ পার্টির ছবি দেখেন। যোধপুর পার্কে সুমনার নামে ফ্ল্যাট কিনেছি। ডলারের জোরেই দুই বোনের ভালো বিয়ে দিতে পেরেছি। কসবার সেই ভাড়াবাড়িটাকে ক্রমশ যেন গতজন্মের পটভূমি বলে মনে হয়। কেউ-ই পড়াশোনায় তেমন নয়, অথচ এদেশে বাড়ি কিনেছে, গাড়ি চড়ছে। এইসব সাধারণ মানুষের জন্যে 'ইমিগ্রেশন' এক নতুন জীবনের সূচনা করেছে। আমরা সেই সত্তর ভাগ বাঙালির ছেলে, যাদের প্রথম প্লেনে চড়ার অভিজ্ঞতা হয়েছিল দমদম থেকে নিউইয়র্কের পথে।

শুধু জানতে ইচ্ছে করে—উদয়, তুই কেন এদেশে এসেছিলি? তোর তো সে প্রাচুর্য হাতের মুঠোয় ছিল। উচ্চাকাঙ্খার কথা যদি বলিস, সেও কি তোর পূর্ণ হয়েছে?

জানি না কিসের আর্কষণে আজও পড়ে আছিস! কে জানে! হয়ত সুখের অনুভবও আপেক্ষিক। আমার বউ সুমনা তোর ভাগ্যলক্ষ্মীর মতো স্বামীর শিক্ষার এমন অপচয় কিছুতেই মেনে নিতে চাইত না। ইহুদীদের মতো আমাদেরও মধ্যবিত্ত রক্তে শিক্ষাই একমাত্র অহংকার, একমাত্র মূলধন। হয়ত সে জন্যে আমাদের অর্জিত সুখের সংজ্ঞাও আলাদা। তোর, আমার, সকলেরই বোধহয় নিজস্ব কিছু আনন্দ আছে, চরিতার্থতা আছে— একজনের আনন্দের স্বাদ, চরিতার্থতার স্বরূপ অন্যজনের বোধের বাইরে।

আমি এর ভিত্তিতেই জীবনের সাফল্যের পরিমাপ করেছি। সেখানে কিছু গড়ে নেওয়া, কিছু জমিয়ে তোলার মধ্যে মূল উদ্দেশ্য ছিল—জন্মসূত্রে না পাওয়া যত কিছু, তাকে নিজের উদ্যম আর কর্মক্ষমতা দিয়ে অর্জন করা। শিক্ষা ছিল আমার হাতিয়ার। উচ্চাকাঙ্ক্ষায় মিশেছিল সেই হাতিয়ারে শান দেওয়ার একাগ্রতা। এক পুরুষে বনেদীয়ানা অর্জন সম্ভব হয় না জেনেও আর নতুন করে মধ্যবিত্ত সম্পর্ক গড়ে তুলিনি। অবস্থাপন্ন পরিবারে বিয়ে করেছি। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই এভাবেই জীবনকে হিসেব করে নিয়ন্ত্রণ করতে করতে এগিয়ে চলেছি।"

দীপংকরের মনে পড়ল উদয় একদিন ক্লিনটন আর্মস হোটেলের ঘরে বসে বলেছিল — "অ্যাচিভ্‌মেন্ট কথাটার তোর কাছে যা মানে, বেশির ভাগ লোকের কাছেই হয়ত তাই। আমার শুধু মনে হয়, এত লড়ে কি হবে রে? বেঁচে থাকার জন্যে একটা বেসিক স্ট্যান্ডার্ড মেইন্‌টেন্‌ করা নিয়ে কথা..."

সেদিন দীপংকর উদয়কে বলতে পারেনি, বেঁচে থাকার বেসিক স্ট্যান্ডার্ড বজায় রাখতে গিয়েই তার বাবার নাভিশ্বাস উঠে যেত। উদয় সে লড়াই দ্যাখেনি। তাই অনায়াসে ভেবে নেয় অ্যাচিভমেন্ট্‌ মানে অকারণ পরিশ্রম। ও কিছুটা ঝোঁকের মাথায় এদেশে এসেছিল। যখন-যেমন তখন-তেমন ভাবে কাজকর্ম জুটিয়ে চালিয়ে গেল চিরকাল। বিয়ে করে বেসিক স্ট্যান্ডার্ডের জন্যেই বোধহয় ব্যবসার কথা ভেবেছিল। শরীরের পরিশ্রম ওকে বিশেষ ক্লান্ত করত না। শুধু মনটাকে ধরাবাঁধা নিয়মের মধ্যে বাঁধতে পারত না, খুব জটিল কোনো বিষয়ের মধ্যে যেতে চাইত না। হিউস্টনে শেষবার দেখা হতে দীপংকরকে বলেছিল—"আমি এখন এদিকের একমাত্র তবলচি, জানিস? প্রত্যেক ফাংশনে বাজাচ্ছি—গান গাইতেও ডাকে....।"

সেদিন ওর মুখে-চোখে প্রসন্নতার ছায়া পড়েছিল। আজ দীর্ঘদিন পরেও দীপংকর অনুভব করে, রূপকথার শর্তের মতো একটি সুখের ভাবনাকে সে সযত্নে বাঁচিয়ে রেখেছে। যেন তেল রং-এ আঁকা বহু পুরোনো ছবি—অনুজ্জ্বল তবু ঐতিহ্যময়। দীপংকরের দেখা একমাত্র রাজকুমার স্বেচ্ছা নির্বাসনেও রানী আর অরুণ, বরুণ, কিরণমালাকে নিয়ে সুখে আছে।

খোঁজ

ভোরের কুয়াশা জড়ানো আধো অন্ধকারে ড্রাইভওয়েতে গাড়ির আলো এসে পড়ল। অরূপ জানলার দিকে ফিরে বলল—"লিমোজিন এসে গেছে।"

এষা ঘড়ি দেখল। গাড়িটা আগেই এসেছে। অরূপ ক্লসেট থেকে জুতো বার করছে দেখে বলল—"এখনও পাঁচটা বাজেনি। এত আগে বেরবে?"

—"বেরিয়েই পড়ি। রাস্তা ফাঁকা পাব। ট্র্যাফিক থাকবে না।"

ড্রাইভার এসে দরজায় বেল্ বাজাতে অরূপ ছোট সুটকেসটা দিয়ে দিলে। দুদিনের জন্যে অফিসের কাজে ড্যালাস যাচ্ছে। লাগেজ বলতে ঐ সুটকেস আর অ্যাটাশে। অরূপ জ্যাকেট পরল। দরজায় দাঁড়িয়ে এষার পিঠে হাত রাখল—"চললাম তাহলে? সাবধানে থেকো। পৌঁছে ফোন করব।" অন্ধকারে মুখ বাড়িয়ে এষা বলল—"সাবধানে যেও। দুর্গা, দুর্গা।"

লিমোজিন রাস্তার মোড় ঘুরতেই এষা ওপরে চলে এল। ঘুম হোক, না হোক, খানিকক্ষণ শুয়ে থাকবে। আজ সারাদিন তেমন কাজ তো নেই। বিউটি স্যালনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। সেও বেশ দেরিতে। এত সকালে নীচে গিয়ে কী করবে? এষা কম্বল জড়িয়ে ঘুমনোর চেষ্টা করল।

সেই ঘুম ভাঙল ফোনের আওয়াজে। বেলা তখন প্রায় দশটা। হুড়মুড় করে ফোন ধরতেই পূর্ণার গলা।

—"সরি আন্টি। ঘুম ভাঙালাম?"

—"না, না, এমনিই হঠাৎ অসময়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ভোরবেলা একবার উঠেছিলাম তো, আবার একটু শুতে গিয়ে এই কাণ্ড।" পূর্ণা হাসছিল—"ভালোই তো। রেস্ট নিতে পারলে। আংকল কবে ফিরবেন?"

এষা ফোন কানে নিয়ে ড্রেসিং গাউন পরতে পরতে উত্তর দিল—"পরশু সন্ধের ফ্লাইটে। তুমি এখন কোথা থেকে কথা বলছ?"

—"বাড়ি থেকে। কাল এসেছি। ভিকিকে কলেজে পৌঁছতে যাব।"

—"ভিকি কি ডিউকেই যাচ্ছে?"

—"না। ইয়েল এ ওয়েট-লিস্টে ছিল। পেয়ে গেছে। কাল ওর সঙ্গে নিউ-হ্যাভেনে যাচ্ছি। আন্টি, মা তোমাকে এই খবরটাই দিতে বললেন। মার স্ট্রেপ্-থ্রোট হয়েছে। কথা বলতে পারছেন না।"

এষা তার ভাবী বেয়ানের জন্যে উৎকণ্ঠা দেখালো—"সে কী? কবে হল?"

—"পরশু থেকে জ্বর। অ্যান্টিবায়োটিক নিয়ে আজ জ্বর কমেছে। গলায় এখনও ব্যথা।
—"তাহলে কাল আর রেখা যেতে পারছে না? আমি কি গিয়ে কিছুক্ষণ ওর কাছে থাকব?"

পূর্ণা বলল—"মা ভিকির সঙ্গে যেতে চাইছেন। দেখি, কেমন থাকেন।"

এষা ফোন রাখার আগে বলল—"ঠিক আছে। আমি পরে খবর নেব। ভিকিকে কনগ্র্যাচুলেট করে দিও।"

এষা নীচে এল। কফির জল বসিয়ে ঘড়ি দেখল। বেশ দেরী হয়ে গেছে। বারোটায় "হেয়ার অ্যাণ্ড কেয়ার অ্যাপয়েন্টমেন্ট। তার আগে ব্যাংককে যেতে হবে। চান করে ব্রেকফাস্ট সারতে সারতেই বেরোনোর সময় হয়ে যাবে। ট্রেড-মিল একসারসাইজ আর করা হল না। ভাগ্যিস পূর্ণার ফোনটা এল। নয়তো কখন ঘুম ভাঙত কে জানে? এষা আজ এতক্ষণ ধরে ঘুমল কী করে আশ্চর্য।

আসলে এ সব হচ্ছে জমে থাকা ঘুম। উইক-এণ্ড বেশি বেশি রাত জাগার ফল। কাল রাত্তিরেও তো চার ঘণ্টার বেশি ঘুমোতে পারেনি। ভোর চারটেয় অ্যালার্ম দিলে সময়মতো শুতে যাওয়া উচিত। কিন্তু অরূপ সেই এগারোটা বাজাল। দীপক চোপড়ার বই নিয়ে এষার চোখের গোড়ায় আলো জ্বালিয়ে শুয়ে আছে তো শুয়েই আছে। অত জ্ঞানের কথা নিজের মনে পড়ছো, পড়ো। তা নয়, একবার এ পাতা থেকে একবার ও পাতা থেকে এষাকে পড়ে শোনানোর চেষ্টা। ঐ "এজলেস বাড়ি অ্যান্ড টাইমলেস মাইন্ড" শুনতে শুনতেই এষার ঘুমের বারোটা বেজে গেল। তারপর একবার বাথরুমে যাওয়া। একবার জল খাওয়া। একবার গরম লাগা। একবার শীত করা। বয়স হচ্ছে বোঝা যায়। এষা জানে অরূপের পরের টার্গেট "মহাভারত"। রাজশেখর বসুর বইটা দীপক চোপড়ার পাশেই বসে আছে। কত রাত ভোগাবে কে জানে? এই বই যে মানুষ দুবার কী করে পড়ে আশ্চর্য। এক গানও যে একশোবার কী করে শোনে...।

বিউটি স্যালনে পৌঁছতে একটু দেরি হয়ে গেল। কালো আলখাল্লা পরে কফি খেতে খেতে এষা ফ্যাশন ম্যাগাজিন দেখছিল। আজকাল সাহস করে নানা কায়দায় চুল ছাঁটছে। আগে এক একটা স্টাইল ধরলে সহজে ছাড়ত না। লং বব থেকে ঘাড় অবধি উঠল তো টানা দু' বছর এক ছাঁট। আবার যেই মাথার পেছন দিকে খামচা খামচা করে চুল ছাঁটিয়ে স্টাইল ধরল, তো তাই চালাল প্রায় বছর। সিঁথির দুপাশে পাতা কেটে ফেদার-কাট। এই লেয়ার ফেদারই শেষে সিংহের কেশরের মতো লাগছে দেখে অরূপের তাড়নায় মাথা মুড়িয়ে এল। অরূপ কদম ছাঁট পছন্দ করে। কিন্তু ঝোলা দুল পরা যায় না। এষা তো তখন শাবানা আজমীর দুঃসাহস দেখে অবাক। ও নিজে আবার চুল লম্বা করে ফেলেছিল। সিলকের ঝালরের মতো পিঠে ফেলে রেখেছিল ছ'মাস। আবার স্টাইল বদলে ব্ল্যান্ট কাট। বাঁকা সিঁথি। এক কান থেকে অন্য কান অবধি সরল রেখা। এখনও তাই। আজ একটু বদলাবে কি না ভাবছে।

"হেয়ার অ্যাণ্ড কেয়ারে" আজ বেশ ভিড়। এষা আগের দিন ফোন করেও লেসলিকে পেল না। ডনাও আজ ভীষণ ব্যস্ত। ক্রিস্টিনা নামে রোগাপটকা মেয়েটা এষাকে তার চেয়ারে ডেকে নিয়ে গেল। কেমন চুল কাটে কে জানে? ঢুলু ঢুলু চাউনি, ঝাঁকড়া চুলওলা মেয়েটাকে দেখলে মনে হয় চেনাশোনা কার সঙ্গে যেন মিল আছে।

চেয়ারের পেছনে দাঁড়িয়ে হাসি হাসি মুখে ক্রিস্টিনা জানতে চাইল—"আজ কি শুধু কালারিং আর হেয়ারকাট? একই কালার রাখবে তো?"

আয়নার ভেতর দিয়ে এষা উত্তর দিল—"হ্যাঁ। পরে ব্লো-ড্রাই করার সময় এই স্টাইলটা করে দিও।"

ম্যাগাজিন দেখে ক্রিস্টিনা ঘাড় কাৎ করে চলে গেল। এখন এষার কার্ড নম্বর বের করে রং গুলবে। নম্বর ভুল করলেই হয়েছে। এষাকে হয়তো ব্লন্ড করে দিল। তখন এক মাথা শনের নুড়ি নিয়ে বাড়ি ফিরতে হবে।

নাঃ এষা শুধু শুধু ভাবছে। মেয়েটা যেমনই চুল কাটুক, কী আর এধার ওধার হবে? একটু নতুনত্ব হলেই হল। নিজের চেহারাটা দিন দিন এত একঘেয়ে লাগছে এষার। আয়নায় বেশিক্ষণ টলারেট করা যায় না। বেশি ডায়েট করলে দুর্ভিক্ষের এফেক্ট। বেশি নেমন্তন্ন খেলে চাকা কুমড়ো। ভাল লাগে না। কিন্তু মুখটা তো আর বদলানো যাবে না। তার চেয়ে চুলের স্টাইল পাল্টে যদি একটু ভাল দেখায়।

ক্রিস্টিনা ফিরে আসতে এষা ওর হাতে মাথা জমা দিয়ে ঝিম মেরে বসে থাকল। চুলে কেউ হাত ছোঁয়ালেই আরাম হয়। এষার চুলের মুঠি ধরে যা প্রাণ চায় করুক। তুলি বুলিয়ে বুলিয়ে যতক্ষণ ইচ্ছে রং দিক। মাথা ডলে ডলে যতোবার খুশি শ্যাম্পু করুক, কন্ডিশনার লাগাক। এষা শুধু চোখ বুজে রিল্যাক্স করবে।

এষার চুলে হেয়ার ডাই লাগিয়ে টাইমার ঘড়ি সেট করে দিয়ে ক্রিস্টিনা পাশের চেয়ারে গেল। এক খুনখুনে বুড়ি সারা মাথায় রাংতার টুকরো জড়িয়ে ঝিমোচ্ছিল। টাইমার বেজে উঠতেই নড়ে চড়ে বসেছে। ক্রিস্টিনা তাকে শ্যাম্পু করাতে নিয়ে গেল।

এষা ম্যাগাজিনের পাতা উল্টে যাচ্ছে। কফি নিয়ে ডনা এল। এতক্ষণে এর কথা বলার ফুরসৎ হয়েছে। এষা ওর কাছে অনেক বছর ধরে চুল কাটছে। দুজনে দুজনের বাড়ির খবর নেয়। আজ ডনা জিজ্ঞেস করল—" তোমার ইণ্ডিয়া বেড়ানো কেমন হল?"

এষা হাসল—"ভাল। খুব ভাল। এবার অনেক জায়গায় গিয়েছিলাম।"

—"সবাই গিয়েছিলে?"

—"ছেলে যায়নি। তার ছুটি নেই।"

—"তোমার ছেলের মেডিকেল স্কুল শেষ হয়নি?"

—" সবে শেষ হয়েছে। এখন রেসিডেন্সীর প্রথম বছর। ইণ্ডিয়া যাবে কি? হসপিট্যাল থেকে উইকএন্ডে বাড়িতে আসারই সময় নেই তার।"

—"এই চলবে সারা জীবন"—ও পাশ থেকে মডেলের মতো এক সুন্দরী বলে উঠল—"আমার বাবা ডাক্তার। বর ডাক্তার। সময়-টময় এদের কোনদিনও হয় না। যতো সোশ্যাল কমিটমেন্ট আমাদের।" খুনখুনে বুড়িটা মাথায় তোয়ালে চাপিয়ে বসেছিল। এদের কথা শুনে গলা খাঁকারি দিয়ে সাড়া দিল—" সে আর জানি না? আমার বর ছিল গাইনোকলজিস্ট। আমার যখন পেইন উঠল, সে তখন হাসপাতালে কার যেন ডেলিভারি করাচ্ছে। সে যুগে ডাক্তারদের পেজারও ছিল না। সেলফোনও ছিল না। ভোরে একবার বেরিয়ে গেল তো ব্যস!"...খক্‌খক্ কাশির দমকে বুড়ির নালিশ বন্ধ হয়ে গেল।

এষা জানে এর কোনওটাই অনুযোগ নয়। কথার কথা। আমেরিকার বড়লোক ডাক্তারদের সুখী সুখী গিন্নিদের রুটিন সংলাপ একদিন পূর্ণাও হয়তো বলবে। কিন্তু এখন অনির যা খাটুনি

চলেছে, একটানা ছত্রিশ ঘন্টা জেগে থাকে কী করে ছেলেটা? নাঃ, আজকেই ফোন করে দেখবে রোজ মালটি-ভিটামিন খাচ্ছে কি না। আবার ফোন করলেও তো অর্ধেক কথার জবাব দেবে না। এষা যদি বলে সামনের বছর বিয়ে করবি কি না ঠিক করেছিস? অনি তখনই হুঁ, হ্যাঁ করে ফোন রেখে দেবে। এনগেজমেন্ট-রিং কেনার পয়সা জমেনি তো মাকে বল। চার হাজার ডলারের ধাক্কা বলে চুপচাপ বসে থাকবি?

এই সব ভাবতে ভাবতে এষা ভেজা মাথায় চুল কাটার উঁচু চেয়ারে চড়ে বসলো। ক্রিস্টিনা যতোক্ষণ কাঁচি চালাল, এষা কথা বলল না। শুভ দৃষ্টির আগের মুহূর্তের মতো ঘাড় নামিয়ে বসে থাকল। ছোটবেলার ট্রেনিং। মহাদেব নাপিত শিখিয়েছিল। খবরের কাগজের জামা পরিয়ে খচাখচ কাঁচি চালিয়ে ববছাঁট দিত। কপালে কাঠি কাঠি চুল ফেলে চাইনিজ কাট। মহাদেব "রোমান হলি-ডে"র নাম শোনেনি। তবু এমন ছাঁট দিল, এষাকে দেখে ছোট পিসি বলেছিল অড্রে হেপবার্ন। হামের পর যে ন্যাড়া হয়েছিল, সেও মহাদেব নাপিতের হাতে। মুখটা এখনও মনে আছে। এষার বিয়ের অ্যালবামেও দাঁত উঁচু মহাদেব উঁকি মারছে।

বিয়েতে নাপিতের রোলটা যে কী; কে জানে? নজর লাগাটাগা নিয়ে কী সব ছড়াটড়া বলত মহাদেব। এই নজরের ব্যাপারটা কিন্তু এষা ইটালিয়ানদের মধ্যেও দেখেছে। মস্ত সাদা ওড়না দিয়ে যে বিয়ের সময় ব্রাইডে মুখ ঢেকে রাখে, সে তো কুনজর লাগার ভয়ে। পয়া, অপয়া, সুনজর, কুনজর এরাও খুব বিশ্বাস করে।

ক্রিষ্টিনা চুল কেটে সেট করার পর এষার একদম পছন্দ হল না। মাথার ওপরটা ফোয়ারার মতো কী যে করে দিল। একেবারে ছোটবেলাকার ফোয়ারা ঝুঁটি। এষার নিজের ওপরেই রাগ হচ্ছে। বেশি সাহসী হতে গিয়ে কিম্ভুত এক ছাঁট দিয়ে বসল।

ক্রিস্টিনা বড় আয়না এনে চুলের পেছন দিকটা দেখাল। এষার সাড়াশব্দ নেই দেখে জিজ্ঞেস করল—"ঠিক হয়েছে তো?" এষা মাথা নাড়ল—"ঠিকই আছে। একটু চেঞ্জ হল! সারা বছর এক স্টাইল ভাল লাগে না।"

ক্রিস্টিনা ভরসা দিল—"ইউ লুক গ্রেট"!

বিল দিয়ে এষার হাত থেকে চেক নিয়ে এক ঝলক দেখেই ক্রিস্টিনা জিজ্ঞেস করল—"তুমি বেঙ্গলি?"

এষা হাসল—"কী করে বুঝলে?"

ঢুলু ঢুলু চোখে মেয়েটাও হাসল—"পদবী দেখে। বাসু তো বেঙ্গলিদের লাস্ট-নেমে হয়।"

—"তুমি আর কোন বাসুকে চেনো?"

—"আমি নিজেই বাসু। ক্রিস্টিনা বাসু।"

এষা কোট পরতে পরতে বলল — "তাই? বিয়ে করে বাসু হয়েছো?" ক্রিস্টিনা মাথা নাড়ল—"বিয়ে করিনি। আমার নিজেরই লাস্ট-নেম বাসু।"

ক্রিস্টিনা আর কথা বাড়াল না। ওর পরের কাস্টমার কালো গাউন চড়িয়ে চেয়ারে বসে গেছে। এষাও আর দেরি করল না। ফোয়ারা-ঝুঁটি হোক, যাই-ই হোক, এত দামি চুল ভিজে যাওয়ার আগে বাড়ি পৌঁছতে হবে। বাইরে বৃষ্টি শুরু হয়েছে।

দু'দিন বাদে অরূপ ফিরল। এষা যখন রাতের খাওয়ার পর ডিশ-ওয়াশের বাসন ঢোকাচ্ছে, ড্রাইভ ওয়েতে গাড়ির দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ শুনল। ভুরু কুঁচকে অরূপকে বলল—"গাড়ির আওয়াজ মনে হল না?"

অরূপ টিভি দেখছিল। এষার কথা শুনেছে কি না বোঝা গেল না। বাইরে জুতোর আওয়াজ। তারপরেই ডোর-বেল। কাচের ভেতর দিয়ে এষা দেখল অনি দাঁড়িয়ে আছে।

দরজা খুলে এষা বলল—"কী রে? আসবি বলিসনি তো? আমরা খেয়ে নিলাম। জানলে ওয়েট করতাম।"

অনির মুখে মৃদু মৃদু হাসি। জুতো খুলতে খুলতে মার দিকে তাকিয়ে বলল—"খেয়ে এসেছি। ড্যাড কোথায়? আজ ফিরেছে না?"

অনির গলা শুনে অরূপ উঠে এল। আজকাল ছেলের সঙ্গে মাসে দু-তিন বারের বেশি দেখা হয় না। অনি নিউ ইয়র্কে মাউন্ট সাইনাই হসপিট্যালের কাছেই অ্যাপার্টমেন্ট নিয়েছে। যে উইক-এন্ডে বাড়িতে আসে, অরূপ সেদিন আর কোনও পার্টিতে যেতে চায় না। ছেলের সঙ্গে বসে বসে টিভিতে বেসবল গেম দেখে। নতুন নতুন অসুখ বিসুখ, তার ওষুধ আর চিকিৎসার খবর নেয়। এক সময় অনি হুঁ, হাঁ করে জবাব দিচ্ছে দেখে অরূপ বলে—"গো, গেট সাম স্লিপ।" তারপর নিজেও সোফায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে। টিভি চলতে থাকে। কার্পেটের ওপর কুশন মাথায় দিয়ে অনি ঘুমোয়। সোফায় অরূপের মৃদু নাক ডাকে। এষা ঘরে এসে দু'জনের গায়ে দুটো কম্বল চাপিয়ে দেয়। এই হচ্ছে অরূপের কাছে ছুটি কাটানোর সবচেয়ে ভাল উপায়।

কিন্তু আজ হঠাৎ বুধবার রাতে অনি চলে এসেছে দেখে অরূপ অবাক হল—"আজ মিডউইক-এ চলে এলি? কাল অফ নিয়েছিস?"

অনি মাথা নাড়ল—"সকালে অফ নিয়েছি। আফটার-নুন-এ যাব। তুমি আজ ফিরলে কখন?"

—"আটটা নাগাদ। হিউস্টনে ঝড়বৃষ্টি শুনে ভাবলাম ফ্লাইট ডিলে করবে। কিন্তু দেরি হয়নি।"

ওরা ডাইনিং রুমে বসল দেখে এষা জিজ্ঞেস করল—"কফি করব? নাকি আইসক্রিম দেবো?"

কেউ কিছু খেতে চাইল না। ওদের কথাবার্তার মাঝে এষা একটা অমৃতি নিয়ে এসে অনিকে বলল—"সনাতন টেম্পেলের প্রসাদ। খেয়ে নে।"

অনি মিষ্টি ভালবাসে না। একটু গুঁড়ো মতো ভেঙে নিয়ে বলল—"আবার তোমরা মিষ্টি খাওয়া শুরু করেছো? দিস ইস নট রাইট। ড্যাড, তুমি এসব খাচ্ছো?"

অরূপ ভাবছিল ভাঙা অমৃতিটা এষা ওকে দেবে। দেশ থেকে ফিরে কদিন খুব মিষ্টির লোভ হয়। কলকাতা থেকে আনা বলরামের সন্দেশগুলো শেষ। শোনপাপড়ি কটা মনে হয় এষা একাই উড়িয়েছে। মাঝে আবার কবে অমৃতি কিনে নিয়ে সনাতন টেম্পলে গিয়েছিল। আজ নিশ্চয়ই অরূপকে একটা দিত। কিন্তু এখন অনির সামনে আর দেবে না। ভাঙা অমৃতি নিয়ে এষা কিচেনে চলে গেল।

অরূপ অনিকে বোঝাল—"না, না, মিষ্টি ফিষ্টি অত খাই না। ইনফ্যান্ট পার্টিতে গিয়েও ডেসার্ট বাদ দিই।"

—"খেও না, কি দরকার?"

এষার গলা শোনা গেল—"অনি, এক গ্লাস দুধ খাবি?"

—"দিতে পার।"

এষা দুধ এনে রাখার পর অনি জিজ্ঞেস করল—"মা, কাল সকালে কি কোথাও বেরোবে?"

—"না। কাল তো ক্লিনিং লেডি আসবে। বাড়িতেই থাকবো।"

—"কখন আসবে?"

—"ভেরোনিকা বারোটার আগে আসে না। তুই দেরি করেই উঠিস। নয়তো, তোর ঘরটা বাদ দিতে বলব। অন্যদিন ক্লিন করবে।"

অনি কিছু ভাবছিল। অরূপ এষাকে বলল—"কাল ভেরোনিকাকে আসতে বারণ করে দাও না। সকালে ফোন করে দিও।"

অনি মার দিকে তাকাল—"দ্যাট সাউন্ডস বেটার। কাল আমার সঙ্গে তোমাকে একটু বেরোতে হবে। অ্যান্ড দ্যাট উইল টেক টাইম।"

এষা জিজ্ঞেস করল—"কোথায় নিয়ে যাবি? লাঞ্চ খেতে?" অনি বলল — "ঠিক আছে।"

—"কিন্তু বেরোতে চাইছিস কেন? শপিং করতে হবে?"

অনি হাসল—"পূর্ণার জন্য এনগেজমেন্ট-রিং কিনব।"

এষা এতক্ষণে অনির বাড়িতে আসার কারণটা বুঝতে পারল। কাল পূর্ণার জন্য এনগেজমেন্ট-রিং কিনবে। তার মানে, বছর খানেকের মধ্যেই বিয়ে করার ইচ্ছে।

এষার গলায় খুশির আভাস—"তাহলে হীরের আংটির জন্যে সেভিংস হয়েছে? নাকি আমাকে লাঞ্চ খাইয়েই তারপর আংটি কিনে দিতে বলবি?"

অনি কাঁধ ঝাঁকিয়ে হেসে উঠল—"আই ডোন্ট মাইন্ড। তুমি চাইলে কিনে দিতে পারো।"

অরূপ খুব খুশি। এষাকে জিজ্ঞেস করল—"অনিকে কোন দোকানে নিয়ে যাবে? স্টাইন জুয়েলার্সে?"

—"সেটাই ভাবছি। ডায়মন্ডের ক্ল্যারিটি, কোয়ালিটি, অত কিছু বুঝিও না। শার্লিনের বোন ওখানে জেমোলজিস্ট। আগে স্টাইন জুয়েলার্সেই নিয়ে দেখি।"

অনি বলল—"মা, দামের ব্যাপারে একটা আইডিয়া দাও তো।"

—"তুই কতোর মধ্যে কিনতে চাইছিস?"

—"অ্যারাউন্ড ফাইভ থাউসেন্ড। এর বেশি স্পেন্ড করতে চাই না।"

অরূপ হঠাৎ অনির পিঠে চাপড় মেরে বলল—"পাঁচ হাজার ডলারে না হলে আর এক হাজার দিবি। এই বয়স থেকে এত হিসেব করিস না।"

শুনে এষা আর অনি দু'জনেই হেসে অস্থির। এই অরূপ চিরকাল এষাকে বেহিসেবী খরচ করো বলে লেকচার দিয়েছে। এষা গয়না কিনলে ব্যাড ইনভেস্টমেন্ট বলেছে। অনির জুতো আর জামাকাপড়ের দাম শুনে চোখ কপালে তুলেছে। নিজের তো কোনও শখই নেই। সারাক্ষণ শুধু ইনভেস্টমেন্টের কথা। এখন নিজেই আবার অনিকে বলছে এত হিসেব করিস কেন?

ওদের হাসাহাসির মাঝখানে অরূপ হাত নেড়ে বলে গেল—"যা পছন্দ হয় কিনে নিও। দামের জন্য ভাবতে হবে না।"

মে মাসের শেষে মেমোরিয়াল-ডে উইক-এন্ডে দিনের ছুটি ছিল। রবিবারে এষারা এনগেজমেন্ট পার্টি দিল। পূর্ণাদের ফ্যামিলিটা। তবে ধারে কাছে ওদের আত্মীয়স্বজন কিছু

আছে। অরূপ আর এষার বন্ধু-বান্ধব মিলিয়ে শ-দেড়েক লোক হয়ে গেল। তার ওপর অনি আর তার বন্ধুর দল। অরূপের ইচ্ছে ছিল বাগানে ক্যানপী টাঙিয়ে পার্টি দেবে। বৃষ্টির ভয়ে এষা রাজি হল না। এনগেজমেন্ট পার্টি মানে ড্যান্স চাই। ডিসক জকি চাই। কেটারারদের জন্য একদিকে ছেড়ে দিতে হবে। দেড়শো-দুশো লোক বাড়িতে ঢুকে বাথরুমে যাবে। ডেকরেটাররা বাগানের এক কোণে পোর্টেবল টয়লেট এনে বসিয়ে দেয়। কিন্তু আলমারির মতো ওই খুপরির মধ্যে মেয়েরা ঢুকতে চায় না। এক গাদা খরচ করে এত ব্যবস্থার পরেও যদি তুমুল বৃষ্টি নামে তো হয়ে গেল। এষা তাই অরূপের প্যান্ডেল খাটানোর কথায় কান দিল না। মরিস টাউনের মুঘল রেস্তোরাঁয় গিয়ে কথাবার্তা বলে এল। সিন্ধি মালিক সতীশ মেহতানি খুব করিৎকর্মা লোক। ইন্ডিয়ানদের বড় বড় পার্টির ব্যাপারে একেবারে ভেটারেন। ওর হাতেই অনির এনগেজমেন্ট পার্টির ভার দিয়ে এষা নিশ্চিন্ত হল।

হীরের আংটি পূর্ণার খুব পছন্দ হয়েছে। পার্টির দিন ছোট্ট করে আর্শীবাদ হয়ে গেল। দেড়শো লোক আর্শীবাদ করতে করতে ধান দূর্বো শেষ। শেষে ফুলের পাপড়ি-টাপড়ি ছিঁড়ে কাজ চালানো হল। অরূপ মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে অভিভূত হয়ে পড়ল। পূর্ণার বাবা ডাঃ অরুণ শর্মাকে বলল—"আজ হতে আমরা আত্মীয়...... এতদিন আমাদের একটি ছেলে ছিল। আজ হতে একটি মেয়ে পেলাম......"। অরুণ শর্মাও গদগদ হয়ে সুর মেলাল।

ডিনারের সময় অনি মজা করে বলল, "ড্যাড, তুমি তো আজই প্রায় ওয়েডিং স্পিচ দিয়ে দিলে। শর্মাদের অলরেডি আত্মীয় বানিয়ে দিলে। তাহলে বিয়ের রিসেপশনে কী বলবে?"

অরূপের মুখ ভর্তি খাবার। উত্তর দেওয়ার আগেই এষা গলা বাড়িয়ে ছেলেকে বলল—"দু গেলাস ওয়াইন খেয়েই এতো কথা। তোর বিয়ের দিন কী হবে ভেবে দেখ!"

অরূপ চিংড়ির রোল খেতে খেতে বলল— "সেদিন তো একটা কবিতা বলব। টেগোরের সুমঙ্গলী বধূ। দ্যাটস ইট। পূর্ণা, কবিতাটা তোমার জন্যেই পড়ব। উইথ ইংলিশ ট্রানস্লেশন।"

ওরা ইংরিজিতে কথাবার্তা বলছিল। অরুণ শর্মা আর তার বউ রেখা টেবিল থেকে উঠে কাদের সঙ্গে কথা বলতে গেছে। অনি আর এষা অরূপের স্পিচ নিয়ে রসিকতা করছে দেখে পূর্ণা বলল—"আংকলের স্পিচ আমার খুব ভাল লেগেছে। নিজের ফিলিং এক্সপ্রেস করেছেন। আমার বাবাও তাই।"

অরূপ খুশি হল—"অ্যাণ্ড উই মিন ইট। আমাদের কালচারে বিয়ে মানে তো শুধু দুজনের মধ্যে রিলেশনশিপ নয়। দুটো ফ্যামিলির মধ্যে সম্পর্ক তৈরি হল। সে কথাই বলছি।"

এনগেজমেন্টের মাস খানেক পরে অনিদের বিয়ের দিন ঠিক হয়ে গেল। নভেম্বরের থ্যাংকসগিভিং হলিডেতে বিয়ে হবে। অনির সময় নেই। পূর্ণাই তার বাবা মার সঙ্গে বিয়ের হল দেখতে যাচ্ছে। অরুণ শর্মা শেষ অবধি ম্যারিয়ট হোটেলে হল বুক করল। অরূপ বার বার বলছে জয়েন্ট রিসেপসন হোক। অরুণ শর্মা রাজি হচ্ছে না। বরাত পার্টিকে মেয়ের বিয়েতে খাইয়ে পয়সা নিতে পারবে না। অথচ আজকাল অনেকেই জয়েন্ট রিসেপশন দিচ্ছে। দেশেও হচ্ছে। অরূপের ধারণা এটা প্রগতির লক্ষণ। মেয়ের বাবার ঘাড়ে বিয়ের গুরুভার চাপিয়ে দেওয়া আর কতকাল চলবে?

কিন্তু আমেরিকায় বসে অরূপ সেই সদবিবেচনা দেখাতে পারছে না। অরুণ শর্মা চান্স দিচ্ছে না। অরূপ খরচের কথা তুলতেই রামভক্ত হনুমানের মতো জোড়হাত করে এক কথা—"আমার মা বারণ করেছেন, মার কথা অমান্য করি কী করে?"

এষা মনে মনে ভাবে যাক গে। তুমি ডাক্তার। টাকার তো শেষ নেই। বুড়ি মার হুকুমে ছশো লোক খাইয়ে দাও। আরও যা প্রাণ চায় করো। মেয়ের বিয়েতে কোয়ার্টার মিলিয়ন ডলার খরচ করা তোমাদের কাছে আর কী?

দেখতে দেখতে সময় চলে যাচ্ছে। এষা দেখল হাতে মোটে কয়েকটা মাস। নিজেদের দিকের তোড়জোড় শুরু করতে হবে। এতদিন বন্ধুদের ছেলেমেয়ের বিয়ে দেখেছে। যেটুকু পেরেছে কাজে কর্মে সাহায্য করেছে। কিন্তু এবার নিজেদের কাজ। দেশথেকে আত্মীয়স্বজন আসবে। অরূপ অনেককেই ফোন করেছে। এষা জানে, অরূপ যে এত আনন্দ করে লোকজন জড়ো করতে চাইছে, তার প্রধান কারণ অনি ইণ্ডিয়ান মেয়েকে বিয়ে করেছে। অথচ ছাত্র জীবন থেকে অরূপ আমেরিকায়। জীবনের অর্ধেকের বেশি সময় আমেরিকানদের সঙ্গে কেটে গেল। তবু, নিজের এই ছোট্ট পরিবারের গণ্ডির মধ্যে তাদের আপনজন বলে সহজভাবে গ্রহণ করা, অরূপ কোনওদিন সেই ঔদার্য অনুভব করেনি। এই গোঁড়ামির কথা আগে বাইরেও বলত। এখন বলে না। চেনাশোনা ছেলেমেয়েরা আমেরিকান বিয়ে করেছে। ওই সব ইনসেনটিভ কথা বলার কোনও মানে হয় না। অনিও তো আমেরিকান বিয়ে করতে পারত। ঠিক আছে। সে না হয় তোমার ইচ্ছের দাম দিয়েছে। কিন্তু কতদিন ধরে রাখতে পারবে? বড়জোর এক জেনারেশন। অরূপ একদিন এষার কথা শুনে বলেছিল—" তোমরা মেয়েরাই দেখছি বেশি লিবারেল্।"

এষা বুঝতে পারেনি—"তার মানে?"

—"তোমাদের উদারতা বেশি।"

—"হয়তো ঠিক তা নয়। অ্যাকসেপটেন্স : ছেলেমেয়ের ওপরে মায়াও যে বেশি।"

ইদানিং অনির বিয়ের জন্য অরূপের উৎসাহ আর ব্যস্ততা দেখে এষার মনে হচ্ছে অনি তাকেও কত স্বস্তি দিয়েছে। বিয়ের মতো আনন্দের ব্যাপার নিয়ে তিনজন কাছের মানুষের মধ্যে জাত, ধর্মের তর্ক, অশান্তি আর মান-অভিমানের জের, সেই টানাপোড়েন তাকে সহ্য করতে হয়নি।

বিয়ের বাজার করতে এষা দেশে যাবে ঠিক করল। অরূপের পক্ষে এক বছরে তিনবার ছুটি নেওয়া অসম্ভব। ক' মাস আগে দেশ থেকে ফিরেছে। আবার নভেম্বরে অনির বিয়ের জন্য ছুটি নিতে হবে। তার ওপর এই গরমে দেশে যাওয়া মানেই অসুখে পড়া। অরূপ এষাকেও যেতে দিতে চাইছিল না। এষা শুনল না। মাসখানেকের জন্যে চলে গেল।

এবার কলকাতায় পৌঁছে আত্মীয়স্বজনের বাড়ি দেখা করার আগে শাড়ি, গয়নার দোকানেই বেশি সময় গেল। এষার বাবা মা থাকেন সল্ট লেকে। অরূপদের বাড়ি টালিগঞ্জে। এষা একবার যাচ্ছে পার্কস্ট্রিটে। একবার যাচ্ছে গড়িয়াহাটে। বিয়ের খুচখাচ বাজারও কম নয়। বাঙালিদের বিয়েতে যা যা লাগে, মোটামুটি নিয়ে যাচ্ছে। তারপর মারাঠি পুরোহিত যা করে করবে। অরুণ শর্মাই পুরোহিত ঠিক করেছে।

গরমে এষার ঘোরাঘুরি করতে বেশ কষ্ট হচ্ছে। তাও একদিন অরূপের জ্যাঠামশাই-এর সঙ্গে দেখা করতে গেল। বাবা নেই। জ্যাঠামশাই আছেন। অরূপ বারবার বলে দিয়েছে জ্যাঠামশাইকে বিয়ের খবর দিতে যেও। খুশি হবেন। অরূপের ইচ্ছে বিয়ে মিটলে অনিদের নিয়ে একবার কলকাতায় যাবে। তখন জ্যাঠামশাই-এর নামে চিঠি ছাপিয়ে একটা রিসেপশন দেওয়ার কথাও ভাবছে। আগে এষা গিয়ে ওঁকে খবরটা দিক।

প্রতাপাদিত্য রোডের বাড়িতে গিয়ে এষা দেখল ব্রততীদি তখনও কলেজ থেকে ফেরেননি। জ্যাঠামশাই মেয়ের কাছে থাকেন। জেঠিমা অনেকদিন মারা গেছেন। এষা ওঁকে দেখেনি। ব্রততীদির নিজের ভাইবোন নেই। অরূপরা ওঁকে বড়দি বলে। ওঁর স্বামীও ক'বছর হল মারা গেছেন।

এষা জ্যাঠামশাইকে প্রণাম করতে মাথায় হাত রাখলেন। ক'মাস আগে দেখা হয়েছে। সেবারও লক্ষ করেছিল উনি যেন কেমন চুপচাপ হয়ে গেছেন। বুড়ো মানুষ, সারাদিন প্রায় একাই থাকেন। চেহারাও যেন খারাপ লাগছে।

এষা জিজ্ঞেস করল—"কেমন আছেন জ্যাঠামশাই? শরীর ঠিক আছে?"

ভাঙা ভাঙা গলায় জ্যাঠামশাই উত্তর দিলেন—"আছি সেই রকমই। মাঝে মাঝে প্রেসারটা বেড়ে যায়। এ বয়সে যেমন হয় ...। এবার রূপু আসেনি শুনলাম?"

—"না। আমি একাই এসেছি। জ্যাঠামশাই অনির বিয়ে ঠিক হয়েছে।"

বৃদ্ধ একটু নড়েচড়ে বসলেন—"অনির্বাণের বিয়ে? কোথায় ঠিক করলে? কলকাতায়?"

—"না আমেরিকার মেয়ে। অনি নিজেই ঠিক করেছে।"

জ্যাঠামশাই ভুরু কুঁচকে চেয়ে আছেন—"অনির্বাণ আমেরিকান বিয়ে করছে?"

এষা ওঁকে আশ্বস্ত করতে চাইল—"না, না, ইন্ডিয়ান মেয়ে। ওখানে জন্মেছে। আমাদেরই মতো, ইমিগ্র্যান্ট।"

—"কী জাত বউমা?"

এষা বলল—"বাঙালি না। কাশ্মিরী। পদবী শর্মা। নাম পূর্ণা।"

জ্যাঠামশাই হাসলেন—"বাঃ বেশ নাম। পূর্ণা। তোমাদের জেঠিমার নাম ছিল অন্নপূর্ণা।"

—"এ মেয়ের নাম সম্পূর্ণা। নিজে ছোট করে নিয়েছে।" জ্যাঠামশাই মাথা নাড়লেন—"ভাল। নামটি সুন্দর। তা অনির্বাণ তো ডাক্তার হয়েছে। ওর বউও ডাক্তার?"

—"না। বউ ল-ইয়ার। সবে পাশ করেছে।"

—"ও বাবা, তবে তো ডাক্তারে উকিলে মিলে ভাল পশার জমাবে। তোমাদের সুবিধে হল। কাউকে ফি দিতে হবে না।"

এষার ভাল লাগছিল। নাতির বিয়ের খবরে ওঁর কথাবার্তার সুর পাল্টে গেছে। জ্যাঠামশাই অনির মুখে ভাত দিয়েছিলেন। কিন্তু বিয়ে আর দেখা হবে না। এষার বাবাও যেতে পারবেন না। এঁদের জন্যেই অনির বিয়ের পর একবার আসতে হবে।

ব্রততীদি ফিরলেন। এষার আর বেশিক্ষণ বসার সময় নেই। ব্রততীদি বললেন—"রাস্তায় এত ভিড়। জানি তুমি আজ আসবে। তাও দেরি হয়ে গেল।"

—"বুঝতেই পারছিলাম। কলকাতার রাস্তাঘাটের যা অবস্থা। আপনারা যে কী করে রোজ কমিউট করেন।"

—"উপায় কী বলো? মাঝে মাঝে ঘুমের মধ্যেও দেখি ট্রাফিক জ্যামে বসে আছি। বাস নড়ছে না।"

জ্যাঠামশাই ব্রততীদিকে বললেন—"বউমাকে চা-টা কিছু দেওয়া হয়নি। তোর জন্যে বসেছিল। আমাকেও চা দিতে বল।"

চা খেতে খেতে অনির বিয়ের কথা হল। ব্রততীদি ঘুম ঘুম চোখ তুলে যেন অবাক—"অনির বিয়ে? এই সেদিন পর্যন্ত দেশে এসে সারা ছাত দৌড়ে বেড়াত। মনে আছে? উড়ে

শম্ভুর সঙ্গে ইংরাজিকে ফটর ফটর করতে করতে চিড়িয়াখানায় চলে গেল।"

জ্যাঠামশাই কিন্তু আর ওদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন না। নিজের মনে কিছু চিন্তা করছেন। একবার ব্রততীদিকে কী বলতে গেলেন। ব্রততীদি খেয়াল করলেন না। জ্যাঠামশাই বারান্দা থেকে উঠে গেলেন। একটু পরে ফিরে এসে দাঁড়িয়ে রইলেন। এষা ওঁর মধ্যে একটা চাপা অস্থিরতা লক্ষ করছিল। ব্রততীদির কথার মাঝখানে জ্যাঠামশাই হঠাৎ অধৈর্য হয়ে উঠলেন—"আটটা বেজে গেল। বউমা আর বেশিক্ষণ বসবে না।"

বাবার মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থেকে ব্রততীদি বললেন—"জানি। একটু সময় দাও। একটা ভাল খবর দিতে এসেছে। শুনতে দাও।"

জ্যাঠামশাই-এর অপ্রতিভ মুখখানা দেখে এষার মায়া হল। বুড়ো মানুষদের যা হয়। এক কথা দশবার। হয়তো সামান্য একটা ব্যাপার নিয়ে চিন্তা করছেন। তুচ্ছ কথা বলে ব্রততীদি কানে নিচ্ছেন না। তবু ওঁর কতো ধৈর্য। এত বছর ধরে জ্যাঠামশাই-এর দেখাশোনা করছেন। মা নেই। ভাইবোন নেই। স্বামী নেই। একটা মাত্র মেয়ে। সেও অস্ট্রেলিয়ায়। বাবাকে ছেড়ে ব্রততীদি কোথাও যেতে পারেন না। চাকরি আর বাবার দেখাশোনা, এই-ই ওঁর জীবন।

জ্যাঠামশাই নিজের ঘরে চলে গেছেন। ব্রততীদি আর এষা বারান্দায় বসে আছে। সন্ধে থেকে হাওয়া উঠেছে। হাওয়ায় জুঁই ফুলের গন্ধ। ব্রততীদির ছাদের বাগান থেকে ভেসে আসছে। এষার আজ সময় মতো ওঠা হল না। ব্রততীদি বলেছেন ওঁর কিছু কথা বলার আছে, যা শুধু এষাই জানবে। আর ফিরে গিয়ে অরূপকে বলবে। কলকাতায় কারুকে জানাতে চান না ওঁরা।

এষা প্রথমে ভেবেছিল হয়তো কোনও বৈষয়িক ব্যাপার। অরূপদের বর্ধমানে কিছু জমি-টমি আছে। জ্যাঠামশাইয়ের-এরও অংশ আছে। সেই নিয়েই হয়তো ঝামেলা হচ্ছে। এষার শাশুড়ি আর ভাসুরদের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে যদি কোনও অশান্তি হয়েও থাকে, ওরা সে সব জানে না। কে জানে? দূরে থেকে কতটুকুই বা খবর রাখে? তবে সেরকম হলে শাশুড়ি কি আর বলতেন না? এষা ঠিক বুঝতে পারছিল না।

ব্রততীদি বললেন—"কোথা থেকে যে শুরু করি। অনেক পুরনো ঘটনা। এতদিন নিজেদের মধ্যে রেখেছিলাম। এখন বাবা আর পারছেন না। অরূপকে জানাতে চাইছেন। জানি না তোমরা কী করতে পারবে?"

এষা ভাবল নির্ঘাৎ বিষয় সম্পত্তি নিয়ে লেগেছে। ওই বর্ধমানের জমিজমার ব্যাপার। জ্যাঠামশাই জানেন অরূপ দেশের প্রোপার্টি নিয়ে মাথা ঘামায় না। ওঁকে ভালবাসে। ভক্তি করে। তাই অরূপের সাহায্য চাইছেন। কিন্তু এই প্যাঁচ-পলিটিক্সে কে থাকবে? এষা গম্ভীর হয়ে গেল।

ব্রততীদি জিজ্ঞেস করলেন—"তোমাদের ওদিকে এলিজাবেথ টাউন আছে, চেনো?"

কোথায় বর্ধমান আর কোথায় এলিজাবেথ? মনটাকে ঘুরিয়ে আনতে ওর একটু সময় লাগল—"এলিজাবেথ? হ্যাঁ, গেছি দু-একবার। আমাদের দিকে নয়। সাউথে। কেন? কেউ আছে ওখানে?"

—"বাবা ছিলেন। প্রায় ষাট বছর আগে। পোর্টে চাকরি করতেন।" এষা অবাক—"জ্যাঠামশাই আমেরিকায় ছিলেন? কই বলেননি তো কখনও। আমার ধারণা উনি ইংল্যান্ডে গিয়েছিলেন।"

ব্রততী বললেন—"কেন যে বলেননি তাই ভাবি। আসলে সে যুগের ব্যাপার জানো তো। ডিভোর্সের কথা লোকে পাঁচ কান করত না।"

এষা ঠিক বুঝতে পারছে না—"ডিভোর্স মানে? জ্যাঠামশাই কি আগে বিয়ে করেছিলেন?

ব্রততীদি যেন সহজ হওয়ার চেষ্টা করলেন—"হ্যাঁ। বিয়ের কথা ঠাকুমারা জানতেন। কিন্তু তার বাইরে কেউ জানত বলে মনে হয় না। বিলেত, আমেরিকায় একবার বিয়ে করে, সে বিয়ে ভেঙে গেছে, এরকম হত। লোকে জানতে চাইত না।"

এষা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে, তারপর জিজ্ঞেস করল—"আর আপনার মা? তিনিও কখনও জানতে পারেননি?"

—"বাবা নাকি মাকে বলেছিলেন। আমি কিন্তু কখনও মার কাছে শুনিনি। আমাকে বাবাই বলেছেন। সেও মা মারা যাওয়ার অনেক পরে।"

—"ব্রততীদি, একটা এপিসোড কবে শেষ হয়ে গেছে। এত বছর পরে কেন সে কথা জানাতে চাইছেন?"

—"কারণ, বাবা তাঁর ছেলের খবর চান।"

এষা স্তম্ভিত। জ্যাঠামশাইয়ের ছেলে আছে? অথচ কেউ তার কথা জানে না। অরূপ কি শুনলেও বিশ্বাস করবে? জ্যাঠামশাই-এর এরকম সিক্রেট পাস্ট আছে ভাবা যায়?

—"ব্যাপারটা একটু খুলে বলবেন? উনি যাঁকে আগে বিয়ে করেছিলেন তিনি এখনও বেঁচে আছেন?"

ব্রততীদি মাথা নাড়লেন—"জানি না। বাবা তার কথা কোনওদিনই খুলে বলেননি। বাবা মার্চেন্ট নেভিতে ছিলেন। অল্পদিনের জন্যে আমেরিকায় গিয়ে বিয়ে করে থেকে গিয়েছিলেন। যতদূর জানি, তিন বছরের মধ্যেই ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়েছিল। দু'বছরের ছেলে রেখে বাবা চলে আসেন।"

এষাকে বাবার কাছে বসিয়ে রেখে ব্রততীদি নিজের কাজকর্ম সারছিলেন। এষা বুঝতে পারছিল জ্যাঠামশাই সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠতে পারছেন না। ও নিজে থেকে জিজ্ঞেস করল—"আপনার ছেলের এখন কিরকম বয়স হবে জ্যাঠামশাই? নাম কি?"

জ্যাঠামশাই-এর গলার স্বর জড়িয়ে যাচ্ছে। চশমার কাঁচের ওপারে ক্লান্ত, বিষণ্ণ দৃষ্টি। এষা ওঁর হাত ধরেছিল। জ্যাঠামশাই বললেন—"নাম ছিল র‍্যায়ান। দু'বছরের ছেলে নিয়ে ওর মা আলাদা হয়ে গেল। তার স্বভাব, চরিত্র ভাল ছিল না। তার থেকেই অশান্তি, ঝগড়া। অল্প বয়সের মোহের ঘোরে কী ভুল যে করেছিলাম বউমা! আজ তার প্রায়শ্চিত্ত করছি।"

—"প্রায়শ্চিত্ত বলছেন কেন জ্যাঠামশাই? বিয়ে ভেঙে যাওয়াটা কি পাপ?"

জ্যাঠামশাই বললেন—"আমি তাও মিটমাটের চেষ্টা করেছিলাম। সুজ্যান রাজি হল না।"

—"সেই যে চলে এসেছিলেন, তারপর আর কোনও খবর পাননি?"

—"র‍্যায়ানের খোঁজ খবর চেয়ে এলিজাবেথের একজন লোককে চিঠি দিয়েছিলাম। সেই লিখেছিল সুজ্যান আবার বিয়ে করেছে। রায়্যানকে নিয়ে অন্য কোথাও চলে গেছে।"

—"আর কখনও খোঁজ করেননি?"

জ্যাঠামশাই মাথা নাড়লেন—"নাঃ। আর চেষ্টা করিনি। আমিও তো আবার সংসার করলাম। ওই পর্বটা ভুলে থাকতে চেয়েছিলাম।"

এষা জিজ্ঞেস করল—"এখন তাকে দেখতে ইচ্ছে করে?"

-"দেখা কি আর হবে? সে কোথায় আছে, আমার কথা জানে কি না, কিছুই তো জানি না রে মা। তাই ভাবছিলাম, তোমরা যদি একবার খোঁজ করো।"

—"চেষ্টা করে দেখি। আসলে শুধু নাম থেকে খুঁজে বার করা তো যাবে না। ছবি আছে আপনার কাছে? এলিজাবেথের কোনও ঠিকানা আছে?"

বালিশের তলা থেকে পুরনো একটা খাম বার করলেন জ্যাঠামশাই। ভেতরে কোন কালের এক রঙিন ছবি। নেভীর পোশাক পরা জ্যাঠামশাই। কোলে দেড়-দু বছরের ছেলে।

ঘরে ব্রততীদি এসে দাঁড়িয়েছেন। এষার মনে হল ওঁর যেন কেমন নিস্পৃহ ভাব। তবে কি জ্যাঠামশায়ের কথায় এষার আগ্রহ দেখানো ঠিক হবে? উনি শেষ বয়সে ছেলের খোঁজ নিতে চাইছেন। কিন্তু আত্মীয়স্বজন কেউ তো কিছু জানে না। ব্রততীদি জানতেও চান না। তার মানে কি ওঁর এই ব্যাপারটা ভাল লাগছে না? যাকে জীবনে কখনও দেখেননি, তাকে হঠাৎ ভাই বলে মেনে নেওয়া। ব্রততীদি হয়তো কখনই তা পারবেন না। এষার প্রথম থেকেই মনে হচ্ছিল ব্রততীদি শুধু জ্যাঠামশাইয়ের জন্যে এত কথা বলেছেন। নয়তো কে আর এসব ঘটনা বাইরে জানাতে চায়?

ছবি হাতে নিয়ে এষা সরাসরি প্রশ্ন করল—"ব্রততীদি সামান্য হাসলেন—"আমার মতামত চাইছো?"

জ্যাঠামশাই বলে উঠলেন—"খুকুও চাইবে। আজ না হোক, একদিন ঠিক মনে হবে। তখন আমি বেঁচে থাকব না। বউমা, এ কাজটা তোমাদেরই করতে হবে।"

গেটের কাছে দাঁড়িয়ে ব্রততীদি বললেন—"বাবার দুঃখটা বুঝি। আর কতদিনই বা বাঁচবেন। যদি পারো, একবার চেষ্টা করে দেখো।"

দেশ থেকে চলে আসার আগে এষা প্রথমে ওর মাকে, আর দু'দিন পরে শাশুড়িকে জ্যাঠামশাই-এর কথা বলে দিল। ও যে একটা রহস্য উদ্ধার করতে যাচ্ছে, সেই উত্তেজনা লুকিয়ে রাখতে পারছিল না। কিন্তু শাশুড়িকে চমকে দেওয়া গেল না। তিনি নাকি অরূপের বাবার কাছে শুনেছিলেন। কিন্তু ছেলেদের বলেননি। জ্যাঠামশাই-এর ওপরে অরূপদের শ্রদ্ধা, ভক্তির বহর দেখে ঠাকুমাই বলতে বারণ করেছিলেন। ব্রততীদি জানেন শুনে এষার শাশুড়ি বললেন—"বুড়ো বয়সে ভীমরতি। মেয়েটাকে বলার কী দরকার ছিল? সারা জীবন বাপের সেবা করছে। আর এখন উনি ছেলে ছেলে করে মরছেন। মেমের ছেলে এসে ওঁর মুখে আগুন দেবে?"

এষা ওঁকে উসকে দিল—"তারপর দেখবেন বর্ধমানের জমিরও ভাগ চাইবে।"

শাশুড়ি রেগে উঠলেন—"তোমার সঙ্গে বটঠাকুরের এসব কথাও হয়েছে নাকি?"

এষা সামলে নিলো—"না মা, এমনি, মজা করছিলাম।"

আমেরিকায় ফিরে এসে এষা বিয়ের ব্যস্ততায় জড়িয়ে পড়ল। অরুণ আর রেখা শর্মা দু-তিন দিন পরে পরে ফোন করছে। বিয়ে কতক্ষণ ধরে হবে, হল ডেকোরেশন, টেবিলে টেবিলে কেমন ফুল সাজানো হবে, ককটেল আর ডিনার মেনু ঠিক করা, কেক কত উঁচু হবে, সঙ্গীত সেরিমনি, মেহেন্দী সেরিমনি, গনেশ পূজো, বরাত পার্টি মোট দুশোর মধ্যে থাকছে কি না-প্রত্যেক ব্যাপারে শর্মারা ওদের সঙ্গে কথা বলছে। অরূপও ব্যস্ত। বিয়েতে দূর থেকে কারা কারা আসবে, কতদিন থাকবে, কারা হোটেলে উঠবে, কাদের লোকের বাড়িতে তোলা হবে, কতবার এয়ারপোর্ট যেতে

হবে, সব গুছিয়ে কমপিউটরে তুলছে। এষা গায়ে হলুদ আর তত্ত্ব সাজানোর ব্যাপারে বন্ধুদের ডেকে লাঞ্চ মিটিং করল। ঠিক হল ভিকো টারমেরিক দিয়ে গায়ে হলুদ হবে। যে গরমমশলার বাগানবাড়ি বানানোর স্কিম জানে, তাকে এষা ব্যাগ ভর্তি করে তেজপাতা, লবঙ্গ, এলাচ, দারচিনি দিয়ে দিল। কাশ্মীরিদের চমকে দিতে হবে। তার মধ্যে অনি আর পূর্ণার ফোন আসছে। অনি টোপর পরবে না। পূর্ণা গালভর্তি করে 'স্মল পক্সে'র মতো চন্দন পরবে না। না পরবি, না পরবি, এষা এসব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না তার আসল সমস্যা হচ্ছে লোক কমানো। কিছুতেই নেমন্তন্নের লিস্ট ছোট করতে পারছে না। বিয়ের খরচ না নিয়ে আচ্ছা ফ্যাসাদে ফেলেছে শর্মারা, নিজেরা চারশোর ওপর লোক ডাকছে। আর এষাদের বেলায় মোটে দুশো। এর চেয়ে আলাদা রিসেপশন করলে ভাল হত। মুশকিল হচ্ছে সকলেই যে বিয়ে দেখতে চায়।

জ্যাঠামশায়ের ঘটনাটা এষা ফিরে এসেই অরূপ আর অনিকে বলেছিল। অরূপ বিশ্বাস করতে পারছিল না। কিন্তু এ তো বাইরে থেকে শোনা কথা নয়। এষাকে উনি নিজের মুখে বলেছেন। ছেলের ছবি দিয়েছেন। অরূপ ভাবছিল—মানুষকে এত কাছে থেকেও চেনা যায় না। জ্যাঠামশায়ের এদেশে বউ ছিল। ছেলে ছিল। অথচ অরূপরা জানত ওরাই ওঁর ছেলের মতো। বড়দিরও হয়তো ব্যাপারটা অ্যাকসেপ্ট করতে কত সময় লেগেছে। জ্যাঠামশাই এখন ঠিক কী চাইছেন? হারানো ছেলের খোঁজ পেলে কি তাকে দেখতে আসবেন? এই বৃদ্ধ বয়সে তা কি সম্ভব?

অরূপ এষাকে বলেছিল—"সামনে অনির বিয়ে। এর মধ্যে এত খোঁজ খবর করার সময় কোথায়? বিয়ে মিটে যাক। তারপর দেখছি।"

অনিও ঘটনা শুনে অবাক—"স্ট্রেঞ্জ। বড় দাদু এত বছর তোমাদের কিছু বলেননি? ছেলের সঙ্গেও কনট্যাক্ট করার চেষ্টা করেননি?"

এষা বলল—"এখন একেবারে অস্থির হয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু কীভাবে খোঁজ নেওয়া যায় বল তো? ছেলের নাম রায়্যান। তার মার নাম সুজ্যান। সে বুড়িও বেঁচে আছে কি না সন্দেহ। ছেলের বয়সই প্রায় ষাটের কাছাকাছি হবে।"

অরূপ বিরক্ত হতে গিয়েও হেসে ফেলল—"এ যেন আমাদের বৌঁচিতে গিয়ে হরি আর হরির মাকে খোঁজা হচ্ছে। বুড়ো বয়সে জ্যাঠামশাই কি কাজই যে দিলেন।"

অনিও হাসছে—"বেস্ট হচ্ছে কোনও ইনফর্মেশন-এজেন্সির কাছে যাওয়া। ডিটেকটিভ এজেন্সির হেলপ নিলেও কাজ হতে পারে। নয়তো, মা, এক কাজ করো। ওই ছবিটা নিয়ে টিভি-র টকশোতে জয়েন করো। মিসিং রিলেটিভস রি-ইউনাইটেড শোতে বাবার ওই কাজিনকে ওরাই এনে হাজির করবে।"

অরূপ ভুরু কুঁচকে বলে উঠল—"না। এখন আমি আর কাজিন-টাজিন চাই না। এমনিতেই তোমার বিয়ের গেস্ট লিস্ট নিয়ে রোজ কাটাকুটি চলছে। আর নতুন আত্মীয়তার দরকার নেই।"

অনি পরে মার কাছে হাসছিল—"ড্যাড মনে হচ্ছে একটু জেলাস হয়ে পড়েছে। এতদিন বলত আমরাই জ্যাঠামশায়ের ছেলে। অ্যান্ড নাউ, অল অন-আ-সাডন, বড়দাদুর ছেলে আছে শুনে ড্যাড-এর রি-অ্যাকশনটা দেখছো?"

এষা বলল—"হতেই পারে। তাছাড়া একটা শকও তো! ছোট থেকে যাঁকে এত রেসপেক্ট করে এসেছে, তাঁর সম্পর্কে হঠাৎ এরকম শুনলে..."

অনি বলল-"জানি, ড্যাডের মেনে নিতে সময় লাগবে।"

সারাদিনের কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে এষা যেন এক ধরনের চ্যালেঞ্জ অনুভব করছিল। একটা বেশ কঠিন কাজ করে দেখানোর সুযোগ পেয়েছে। সুযোগটা কাজে লাগাতে হবে। এদেশে সদাব্যস্ত কেরিয়ার উইমেন-এর ভীড়ে ও কখনও নিজের জায়গা খুঁজে পায়নি। বাঙালি বন্ধুদের মধ্যে বেশিরভাগই কোনও না কোনও প্রফেশনে আছে। আমেরিকায় আসার পর আরও পড়াশোনা করেছে। এষার কিছুই করা হয়নি। কাজ বলতে ওই দোকানে, বাজারে টুকটাক পার্ট টাইম চাকরি। এক বছর করেছে, তো ছ'মাস বসে থেকেছে। ফুল-টাইম চাকরি ওর পোষায় না। সাত সকালে উঠে মেক-আপ চড়িয়ে গাড়ি নিয়ে বেরনো। আর সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরে রান্না করা থেকে সংসারের সব ঝক্কি সামলানো। বাঙালি বরেরা কতটুকু সাহায্য করে জানা আছে। যারা করে, তারা করে। কিন্তু অরূপ যে কত কাজের লোক, এষা খুব জানে। ডবল খাটুনি খেটে এষার প্রাণ যেত। অত বাড়তি রোজগারের ঝোঁকও নেই। তার চেয়ে যখন ইচ্ছে দেশে চলে যাবে। যতদিন খুশি কাটিয়ে আসবে। এই ওর ভাল লাগে। চাকরি মানেই দু' দিকের কমিটমেন্ট। বছরের পর বছর ঘরে-বাইরে উদয়াস্ত খাটুনি। এষার অত লড়তে ইচ্ছে করে না।

কিন্তু ইদানীং নিজেকে একটু দলছাড়া মনে হয়। বিশেষ করে ইন্ডিয়ান গ্যাদারিং-এ গেলে একেক সময় কেমন যেন আইসোলেটেড লাগে। ওই যে এক কথা—তুমি করো না? সারাদিন কী করে বাড়িতে থাকো? আমি তো ভাবতেই পারি না মাই গড, কাজের মধ্যে না থাকলে পাগল হয়ে যাব।

এষার খুব রাগ হয়। বাড়িতে থাকি মানে কি শুয়ে থাকি? সংসার চালানোটা কাজ নয়? অনিকে কে মানুষ করল? কে বাংলা বলতে শেখাল? নয়তো ওই তোদের ছেলেদের মতো সং তৈরি হত। টিকি দুলিয়ে কানে মাকড়ি পরে ঘুরত।

কিন্তু এসব কথা তো আর বলা যায় না। ছেলে মানুষ করেছি বলে অহঙ্কার করাও হাস্যকর। কিন্তু লোকেদের কথাবার্তা শুনলে মাঝে মাঝে এরকমই বলতে ইচ্ছে করে ওর। তাছাড়া, বাইরের কাজ কি কম? বাজারহাট, ব্যাঙ্ক, পোস্ট অফিস, গাড়ির সার্ভিসিং করানো, বাড়ি সারানো—কোনটা ও করছে না? অফিসে চাকরি না করলেই বসে থাকা হল? আজকাল অরূপও বলতে শুরু করেছে—হার্ডশীপ কি জিনিস, কোনওদিনই তো জানলে না।

ইদানীং এ ধরণের মন্তব্য এষাকে এক ধরনের কমপ্লেক্সের মধ্যে ঠেলে দিচ্ছিল। কোথাও যেন নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করা যাচ্ছে না। জ্যাঠামশায়ের ছেলে খুঁজে দেওয়ার দায়িত্ব নিয়ে ও হয়তো সেই যোগ্যতা দেখানোর চেষ্টা করছিল। অনি যাই বলুক। কাজটা মোটেই সহজ নয়। বললেই তো হল না, প্রাইভেট আই-এর কাছে যাও। টিভি-র টক-শোতে চলে যাও। এষা ওভাবে ফ্যামিলির প্রাইভেট খবর নিতে চায় না। প্রাইভেট ইনভেস্টিগেশনের খরচই বা দেবে কে? সেই তো ওদের ঘাড়েই পড়বে। তার চেয়ে এষা নিজে চেষ্টা করবে। অনির বিয়ে মিটে যাক। তারপর টিভি-র ফক্স নিউজ চ্যানেলের সাহায্যে চাইবে। দেখাই যাক না কী থেকে কী হয়?

এষার আরও একটা চিন্তা হচ্ছে। যদি সেই রায়্যান বাসুর খোঁজ পাওয়াও যায়, সে কি যোগাযোগ করতে চাইবে? হয়তো সে জ্যাঠামশাইকে স্বীকার করতেও চাইবে না। হতেই

পারে। তখন এষা কী করবে? জ্যাঠামশাইকে সত্যি কথাটা জানাতে হবে। কেননা ও যে তাঁর ছেলের খোঁজ পেয়েছে, সেটা বলতেই হবে। আবার এমনও হতে পারে রায়্যান বাসু ভীষণ অভিভূত হয়ে পড়বে। আমেরিকানরা রুট খোঁজার জন্যে কী না করছে? অ্যাডপ্টেড লোক আসল বাবা, মাকে খুঁজে বার করছে। রায়ান বাসু হয়তো তার বাবাকে কতবার দেখতে চেয়েছে। এষা যদি আজ তাকে বাবার খবর এনে দেয়, সে আশ্চর্য হয়ে যাবে না? খুশি হয়ে বাবাকে দেখতে চাইবে।

কল্পনায় এই সব আবেগময় দৃশ্য দেখতে দেখতে এষা অসম্ভব প্রেরণা পাচ্ছিল। জ্যাঠামশাইকে অভাবিত আনন্দ দেওয়ার জন্যে, অরূপ অনি আর চেনাশোনা লোকেদের কাছে নিজের অনুসন্ধান ক্ষমতার প্রমাণ দেওয়ার জন্যে এষা এক ভীষণ উত্তেজনাপূর্ণ কাজ পেয়ে গেল।

এষা অনেকদিন "হেয়ার অ্যাণ্ড কেয়ারে" যেতে পারেনি। মাঝে জ্বরে পড়ল। প্রায় দু' মাস পরে যেদিন বিউটি স্যালনে গেল, দুপুরে তেমন ভিড় ছিল না। এষা লেসলির কাছে শ্যাম্পু করছিল। চোখ খোলার পর সামনের আয়নায় ক্রিস্টিনাকে দেখতে পেল। এক মাথা কোঁকড়ানো চুল খোঁপার মতো করে জড়িয়ে রেখেছে। ঘুম ঘুম চোখে একজোড়া সরু ফ্রেমের চশমা। এষার দিকে তাকিয়ে হাসল।

এষার মনে হল দু'জন অচেনা মানুষের মধ্যে কী আশ্চর্য মিল। কথা বলার আগেই ক্রিস্টিনার ছায়া সরে গেল।

এষা কাউন্টারে বিল পেমেন্ট করার সময় ক্রিস্টিনাকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করল— "তুমি বলেছিলে না তোমরা বেঙ্গলি?"

ক্রিস্টিনা দেওয়ালের তাকে নেইল-পালিশের শিশি সাজাতে সাজতে মুখ ফেরাল— "বলেছিলাম। তোমার লাস্ট-নেম দেখে বুঝেছিলাম তুমিও বেঙ্গলি।"

এষার মাথার মধ্যে যেসব প্রশ্ন ভিড় করে আসছে, এত সামান্য পরিচয়ে তা জিজ্ঞেস করা যায় না। কারুর ব্যাক্তিগত জীবন সম্পর্কে নিজে থেকে বেশি কিছু জানতে চাওয়া মানে অশোভন কৌতূহল দেখানো। তবু এষা না বলে পারল না—"তোমার বাবা বেঙ্গলি? লাস্ট-নেম বলেছিলে বাসু? রাইট?"

ক্রিস্টিনা চলে যেতে যেতে উত্তর দিল—"ইয়েস। ফ্রম ওয়ান সাইড।"

এষা আর কথা বলার সুযোগ পেল না। বাড়ি ফেরার সময় গাড়ি চালাতে চালাতে ভাবল সামনের সপ্তাহেই আবার "হেয়ার অ্যান্ড কেয়ারে" আসবে। ক্রিস্টিনার সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে। কিন্তু অনির বিয়ের মুখে এষা ওর কাছে তা করে চুল কাটাতে বসবে না। ফেশিয়াল আর পেডিকিওয়রের ছুতো করে চলে আসবে। তারপর মালিশের ফাঁকে ফাঁকে খবর বার করবে। এষার মন বলছে, রহস্য উদ্ধারের দেরি নেই। এ কাজ ও নিজেই করতে চায়। আগে থেকে অরূপকে অনিকে কিছু বলার দরকার নেই।

সেদিন ভোর থেকে বরফ পড়ছে। নভেম্বরের গোড়ায় এত ঠাণ্ডা পড়ে যাচ্ছে দেখে অরূপ অফিস যাওয়ার সময় বলল—"এখন থেকে স্নো শুরু হল। থ্যাঙ্কস গিভিং হলিডেতে ওয়েদার কেমন থাকবে কে জানে?"

এষা ওর হাতে লাঞ্চের প্যাকেট ধরিয়ে দিয়ে বলল—"ওয়েদার ভালই থাকবে। তাছাড়া, বিয়ে তো হোটেলে হচ্ছে। বাইরে হলে চিন্তা ছিল।"

একটু বেলায় আবহাওয়া পরিষ্কার হতে এষা "হেয়ার অ্যান্ড্ কেয়ারে" চলে গেল। ক্রিস্টিনার সঙ্গে অনির বিয়ের কথা নিয়ে গল্প শুরু করল, মুখে, গলায়, ম্যাসাজের সময় বেশি বক বক করা যায় না। পেডিকিওরের সময় সুবিধে হল। এষা ক্রিস্টিনার হাঁটুর ওপর পাতা তোয়ালেতে পা তুলে দিয়ে বলল—"ইন্ডিয়া থেকে ক'জন আত্মীয় বিয়েতে আসছে। মোস্টলি ফ্রম ক্যালকাটা।"

ক্রিস্টিনা উৎসাহ দেখাল—"ওঃ, রিয়েলি?"

-"তুমি ক্যালকাটার নাম শুনেছো?"

-"বাবার কাছে শুনেছি। বাবা অবশ্য কখনও যায়নি।"

এষা হেলান দিয়ে বসেছিল। এবার সোজা হল-" তোমার গ্র্যান্ড পেরেন্টরা কি ক্যালকাটা থেকে এসেছিলেন?"

ক্রিস্টিনা এষার গোড়ালিতে ব্রাশ ঘষতে ঘষতে মুখ নীচু করে উত্তর দিল-"আমার গ্র্যান্ড ফাদার ক্যালকাটা থেকে এসেছিলেন।"

এষা ঝুঁকে পড়েছে—"তুমি তার নাম জানো?"

মুখ তুলে ক্রিস্টিনা বলল-"অ্যাশ বাসু।"

এষা ভেতরে ভেতরে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। অ্যাশ বাসু? আর কে হতে পারে? নিশ্চই জ্যাঠামশাই। অশ্বিনী থেকে অ্যাশ হয়েছিলেন। কী ছাই নাম! এষা আরও ঝুঁকে পড়ল—"আর তোমার বাবার নাম? ডাজ হি হ্যাভ ইন্ডিয়ান নেম?"

ক্রিস্টিনা টাবের মধ্যে পা ধোওয়াতে ধোওয়াতে মাথা নাড়ল—"নো হিজ নেম ইজ রায়্যান।"

এষা রহস্যের কিনারায় এসে প্রায় নিশ্চিত হয়ে বলল—"আর তোমার গ্র্যান্ড মা-র নাম সুজ্যান? রাইট?"

ক্রিস্টিনা অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। শুধু ক্যালক্যাটার নাম শুনে এ মহিলা এত খবর বলে দিলেন? বাসু মানে কি একটা ছোট ক্ল্যান? সবাই সবাইকে চেনে? এ কথা জিজ্ঞেস করাতে এষা বলল-"না। আমি আসলে একটা সম্পর্কের খোঁজ করছিলাম। আজ কথায় কথায় বেরিয়ে গেল।"

ক্রিস্টিনা জিজ্ঞেস করল-"তুমি আমার গ্র্যান্ট মা-র নাম জানলে কী করে? উনি তো কখনও ইন্ডিয়ায় যাননি?"

এষা হাসল-"তোমার গ্র্যান্ড ফাদারের থেকে।"

ক্রিস্টিনা বিস্ময়ের ঘোরে উঠে দাঁড়িয়েছে—"সে কী? তিনি কোথায়? এখনও বেঁচে আছেন?

ওদের কথার মাঝখানে স্যালনের ম্যানেজার ডেবি এসে দাঁড়াতে দু'জনেই থেমে গেল। ডেবি বলে গেল ক্রিস্টিনার লাঞ্চ ব্রেক হয়ে গেছে। পরের কাস্টমার আধ ঘন্টার মধ্যে আসবে। ক্রিস্টিনা তাড়াতাড়ি করে আবার কাজ শুরু করল। চলে আসার আগে আর কিছু কথা বলে এষা ওর বাড়িতে ফোন নম্বর দিয়ে এল।

দু'দিন পরে ক্রিস্টিনার ফোন। ওর বাবা এষার সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন। একবার কি দেখা করা সম্ভব? এষা ওদের ওই সপ্তাহেই আসতে বলে দিল। রায়্যান প্রায় ফিলাডেলফিয়ার কাছে থাকেন। ছুটির দিন হলে সুবিধে হত। কিন্তু এষাদের এখন উইক-এন্ডে বিয়ের কাজকর্ম

এগিয়ে রাখতে হচ্ছে। ক্রিস্টিনা ওর বাবাকে নিয়ে মিডউইকেই আসবে বলল।

এষা অরূপ আর অনিকে যখন ব্যাপারটা জানাল, ওরা প্রথমে বিশ্বাস করছিল না। আমেরিকায় রায়্যান নামে হাজার হাজার লোক আছে। এক আধজন বাসুও হতে পারে। এষা কাকে জ্যাঠামশায়ের হারানো ছেলে বলে ধরে আনছে কে জানে? অবশ্য লতাপাতা খুঁজে আত্মীয়তা আবিষ্কারের ক্ষমতা যে ওর অসাধারণ, সে অরূপ বরাবর দেখে আসছে। তাই বলে হঠাৎ "অ্যাশ"-কে অশ্বিনীকুমার ধরে নিয়ে আচমকা তার তিন পুরুষ খুঁজে বার করা—এ কি সিনেমার গল্প নাকি? এষা এবার পুরো আন্দাজে ঢিল মেরেছে। এখন সেই ঢুলুশ্রী মেয়ে আর তার বাবা আসছে আলাপ করতে । ভদ্রতার খাতিরে এষা আবার তাদের ডিনারে খেতে ডেকেছে।

অরূপের হাবভাব দেখে এষা রেগে গিয়ে অনিকে ফোন করল। ওদেরই বাড়ির জন্যে এত সময় নষ্ট করে এষা 'ইনভেস্টিগেশন' করছে। নয়তো কে এই কেচ্ছা নিয়ে মাথা ঘামাতো?

অনি জিজ্ঞেস করল,—"কেচ্ছা মানে কী?"

এষা কথা ঘুরিয়ে বলল—"জানি না। বাট ইউ পিপল শুড রেকগনাইজ মাই এফর্ট তা নয়, খালি হাসাহাসি!"

শেষ পর্যন্ত শুক্রবার ক্রিস্টিনা তার বাবাকে নিয়ে এল। ষাটের কাছাকাছি বয়স। আমেরিকানদের তুলনায় ছোটখাটো চেহারা। গোল মুখ। চশমার আড়ালে ঢুলঢুলে চাউনি। অরূপ দেখছিল জ্যাঠামশাইয়ের মাঝ বয়সের চেহারার সঙ্গে মেলে। সত্যি মেয়েটাকেও অনেকটা বড়দির মতো দেখতে। এষার অবজারভেশন আছে বটে।

ওরা এসে বসার পর কেউই ঠিক কথা খুঁজে পচ্ছিল না। অসোয়াস্তি কাটিয়ে অরূপ শুরু করল—"আপনারা এষার কাছে কিছুটা জেনেছেন নিশ্চয়ই? আমার আঙ্কেল অনেক বছর আগে এসেছিলেন। বিয়ে করেছিলেন। দ্যাট ওয়াজ হিজ ফার্স্ট ম্যারেজ। ওঁর স্ত্রীর নাম ছিল সুজ্যান। ছেলের নাম র‍্যায়ান। আমার আঙ্কেলের নাম অশ্বিনী বাসু। আপনি কিছু রিলেট করতে পারছেন।

নিজের ওয়ালেট থেকে একটা ছবি বার করলেন ভদ্রলোক। অরূপের হাতে দিয়ে বললেন—"আমার বাবার ছবি। এঁর কথা আমার কিছুই মনে নেই। শুধু ছবি দেখেছি।

অরূপের চিনতে ভুল হয় না। জ্যাঠামশায়ের কম বয়সের ছবি। মাথা নেড়ে বলল—"হ্যাঁ, ইনি আমার বাবার বড় ভাই।"

রায়্যান জিজ্ঞেস করলেন—"ওঁর কাছে আমারও ছবি দেখেছেন শুনলাম। সে ছবিখানা একবার দেখতে পারি?"

এষা জ্যাঠামশায়ের দেওয়া ছবিটা এনে রায়্যানের হাতে দিল। ভদ্রলোক কতক্ষণ ধরে ছবিখানা দেখলেন। মেয়ের হাতে দিয়ে বললেন—

—"দিস ইজ ইওর গ্র্যান্ড ফাদার। অ্যান্ড দ্যাটস মি।"

ওঁর গলা ভারি হয়ে এল। একটু চুপ করে থেকে অরূপকে বললেন—

—"বেঁচে আছেন শুনেছি। হি মাস্ট বি ইন হিজ এইটিজ্?"

—"অলমোস্ট এইটি ফাইভ।"

ক্রিস্টিনা এতক্ষণ চুপচাপ ছিল। মাঝে আবার কথাবার্তা থেমে আছে দেখে এষাকে

জিজ্ঞেস করল—" তোমার ছেলের বিয়ে বোধহয় এসে গেল? ক্যালকাটা থেকে আত্মীয়েরা আসবে বলেছিলে। আমার গ্র্যান্ড ফাদার কি আসছেন?"

এষা ওদের ডিনারের আগে স্ন্যাকস দিচ্ছিল। কফি টেবলে খাবারের প্লেট রেখে বলল—"না। ওঁর পক্ষে এত দূর আসা কষ্টকর। প্রায় চব্বিশ ঘন্টার ট্রাভেল। আমরাই টায়ার্ড হয়ে পড়ি।"

আরও খানিকক্ষণ কথাবার্তা হল। র‍্যায়ান বললেন ওঁর ছবি বাঁধাই-এর ব্যবসা। ছেলেও সেই ব্যবসা দেখে। বউ আর্ট টিচার। ক্রিস্টিনা বিউটিশিয়ানের কোর্স নিয়েছে। পরে নিজের স্যালন খোলার ইচ্ছে। ওর এনগেজমেন্ট হয়ে গেছে। সামনের বছর বিয়ে। ক্রিস্টিনার বয়ফ্রেন্ড অ্যাকাউন্টেন্ট। সে এদিকে থাকে বলে ক্রিস্টিনা কাছাকাছি শহরে চলে এসেছে। এক বন্ধুর সঙ্গে অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া করে আছে।

এষা জিজ্ঞেস করল—"আর আপনার মা? তিনি কোথায় থাকেন?"

র‍্যায়ান বললেন—"মা বেঁচে নেই। গত বছর ফ্লরিডায় মারা গেছেন। ওখানেই থাকতেন। স্টেপ ফাদারও অনেকদিন মারা গেছেন।"

মেঘ, বৃষ্টির গল্প

টিভি-র আওয়াজ ছাপিয়ে লিভিং রুম থেকে মানসীর গলা শোনা গেল—"ছত্তিরিশ"।

পিনাকী রান্নাঘরে ওয়ালপেপার লাগাচ্ছিল। শনিবার সকাল থেকে মানসী কাঁচি আর রোল ধরিয়ে দিয়েছে। সেই কখন শুরু করেছে। এখনও মাঝপথে। সাইডের দেওয়াল পুরো বাকি। কাজটা মোটেই সোজা নয়। ভারী ভারী ওয়ালপেপার। সুইচ বোর্ডের চারদিকটা কায়দা করে ঢাকতে গিয়ে কুঁচকে গেল। ক্যাবিনেটের নীচে এক জায়গায় ঢেউ ঢেউ হয়ে আছে। মানসী দেখলেই খুলে ফেলতে বলবে।

পিনাকীর ধৈর্য থাকছিল না। রান্নাঘরের দেওয়াল জুড়ে এত লতাপাতার দরকার কী? বেশিদিন এ-অ্যাপার্টমেন্টে থাকবেও না। শুধু শুধু খরচা আর সময় নষ্ট। ছুটির দিনে "নিউ ইয়র্ক টাইমসটা" পর্যন্ত উল্টে দেখার সময় পেল না। খালি দেওয়াল মুছছে আর কাগজ সাঁটছে। এসব কাজ পিনাকী ভাল পারেও না। কিন্তু মানসী বুঝবে না। সারাক্ষণ কেবল এর বর "হ্যান্ডিম্যান", তার বর "এফিশিয়েন্ট" বলে তুলনা দেবে। সাত সকালে ওয়ালপেপার লাগাতে কিচেনে ঢুকিয়ে দিয়েছে। বোধহয় লাঞ্চ ব্রেক দেওয়ারও ইচ্ছে নেই।

আবার মানসীর গলা— "পিন্টু, সব মিলিয়ে ছত্তিরিশ"। পিনাকী বুঝতে পারছিল তার কাজটা একদম দায়সারা হচ্ছে। ওদিকে মানসী সমানে "ছত্তিরিশ" "ছত্তিরিশ" করে যাচ্ছে। একবার কিচেনে এলে তো পারে। ওয়ালপেপারটা একটু টেনে ধরলেও সুবিধে হয়। জিনিসটা সমানভাবে বসে। তা নয়, এক হাত দেওয়ালে ঠেকিয়ে রেখে আর এক হাতে কাগজ সাঁটতে হচ্ছে! অলরেডি বগলে ব্যথা করছে। পিনাকী এবার গলা তুলল—" একবার কিচেনে আসবে? হেলপ দরকার।"

মানসী বলল— "আসছি। দু'মিনিট।"

পিনাকী জানে হেলপার হতে মানসী সব সময় রাজি। কিন্তু আসল কাজটা পিনাকীকে করতে হবে। মানসী আবার খুব সাবধানী। আগে থাকতেই ধরে নেয় অ্যাকসিডেন্ট হবে। অদ্ভুত সব কান্ড করে। সিলিং-এ বসানো আলোর ডোম খুলে বাল্ব বদলাচ্ছে পিনাকী। নীচে চেয়ার ধরে মানসী। পাঁচ ফুট হাইট। রোগা রোগা গড়ন। পরণে ট্রাকস্যুট। মাথায় এক বেঢপ সাইজের কনস্ট্রাকশন হ্যাট। যদি পিনাকীর হাত থেকে কাচের ডোমটা ফসকে যায়, মানসীর "হেড ইনজুরি " হবে না। পিনাকীর অফিস থেকে কোনকালে সাইট ইনসপেকশনের জন্যে টুপিটা দিয়েছিল। হেলমেটের মতো দেখতে। মানসী প্রায়ই ওটা পরে নেয়। আজকাল আবার চোখে সেফটি গ্লাস পরে মাছ ভাজছে। কবে নাকি মুড়োর চোখ ফেটে মানসীর চোখে

ঢুকেছিল। সেই থেকে সেফটি কনসানর্ড। ফাইবার গ্লাসের চশমাটাও পিনাকীর অফিস থেকে পাওয়া। মানসী বলে মাছ ভাজার পক্ষে আইডিয়াল।

মানসী এসে পড়ল। তারপরেই ভুরু কুঁচকে গেল।

—" একটু ব্যাঁকা লাগছে না? ওপরটা সমান হয়নি কিন্তু।"

পিনাকী পিছিয়ে দাঁড়াল। খুব কায়দা করে এক চোখ ছোট করে বলল—"স্লাইট নেমে গেছে! ক্যাবিনেটের নীচে তো। চোখেই পড়বে না।"

—"ইস! সুইচ বোর্ডের চারপাশটা কী করেছ? সব খুলতে হবে।" পিনাকী ঠিক এই ভয়টাই পাচ্ছিল। কিন্তু ও আর খোলাখুলির দিকে যাবে না। ওয়ালপেপার টেনে তুললে দেওয়ালের পেইন্ট উঠে আসবে। পেপারটাও আর লাগানো যাবে না। কতবার করে রোল কিনতে যাবে?

পিনাকী বোঝানোর চেষ্টা করল— "কিছ্ছু করতে হবে না। ভাল করে না দেখলে ধরাই যাচ্ছে না.....।"

মানসী তবু গজ গজ করছিল। পিনাকী এই সুযোগে কাজ বন্ধ করে দিল। দু'হাত ওপরে তুলে আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে বলল—"একটু ব্রেক নিই। লাঞ্চ দেবে কখন?

মানসী রাগতে গিয়েও হেসে ফেলল—"তুমি কী বল তো? যা তা করে ওয়ালপেপার লাগিয়ে এখন কথা ঘোরাচ্ছো। বাড়ির একটা কাজ পারো না।"

—"দূর! যত এক্সট্রা ঝামেলা! এর চেয়ে পেইন্ট করে দিলেই হত।"

মানসী বলল—"যাক গে, যা হয়েছে, হয়েছে। লাঞ্চের পর দু'জনে মিলে বাকিটা লাগাব।"

দু'জনে খেতে বসল। কালকেও ছুটি আছে। ওয়ালপেপার লাগানোর তাড়া নেই। তবে কালকের মধ্যেই সেরে ফেলতে হবে। পরের শনিবার বাড়িতে পার্টি। মানসী রান্নাঘরটা সুন্দর করে ফেলতে চাইছে। স্প্রিং ফ্লাওয়ারের ডিজাইন আঁকা ওয়ালপেপার দিয়ে দেওয়ালের তেল মশলার দাগ ঢেকে দেবে।

নুডলস-এ হট সস ঢালতে ঢালতে পিনাকী জিজ্ঞেস করল— "ক'জন আসছে সব শুদ্ধ?"

—"বাচ্চা-টাচ্চা নিয়ে ছত্তিরিশ।"

— "রান্নাটান্না ম্যানেজ করতে পারবে?"

—"হয়ে যাবে। একদিনে তো আর রাঁধব না।"

লাঞ্চ শেষ হওয়ার আগেই ফোন এল। পিনাকী ফোন ধরল। মানসী বুঝতে চেষ্টা করছিল কার ফোন। এখন আর অত গল্প করার সময় নেই। পিনাকীকে আবার কিচেনে ঢোকাতে হবে। তখন মানসী বেশি কিছু বলেনি। কিন্তু ঐ কোঁচকানো জায়গাটা খুলতেই হবে।

ঠিক যা ভেবেছে তাই। সজলের ফোন। নিশ্চয়ই আজ আসার তাল করছে। পিনাকী এক কথায় রাজি হয়ে যাচ্ছিল। মানসীর মুখ দেখে বলল—"এক মিনিট। মানসীর সঙ্গে কথা বলো।" চট করে রিসিভার এগিয়ে দিল।

—"হ্যালো বউদি। কেমন আছেন?"

—"ভাল। তোমার কী খবর?"

—"প্রচন্ড সর্দি। ভাত-ফাত আর খাওয়া যাচ্ছে না।"

—"জ্বর আছে? টেমপারেচর নিয়েছ?"

—"কে জানে? থার্মোমিটারই নেই।"

—" রেস্ট করো। চিকেন স্যুপ আছে বাড়িতে ?"

—"দূর! স্যুপ কে খাবে? গরম পরোটা পেলে খেতাম। খাওয়াবেন? তাহলে চলে আসব।"

—"এই ঠান্ডায় বেরোবে? তারপর তোমার থেকে আমাদের সর্দি হোক! তখন কে পরোটা খাওয়াবে?"

সজল সর্দি বোজা গলায় আশ্বাস দিল—"চিন্তা করবেন না। আসছি না। এমনি, আপনাকে একটু নার্ভাস করে দিচ্ছিলাম।"

ঠান্ডা বুঝেও মানসী অপ্রস্তুত হল। ও যে সজলকে তেমন খাতির যত্ন করে না, যখন তখন চলে এলে একটু বিরক্তই হয়, সজল কি আর বোঝে না? তাও গায়ে মাখে না। আজ কিন্তু সেই নিয়েই ঠাট্টা করল। পিনাকীও যেন মানসীর কাটিয়ে দেওয়ার চেষ্টাটা পছন্দ করছে না। মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে। মানসী সজলকে রিসিভার নামাতে দিল না। হালকা গলায় বলে উঠল— "ঠিক আছে। চলে এসো। লুচি, পরোটা কিছু একটা পেয়ে যাবে।"

সজলের ভাঙা গলা ভেসে এল— "গ্রেট! কখন যাব বলুন।"

—"ধরো সাতটা নাগাদ। আমরা এখন ওয়ালপেপার লাগাচ্ছি। সন্ধের আগে শেষ হবে না মনে হচ্ছে।"

—"তাহলে আগেও আসতে পারি। পিনাকীদার হেলপ দরকার?"

—"না, না আমরাই লাগিয়ে ফেলব। তুমি রেস্ট নাও। সন্ধেবেলা শরীর ঠিক হলে চলে এসো।"

মানসী সজলকে আসতে বলছে শুনে পিনাকী একটু খুশি হল। ছেলেটা ম্যানহ্যাটনে একা থাকে। মাঝে মাঝে ফোন করে চলে আসে। অত সময়-অসময় বোঝে না। মানসী যে সজলকে অপছন্দ করে, তা নয়। কিন্তু একেক দিন কাটিয়ে দিতে চেষ্টা করে। ইদানীং সজল এলে রাতে থেকে যায়। সাবওয়েতে দু-তিনবার মাগড় হওয়ার পরে বেশি রাতে আর আপ-টাউনে ফিরতে চায়না। পিনাকীও বারণ করে। সজল থেকে যায়। পরদিন বেলা পর্যন্ত ঘুম লাগায়। ওঠার পর চা, কফি, সিগারেট আর অনর্গল কথা। বিকেলের দিকে বাড়ি যায়। মানসী আসলে এই লম্বা পর্বটা পছন্দ করে না। ওর ভীষণ পরিষ্কার বাতিক। আর সেখানেই সজলকে নিয়ে মুশকিল হয়েছে। মানসীর ধারণা সজল জামাকাপড় ছাড়ে না। প্রত্যেকবার এক টার্টলনেক সোয়েটার আর জিনস পরে আসে। সোয়েটারটা অফ হোয়াইট ছিল। এখন সবজে হয়ে গেছে। সজলের মাথা ভর্তি ঝাঁকড়া চুল। কাঁধ পর্যন্ত লম্বা। মানসী ওর অ্যাপার্টমেন্টে গিয়ে দেখেছে কোথাও শ্যাম্পুর শিশি নেই। ঐ চুলে জীবনে শ্যাম্পু করে না, বোঝাই যাচ্ছে। তার মানে খুশকি আছে। সজল যখন তখন মানসীদের সোফায় আড় হয়ে শুয়ে থাকে। বগলে কুশন চেপে বসে। সিগারেটের ছাই অ্যাশট্রেতে না ফেলে দু'দিন কফি মাগে ফেলেছিল। বাথরুমে গেলেই সিগারেটের গন্ধ। দাঁত ব্রাশ করতে করতে বেরিয়ে এসে কথা বলে। সজল রাতে থাকা মানে প্রত্যেকবার মানসীকে গেস্টরুমের বিছানার সেট, ব্ল্যাংকেট ওয়াশিং মেশিনে দিতে হয়। মানসী অবশ্য বলে অ্যাভারেজ ছেলেরাই এরকম।

পিনাকী তো মানসীর ভয়ে নিজের চরিত্র পাল্টে ফেলেছে। নয়তো ধপধপে গেঞ্জি রোজ কাচতে দেওয়া কী দরকার? এই যে তার অসময়ে মাথার চুল পাতলা হয়ে যাচ্ছে, সেও নির্ঘাৎ

ঘন ঘন শ্যাম্পু করার জন্যে। কিন্তু মানসী মানবে না। তখনই খুশকির ইতিহাস শুরু করবে। ড্যানড্রাফ যে কত ছোঁয়াচে? একজনের মাথা থেকে ভুরু বেয়ে সারা গায়ে ছড়িয়ে গিয়ে আর একজনের মাথায় ঢুকে যায়—এই লম্বা সফরের খবর তো পিনাকী মানসীর কাছেই পেয়েছে। শুধু সজল কিছু জানে না। সরল বিশ্বাসে পিনাকীর হেয়ার ব্রাশ দিয়ে চুল আঁচড়ে বাড়ি চলে যায়। পিনাকী তো ওকে বলতে পারে না— তুমি একবার মানসীর চোখের সামনে উদোম হয়ে দাঁড়াও। সাবানের বিজ্ঞাপনের যুবকের স্টাইলে সারা গায়ে ফেনা মেখে নেচে নেচে চান করো, ঘাড়ে মাথায় শ্যাম্পুর শিশি উজাড় করে দাও। ঝাঁকড়া চুলে ফেনার মুকুট পরো। সোয়েটার কাচো। গেঞ্জি খুলে ছুঁড়ে দাও। তবে যদি মানসীকে কনভিন্স করতে পারো।

লাঞ্চের পরে খানিকক্ষণ খবরের কাগজ পড়ল পিনাকী। বিকেলের দিকে আবার কিচেনে গিয়ে কাজ শুরু করল। এবার মানসীও হাত লাগিয়েছে। দুজনে মিলে সন্ধের মুখেই ওয়ালপেপার লাগিয়ে ফেলল। বাইরে অন্ধকার হয়ে আসছিল। বড়-আলোটা জ্বেলে দিতে দেওয়ালের ফুলের নকশা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মানসী এক পলক চেয়ে থেকে বলল—"ঘরটা ব্রাইট লাগছে না?"

—"হ্যাঁ! লতা পাতা ভালই লাগছে। কিন্তু তার বদলে তুমি আমার কাঁধ টিপে দেবে। ওঃ সকাল থেকে ভিড়িয়ে দিয়েছো।"

মানসী পিনাকীর দু'কাঁধে হাত রেখে হাসতে হাসতে বলল—"তাও তোমাকে এখনও ময়দা মাখতে বলিনি। সজল পরোটা খেতে আসছে! এনি মোমেন্ট এসে যাবে।"

বলতে বলতে ডোর বেল বাজিয়ে সজল এসে হাজির। কিন্তু মানসীর আর পরোটা করার ধৈর্য নেই। আজই সবে ওয়ালপেপার লাগিয়েছে। তিনজনে মিলে "শের-এ-পাঞ্জাব"-এ যাবে। সজলকে আলুর পরোটা খাইয়ে দেবে। মোহিনী সিং ল্যাম্ব ভিন্ডালুও ভালই করে।

পিনাকী লক্ষ করল, সজল আজ অন্য সোয়েটার পরে এসেছে। সর্দিতে কাবু বলেও মনে হচ্ছে না। উল্টে বেশ চনমনে ভাব। চুলটা ছেঁটেছে নাকি? হাতে একটা ঢাউস পেপার ব্যাগ। সেখান থেকে তেল লাগা একটা ছোট বাক্স উঁকি দিচ্ছে। ঠেসে ঠুসে স্লিপিং পায়জামাও ভরেছে। তার মানে চব্বিশ ঘন্টার প্ল্যান। পিনাকী আর মানসীর চোখের দিকে তাকাল না। সজল মানসীর হাতে তেল লাগা বাক্সটা ধরিয়ে দিয়ে বলল—"পেস্ট্রি খান? আমার কলিগ দিয়েছিল। আমি খাই না।"

মানসী বাক্স হাতে কিচেনের দিকে যেতে যেতে বলল—"ভালই হল। আমার কুকি ফুরিয়ে গেছে। কাল ব্রেকফাস্টে খাব।"

—"এখনই খান না। চা হবে তো একবার? আদা আছে? আদা চা লাগান।"

তিনজনে আদা চা খেয়ে বেরিয়ে গেল। ফরেস্ট হিলস থেকে "শের-এ-পাঞ্জাব" খুব দূরে নয়। মানসীকে রেস্তোরাঁর সামনে নামিয়ে ওরা গাড়ি পার্ক করে এল। ভেতরে ঢুকে দেখল মানসী কোণের দিকে একটা টেবিল নিয়ে বসে গেছে। পিনাকী ওর পাশে গিয়ে বসল।

সজল উল্টোদিকের চেয়ারে। ওয়েটার মেনু বুক ধরিয়ে দেওয়ার সময় ড্রিংকসের অর্ডার নিয়ে গেল। এটা ছোটখাট রেস্তোঁরা। অ্যালকোহলের পারমিট নেই। মানসী কোক নিতে যাচ্ছিল। সজল বলল—"থ্রি ম্যাঙ্গো লস্যি।"

—"সর্দির মধ্যে লস্যি।"

—"এ বেলা অনেক বেটার ফিল করছি। দুদিন যা ভুগিয়েছে।" কথাবার্তার ফাঁকে মানসীরও

মনে হল সজলকে আজ বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেখাচ্ছে। পিনাকীর সঙ্গে একঘেয়ে চাকরি আর আমেরিকার পলিটিক্সের গল্প না করে, হঠাৎ মন দিয়ে হিন্দি গান শুনছে। রেস্তোরাঁয় ক্যাসেটে গান হচ্ছিল। ম্যাঙ্গো শেষ হওয়ার মুখে সজল স্ট্র দিয়ে সড়াৎ করে আওয়াজ করল। ঠোঁটের হলুদ লস্যি চেটে নিয়ে বলল—"বাংলা গান-ফান দেয় না। সেদিন শালিমারে গিয়েছিলাম। হেমন্তর গান দিচ্ছিল। উত্তমের গান।"—বলেই হাসল।

ওয়েটার আসতে মানসী অর্ডার দেওয়ার জন্যে তৈরি হল। সজল বলল—"বউদি, হ্যাভ সাম গুড ডিশেস। হোয়াট-এভার ইউ লাইক! আজ আমার ট্রিট।"

—"তোমার ট্রিট আবার কি? আমরা তোমাকে খেতে নিয়ে এসেছি। মানসীর বদলে মোহিনীর পরোটা.....

পিনাকীর কথা শেষ হওয়ার আগেই সজল চোখ টিপে হাসল-"পিনাকীদা, আজ একটু মুডে আছি। আমাকেই খাওয়াতে দিন। রোজ তো বলি না।"

মানসী নড়ে চড়ে বসল—"গুড নিউজ মনে হচ্ছে?

কী হল? খবরটা দাও?"

সজল হাসি হাসি মুখে তাকাচ্ছে। মৃদু মৃদু পা নাচাচ্ছে। পিনাকী পাঁপড় খাচ্ছিল। তার কৌতূহল কম। জানে সজল হয়তো এমন একটা খবর দেবে, যা শুনে তাদের কিছুই মনে হবে না। এরকম আগেও হয়েছে। সুপার মার্কেটে গিয়েছিল মানসী। সঙ্গে সজল জুটে গেল। ফিরে এসে মুখে মৃদু মৃদু হাসি। চা নিয়ে বসে খুব ফুর্তি। খানিক পরে পিনাকীকে বলল—"বউদিকে জিজ্ঞেস করুন না আজ কী হয়েছে!"

মানসীকে জিজ্ঞেস করতে প্রথমে কিছুই বুঝতে পারছিল না। বলল—"কী আবার হবে? গ্রোসারি করলাম। চলে এলাম।"

সজল অপ্রস্তুত—"বাঃ আপনি খেয়াল করেননি?"

—"কী খেয়াল করার কথা বলছ? বুঝতেই তো পারছি না।"

—"যাক গে। তার মানে নোটিস করেননি। এনি ওয়ে....."

—"আরে তুমিই বল না কী হয়েছে?"

—"চেক আউট কাউন্টারের মেয়েটাকে দেখলেন না? ক্যাশ রেজিস্ট্রারের সামনের মেয়েটা নয়। যে পাশে দাঁড়িয়ে ব্যাগ ভরছিল, তার কথা বলছি....।"

—" সে আবার কী করল? সব জিনিস দেয়নি নাকি? তুমি দেখলে অথচ।"

—" আপনি তো পুরোটা শুনছেন না। জিনিস ভরবে না কেন? সব ভরেছে? আমার হাতেই তো ব্যাগগুলো তুলে দিচ্ছিল।"

পিনাকীই এবার অধৈর্য হল—"তুমি এত সময় নাও কেন বল তো? কী করেছে কী মেয়েটা?"

সজলের খুক খুক হাসি—" আমাকে লিড দিয়েছে।"

—"তার মানে?"

—"লিড দেওয়া বোঝেন না?"

পিনাকী না বোঝার ভান করল—"ওসব তোমাদের টার্ম। ঠিক ঠাক বুঝি না।"

সজল কাঁধ নাচাল— "আই থিংক শি লাইকড মি।"

— "রিয়েলি? হাউ ডু য়্যু নো?"

—"আমায় আগে চোখ মারল।"

পিনাকী হেসে উঠলেও মানসীর একদম বিশ্বাস হয়নি। সুপার মার্কেটের চেক-আউট কাউন্টারে মেয়েগুলো কী ব্যস্ত থাকে! চাকরির একটা কোড-অফ-কনডাক্ট নেই? কাস্টমারদের সঙ্গে ভদ্রতার বেশি একটা কথাই বলে না। তারা নাকি সজলকে লিড দিচ্ছে! এত বাজে বকে ছেলেটা! ঐ চুলের বোঝা আর সোয়েটার দেখে কোনও মেয়ে ধারে কাছে ঘেঁষবে?

পিনাকী জানে এরকম তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে সজল মাঝে মাঝেই গল্প বানায়। আজ আবার কিসের ফূর্তি কে জানে? শেষ পর্যন্ত পিনাকীই তাড়া দিল—"কী হল? ঘটনাটা শুনি।"

রেস্তোরাঁর দেওয়ালে টাঙানো ওমর খৈয়মের ছবি থেকে বিমুগ্ধ দৃষ্টি সরিয়ে এনে সজল শুরু করল—"ব্যাপারটা বেশ কমপ্লিকেটেড বুঝলেন। ঠিক কীভাবে যে এক্সপ্লেইন করব.... মানে, আসলে, একটা বিয়ের প্রোপোজাল এসেছে।"

—"কোথায় এখানেই ?"

—"না। দেশে। বাবার কাছে চিঠি এসেছে।"

মানসী ঠাট্টা করলো — তাতেই এত আনন্দ? মেয়েকে চেনো নাকি?

— না, শ্বশুরকে চিনি। আপনারাও চেনেন।

— কে বল তো? নাম কি?

— উত্তমকুমার।

মানসী বলল—"উঃ আবার গুল্‌গল্প আরম্ভ হল!

পিন্টু চটপট খেয়ে নিয়ে বাড়ি চল তো।"

খাবারদাবার এসে গিয়েছিল। সজলের কথা উড়িয়ে দিয়ে পিনাকীও ওকে খাওয়ার তাড়া দিল। কিন্তু সজলের গল্প সবে শুরু হয়েছে। সত্যি সত্যিই সোমা নামে একজনের সঙ্গে ওর বিয়ের সম্বন্ধ এসেছে, একথা কিছুতেই ওদের বোঝাতে পারছে না। শেষ পর্যন্ত সজল ওর বাবার চিঠি বের করে দেখাল। রেস্তোঁরার কম আলোয় পিনাকীর পড়তে অসুবিধে হচ্ছিল। মাথা ঝুঁকে দেখল। পড়ার চেষ্টা না করে সজলকে জিজ্ঞেস করল—"তার মানে সুপ্রিয়ার মেয়ে?"

—"বাঃ, উত্তমেরও। অ্যাডপটেড।"

মানসী হাসি চাপল—"কিন্তু সম্বন্ধটা করেছে কে? ওদের কোনও চিঠি নেই?"

—"আছে নিশ্চয়ই। আমাকে বাবা কিছু পাঠাননি। চিঠিটা দেখে বুঝেছেন না কোনও ইনটেরেস্ট নেই?" সজলের গলায় ক্ষোভ ধরা পড়ল।

সে রাতে সজলের লম্বা গল্প পিনাকীদের বাড়িতে গিয়ে শেষ হল। লিভিং রুমে বসে বসে অনেক রাত অবধি সজল সিগারেটের ছাই ঝাড়ল। পিনাকী ওর উত্তেজনা দেখে বুঝতে পারছিল ছেলেটা এখন উত্তমকুমারের জামাই হওয়ার জন্যে ক্ষেপে উঠেছে। উত্তমকুমার নিজে না লিখুন, ময়রা স্ট্রিট থেকেই নাকি সজলের বাবার কাছে চিঠি এসেছে। মানসীর জেরার মুখে পড়ে সজল অবশ্য স্বীকার করেছে—সজলের বাবাই খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। তার উত্তরে উত্তমকুমার না সুপ্রিয়া দেবী কার সেক্রেটারি যেন "সোমা" নামে তাঁদের মেয়ের জন্যে যোগাযোগ করেছেন।

মানসী ঠিক ধরেছিল। নিশ্চয়ই কাগজ দেখে সম্বন্ধ। সজল প্রিন্সটন থেকে মাস্টার্স করেছে। 'কন এডিশনে' ভাল চাকরি করে। বিয়ের বাজারে সুপাত্র নিশ্চয়ই। তবে, দেখার পরে সেই সোমা যে খুব মোহিত হবে; মনে হয় না।

কিন্তু ঘটনা বোধহয় অতদূরে এগোবে না। সজলের বাবা চিঠিতে লিখেছেন, এ সম্বন্ধ তাঁর উপযুক্ত মনে হচ্ছে না। ওঁরা মধ্যবিত্ত, রক্ষণশীল পরিবার। সিনেমার লোকজন, বিশেষ করে অত বিখ্যাত আর বড়লোক মানুষদের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো যায় না। তবে তাঁর বড় বউমা আর মেজ বউমার খুব ইচ্ছে দেখে সজলকে একবার লিখে জানাচ্ছেন। এর মধ্যে তিনি সজলের উপযুক্ত উচ্চ শিক্ষিতা পাত্রীর খোঁজ করছেন।

সজল হুশ করে ধোঁওয়া ছেড়ে বলল—"বুঝলেন পিনাকীদা, বাবাই বাগড়া দিচ্ছেন। আমি বুঝি না এরকম অ্যাটিট্যুড কেন হবে? সিনেমার লোকজন! যেন একটা আলাদা কাস্ট। তাদের মেয়েকে বউ করা যাবে না। এদিকে রোজ তুমি বিবেকানন্দ পড়ছ। গোলপার্কে লেকচার শুনতে যাচ্ছ। কী লাভ হচ্ছে?"

মানসী মাথা নাড়ল—"এসব স্টেটমেন্ট কোরো না। উনি ওঁর এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলেছেন। হয়তো দুটো ফ্যামিলির মধ্যে সেরকম মিল খুঁজে পাচ্ছেন না। সে জন্যেই হেসিটেড করছেন।"

—"হোয়াট ডিফারেন্স ডাজ ইট মেক? আপনি আমাকে বুঝিয়ে বলুন।"

—"আসলে কী জান, লাইফ স্টাইলটা একটা ফ্যাক্টর। ওপিনিয়ন, ভ্যালু সিসটেম, অনেক কিছুই পাল্টে দেয়।"

—"আমি ছ'বছর বাইরে আছি, ঐ মেয়ের সঙ্গে আমার লাইফ স্টাইল মিলবে না?"

—"আই ডাউট। তোমার সম্পর্কে যতটুকু বুঝি, তোমাদের অ্যাকাডেমিক ফ্যামিলি। মিডল ক্লাস ব্যাকগ্রাউন্ড। এদেশে আছ, তাও মাত্র কয়েকবছর। এত তাড়াতাড়ি জীবন সর্ম্পকে ধারণা বদলায় না সজল।"

—"ফাইন। কিন্তু প্রবলেমটা কোথায়?"

—"যে মেয়ে টোট্যাল গ্ল্যামার আর অ্যাফ্লুয়েন্সের মধ্যে বড় হয়েছে, তার সঙ্গে তোমার চিন্তা ভাবনা মিলবে কিনা তুমি জান?"

সজল যেন দমে গেল। আশা করেছিল মানসী বউদি উত্তমের জন্যেই ইনটেরেস্ট দেখাবে। ওর বাবার গোঁড়ামিকে সাপোর্ট করবে না। ওদের ভরসায় সজল অনেক কিছু ভেবে নিয়েছিল। সে জন্যেই বলেছিল—আজ একটু মুডে আছি। ইচ্ছে ছিল পিনাকীদাকে ধরে দুটো চিঠি লেখাবে। একটা বাবাকে, বেশ বুঝিয়ে শুনিয়ে, আর একটা উত্তমকুমারকে। কাজ হতই। পিনাকীদা পি এইচ ডি লোক। সিটি ইউনিভার্সিটির অ্যাসিসটেন্ট প্রফেসর। সে তো আর আজেবাজে কথা লিখবে না। চিঠি পেলে বাবাও যেমন ভেবে চিন্তে দেখতেন, উত্তমকুমারও হয়ত রাজি হয়ে যেতেন। আফটার অল মেয়ের বিয়েই তো? কিন্তু মানসী বউদি মিডল-ক্লাস মিডল-ক্লাস বলে যেভাবে ডিসকারেজ করল, এরপর আর চিঠি লেখার কথা বলা যায় না।

মাঝে ক'দিন সজলের খবর নেই। পিনাকীদের বাড়ির পার্টিতেও এল না। বলল, প্রিন্সটনে যাচ্ছে। মাস দেড়েক পরে আবার এসে হাজির। এবার উত্তমকুমারকে ভুলে গেছে। মাথায় আইনস্টাইন ঘুরছে। অ্যাস্ট্রো-ফিজিক্স নিয়ে আলোচনা শুরু করল। এ বিষয়টা ওকে খুব টানছে। কোনও দিন নিজের বাড়ি হলে রাতে ছাদে বসে টেলিস্কোপ দেখবে। পিনাকী জানে সজলের অ্যাস্ট্রো ফিজিক্স নিয়ে পড়াশোনা করার ইচ্ছে। প্রিন্সটন থেকে ফিরে এসে বলল—"ফিফটি ফাইভের আগে এলে আইনস্টাইনের সঙ্গে দেখা হয়ে যেত। খুব ডিপ্রাইভড লাগে জানেন! এমন একটা পিরিয়ডে জন্মলাম, কোনও জিনিয়াসকে দেখতে পেলাম না।"

মানসী হাসল—"হয়তো দেখেছিলে। আগের জন্মে। আইনস্টাইন ফিফটি ফাইভ-এ মারা গেছেন। তখন কি তুমি জন্মেছিলে?"

সজল অন্যমনস্কের মতো কিছু ভাবছিল। পিনাকী টি ভি বন্ধ করে দিয়ে বলল—"তোমার বিয়ের ব্যাপারটা কী হল?"

বাবা শেষ পর্যন্ত রাজি হলেন না?"

— "ও নিয়ে আর ভাবছি না। আচ্ছা বউদি, আপনি রি-বার্থ মানেন? ঐ যে বললেন আগের জন্মে আইনস্টাইনকে দেখেছিলাম।

কিন্তু আমি তো ফিফটি ফাইভের আগেই জন্মে গেছি। তাহলে কোন জন্মে দেখলাম?"

—"দূর! ঠাট্টা করছিলাম।"

—"আপনি হাত দেখায় বিশ্বাস করেন? তাহলে একটা মজার কথা বলব।"

—"একটু একটু বিশ্বাস করি। কেন? কী আবার মজার ঘটনা হল? তুমি কাউকে হাত দেখিয়েছ?"

সজল হাসতে লাগল। সোফার কুশন বগলে চেপে বসেছিল। মানসীর কথায় কুশন মুক্ত হয়ে হেলান দিয়ে বসল। হাসির গলায় উত্তর দিল—"এক জিপসি মহিলার কাছে গিয়েছিলাম। ফরচুন-টেলার।"

—"ইশ! ওরা একদম চোর। কত ডলার নিল?"

—"পাঁচ ডলারে অনেক কিছু বলেছে। আগের জন্ম থেকে নেকস্ট জন্ম পর্যন্ত। বিয়ের কথাও বলে দিল। এ জন্মেরটা মিলবে বলে মনে হচ্ছে না অবশ্য।"

পিনাকী নড়ে চড়ে বসল— " কেন? কী বলেছে?"

—" মহিলা ক্রিস্ট্যাল বল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বলল; আমার এ জন্মের বউ জলের ধারে থাকে। নাচ, গান জানে। আপনি কিছু হিনট পাচ্ছেন?"

—"জলের ধারে নাচ গান করে? এরকম পাত্রী কে হতে পারে? খুব কনফিউসিং।"

—"বউদি, আপনিও ধরতে পারছেন না। গেস করুন না।"

—"কী জানি বাবা? জলের ধারে সব সময় নাচছে....।"

—"আঃ জলের ধারে থাকে! নাচ, গানও জানে। এরকম মেয়ে হতে পারে না?"

— হ্যাঁ, হতে পারে। কিন্তু কে বল তো? তুমি কাকে ভাবছ?"

—"সোমা ছাড়া কে হবে বলুন? শুনলাম মুভিতে নামছে। নাচ না জানলে নেবে থোড়ি?"

পিনাকী, মানসী দুজনেই হেসে যাচ্ছে। সজল পারেও বটে। কিন্তু জলের ধার কোথায় পেল? জিজ্ঞেস করাতে সজল বলল—"ময়রা স্ট্রিট থেকে মিন্টো পার্ক কতটুকু? নাকি মিন্টো স্কোয়ার? ওখানে একটা পুকুর ছিল না? এনিওয়ে, গঙ্গার ধারও বেশ কাছেই।"

—"তার মানে, বিয়েটা হতে পারে বলছ?"

—"বললাম তো, প্রেডিকশনটা মিলবে না। সব তো আর মেলে না পিনাকীদা।"

সে বছর শীতের মুখে সজল নিউ ইর্য়ক ছেড়ে চলে গেল। এদিকে ওর আর ভাল লাগছিল না। "কন-এডিসনের" চাকরি ছেড়ে দিয়ে স্যানফ্রানসিসকোয় নতুন চাকরি নিল। ওক-ল্যান্ডে অ্যাপার্টমেন্ট নেওয়ার পরে নতুন ফোন নম্বর দিয়ে পিনাকীদের ফোন করেছিল। মাঝে মাঝেই খোঁজ খবর নিচ্ছিল। পিনাকীদের বন্ধু দেবজ্যোতি বার্কলে ইউনিভার্সিটিতে পড়ায়। সজল তার সঙ্গে আলাপ করে নিয়েছে।

ক্রমশ পিনাকীদের সঙ্গে সজলের যোগাযোগ কমে আসছিল। তিন হাজার মাইল দূরে বসে বছরে দু-চারবার ফোনেই যা কথা হয়। তাও মানসীরা ভুলে যায়। সজল নিজে থেকে খবর নেয়। এভাবেই একদিন ওর বিয়ের খবর দিল। ফ্রি-মন্টের এক বাঙালি ভদ্রলোকের দুঃসম্পর্কের শালীকে বিয়ে করেছে। মেয়েটি কানপুর থেকে নাচের প্রোগ্রাম করতে গিয়েছিল। ওদের নাচের ট্রুপ ফ্রি-মন্টে একটা ওয়ার্ক-শপ দিয়েছিল। তখনই সজলের সঙ্গে আলাপ। পরে ও অ্যাপ্রোচ করাতে মেয়েটির আত্মীয়রা ছোট্ট অনুষ্ঠান করে বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন। সজল তার নতুন বউ মহামায়ার সঙ্গে মানসীকে ফোনে আলাপ করিয়ে দিল।

সেদিন ফোন রেখেই মানসী পিনাকীকে বলেছিল—"অদ্ভুত কিন্তু! ওর সেই নাচ জানা মেয়ের সঙ্গেই বিয়ে হল! নাকি, সেটাই ওর মাথার ঢুকে গিয়েছিল? নয়তো হুট করে দেখল আর বিয়ে করে ফেলল?"

—"সজলের বাড়ির লোকেরা বোধহয় বিয়ের ব্যাপারে কিছুই করছিল না। শেষে ফরচুন-টেলারের কথা মিলিয়ে নিজেই বউ পেয়ে গেল। ভাল তো।"

—"আজকাল মহামায়া নাম-টাম শুনি না। ইউ পি-র দিকে-টিকে চলে বোধহয়। কথাতেও একটু অ্যাকসেন্ট আছে।"

—" ফরচুন-টেলারটা সজলকে সেই জলের ধারে নিয়ে গিয়ে ছাড়ল।"

—" তার মানে?"

— পিনাকী নাটকের ভঙ্গীতে বলে উঠল— "মানসী, ফ্রি-মন্ট থেকে সমুদ্র কতদূরে?"

—"সত্যি তো! পিন্টু, সজলের সব মিলে গেছে। খালি সোমার বদলে মহামায়া।"

সজল বলেছিল একবার বউকে নিয়ে এদিকে ঘুরে যাবে। বছর দুই কেটে গেল। ওদের আর আসা হল না। ক্রিসমাসে কার্ড আসে। মাঝে মাঝে ফোনে কথা হয়। ওরা সানকারলেসে বাড়ি কিনে চলে গেছে। দেবজ্যোতির কাছেও পিনাকীরা ওদের খবর পায়। মহামায়া নতুন বাড়িতে নাচের স্কুল করেছে। নিজে নানা জায়গায় কত্থকের প্রোগ্রাম করে। সজল আগের চাকরি ছেড়ে জিনস অ্যান্ড টেক-এ জয়েন করেছে।

একদিন সজলের ফোন এল। মানসী ধরেছিল। সেই এক অপ্রস্তুত গলায় বলেছিল—"ইশ, সজল, তুমি ঠিক মনে করে ফোন করো। অথচ আমাদেরই খোঁজ নেওয়া হয় না।"

—"আসলে সবাই তো ব্যস্ত। ও নিয়ে ভাববেন না। কথা হলেই হল। আপনারা কেমন আছেন?"

চলছে একরকম। তোমাদের খবর বল? দুজনেই খুব বিজি?"

—"দু'জনে না, তিনজনে। ফ্যামিলিতে অ্যাডিশন হয়েছে।"

মানসী খুশি হয়ে পিনাকীকে ডাকল—"পিন্টু, ঐ ফোনটা ধরো। সজলের ছেলে হয়েছে।"

পিনাকী ফোন ধরল—"আরে! কী ব্যাপার? গুড নিউজ শুনছি। কনগ্র্যাচুলেশনস!"

—"থ্যাংকস পিনাকীদা। কাল এত রাত হয়ে গেল। আপনাদের আর ফোন করতে পারলাম না।"

—" তোমার বউ ভাল আছে তো? বেবি কি জাস্ট একদিনের হল?"

—"এখন চব্বিশ ঘন্টা হয়নি। হি ইজ ডুইং ফাইন। খালি ঘুমোচ্ছে।"

মানসী অন্য ফোন থেকে প্রশ্ন করে যাচ্ছে—"সজল, নাম ঠিক করেছ? দু-একদিনের মধ্যেই দিতে হবে না?"

— "দুটো নাম ভেবেছি। প্রথমটা মায়া রাখতে দেবে না। পছন্দ হয়নি। দ্বিতীয়টায় রাজি হয়েছে।"

—"নাম দুটো শুনি।"

—"আমার ইচ্ছে ছিল সত্যেন রাখব।"

—"সত্যেন? তুমি আর নাম খুঁজে পেলে না! ঐটুকু বাচ্চার নাম সত্যেন?"

—"বৌদি, সত্যেন বোস কি বুড়ো হয়েই জন্মেছিলেন? আপনারা কেন এটা বলেন বুঝি না। আমি ওঁর নামে ছেলের নাম রাখতে চাইছি। তাহলে কি সত্যেনের বদলে বান্টি রাখব? ঐ নামগুলোর কোনও সিগনিফিকেন্স আছে?"

পিনাকী এতদিন বাদে সেই পুরনো সজলের কথা শুনছে। সায়েনটিস্ট সত্যেন বোসের ওপর প্রগাঢ় ভক্তি থেকে নিজের ছেলের নাম সত্যেন রাখতে চাইছে। সজল তো এরকমই। ও যে আইনস্টাইন বলেনি, এই যথেষ্ট। "অ্যালবার্ট সত্যেন" রাখলেও অবাক হওয়ার কিছু ছিল না। মানসী হেসে উত্তর দিল—"তুমি এ জন্মেই 'জিনিয়াস' দেখে যাবে সজল। আচ্ছা, এবার অন্য নামটা বল।"

— "বিমান।"

পিনাকী বলল—"তার চেয়ে মহাকাশ রাখ। তোমার অ্যাস্ট্রোফিজিক্স, অ্যাস্ট্রোনমি, অ্যাস্ট্রোলজি—সব ঢুকে যাবে। মহামায়ার ছেলে মহাকাশ।"

সজল হাসছিল—"মন্দ বলেননি! কিন্তু বিমান নামটা ভাল হবে না?"

মানসী উৎসাহ দিল— "খুব ভাল নাম। আমাদের বিমান বিহারী মজুমদার বিখ্যাত লোক ছিলেন।"

প্রায় পাঁচ বছর পরে স্যানফ্র্যানসিসকোয় গিয়ে সজলের সঙ্গে ওদের দেখা হল। পিনাকীরা হাওয়াই বেড়াতে গিয়েছিল। ফেরার পথে দু'দিন স্যানফ্র্যানসিসকোয় থাকল। এক সন্ধেয় দেবজ্যোতির বাড়ি, তার আগের দিন অনেক রাত পর্যন্ত সজলের সঙ্গে কাটাল। দু'দিনই তারা এসে হোটেল থেকে নিয়ে গিয়েছিল। পিনাকীরা হোটেলে উঠেছে বলে দেবজ্যোতি, সজল দু'জনেই মনঃক্ষুণ্ণ। সজল ভীষণ জোরাজুরি করেছিল দেখে পিনাকী কথা দিল এরপরের বার স্যানফ্র্যানসিসকোয় এলে ওর কাছে থাকবে। সানকারলোসের পাহাড়ী পথে গাড়ি চালাতে চালাতে সজল ঠাট্টার সুরে বলল—"যদি ততদিন বেঁচে থাকি। এত বছর পরে এলেন। তাও হোটেলে উঠলেন। এটা কোনও কথা হল পিনাকীদা?"

—"আর তুমি যে এত বছরে একবারও নিউ ইয়র্কের দিকে গেলে না? তোমার ফ্যামিলিকেই এখনও দেখলাম না।"

—"আজও কিন্তু দেখা হবে না। ওরা এখানে নেই। লস্ অ্যাঞ্জেলেস গেছে।"

—"কী আশ্চর্য! আগে বলবে তো? শুধু শুধু এত দূরে কেন যাচ্ছি তবে? তুমি তো হোটেলেই আমাদের সঙ্গে টাইম স্পেন্ড করতে পারতে?"

পিনাকীও অবাক— সত্যি! এত ড্রাইভ করার কোনও মানে হয়? আমরা ওদের জন্যেই তো যাচ্ছিলাম।"

—"বাঃ, আমার বাড়িটা দেখবেন না? জায়গাটা ভাল লাগবে বউদি। একদম পাহাড়ের গায়ে। মায়া নেই তো কি হয়েছে? অথেনটিক মেক্সিক্যান ফুড খাওয়াব।"

ওরা প্রায় পৌঁছে গেছে। সজল যাই বোঝাক, মানসী একটু নিরাশ হয়েছে। সজলের বউকে

দেখার ইচ্ছে ছিল। বাচ্চাটাকেও দেখা হল না। ওদের জন্যে জিনিসপত্র এনেছিল। সজলকেই দিয়ে যাবে। মানসীর শরীরটাও ক্লান্ত লাগছে। প্রায় তিন সপ্তাহ হল নিউ ইয়র্ক থেকে বেরিয়েছে। হাওয়াইতে গিয়ে পর্যন্ত সকাল থেকে মাঝরাত অবধি ট্যুর নেওয়া। এত ঘোরাঘুরির পর এখন আর গাড়িতে উঠতেও ইচ্ছে করছে না। অনায়াসে হোটেলে রিল্যাক্স করা যেত। সজলের যত অদ্ভুত কান্ড। তোর বউ, বাচ্চা বাড়িতে নেই, সেটা আগে বলতে কি ছিল? মানসী বুঝতে পারছে ও এখনও সেরকম ইমপালসের ওপরেই চলে। চুল-টুল ছেঁটে চেহারাটা ভদ্রস্থ হয়েছে ঠিকই। আগের চেয়ে অনেক স্মার্টও হয়েছে। কিন্তু ছেলেমানুষী ভাবটা যায়নি। যাবেও না কোনওদিন। এক একজন মানুষ এরকম থাকে।

পাহাড়ের ঢালে টিউডর স্টাইলের কাঠের বাড়ি। সামনের দিকে গাঢ় খয়েরী রং-এর কাঠের প্ল্যাংক বসান। বাকি তিনদিকে হালকা বার্নিশ করা সিডারের দেওয়ালে। বাইরে থেকে বাড়িটা ছোট দেখায়। ভেতরে বেসমেন্টে মহামায়ার নাচের স্কুল। উইক-এন্ডে ছাত্রীরা আসে। তবলারও ক্লাস খুলেছে। ডিভানের ওপর দু'জোড়া তবলা। হারমোনিয়াম, ক্যাসেট, ঘুঙুর।

পিনাকী জিজ্ঞেস করল—"এটা কি রেজিস্টার্ড স্কুল? রেসিডেনশিয়াল নেবারহুডে এভাবে স্কুল চালান যায়?"

—"চালাচ্ছে তো। পারমিট-ফারমিট কিছুই নেয়নি। বললে বলে কে জানতে পারছে? বাড়িগুলো দূরে দূরে বলে সুবিধে। নয়ত নেবাররা কমপ্লেইন করত।"

মানসী মহামায়ার ছবি দেখছিল। দেওয়ালে দু-তিনটে নাচের ছবি ঝুলছে। একটা ফ্যামিলি পিকচার। জরির পেশোয়াজ, চোস্ত, ভেস্ট আর ওড়নায় প্রফেশন্যাল ডান্সারদের মতোই লাগছে। কপালে টিকলি। নাকে টানা নথ। মেক-আপ থাকলেও মনে হয় সামনে থেকে দেখতে ভালই। লম্বা ছিপছিপে গড়ন। নাচের ছবিতে যত সুন্দরী মনে হচ্ছে, ফ্যামিলি পিকচারে ঠিক ততটা নয়। তবে চেহারায় চটক আছে। নাকে হীরে। সব ছবিতেই খুব গয়না পরেছে। আসল নকল বোঝা যায় না।

—"কেমন দেখছেন আমার বউকে?"

—"সুন্দর! মালা সিনহার মতো দেখতে।"

সজলের ছেলের ছবি দেখে মানসী ওর সঙ্গে মিল খুঁজে পেল। রোগা রোগা চেহারা। এক মাথা চুল। চোখ দুটো ঝকঝক করছে। পিনাকী বলল—"এই তোমার বিমান? বাবার মতো আকাশ-টাকাশ ভালবাসে?"

—"খুব ইনটেরেস্ট। আমার সঙ্গে কত রাত পর্যন্ত ওপরের টেরেসে বসে থাকে। টেলিস্কোপে মিল্কিওয়ে, গ্যালাক্সি, বিগ ডিপার দ্যাখে। নর্থস্টার চেনে।"

—"তবে তো বিমান নাম সার্থক হয়েছে। হয়তো বড় হয়ে অ্যাসট্রোনট হবে।"

মানসীর কথায় পিনাকী বলল—"হয়তো অ্যাসট্রোফিসিসিস্ট হবে। সজল যা হতে চেয়েছিল, বিমান তাই হবে।"

ছেলের ছবির দিকে একপলক চেয়ে থেকে সজল যেন নিজেকেই বলল—"হয়তো কিছুই হবে না। আমি শুধু ওকে আমার ইচ্ছেগুলো দিয়ে যেতে পারি।"

সজলের কথার মধ্যে যেন বিষণ্ণতার আভাস ছিল। পিনাকী উত্তর খুঁজে পেল না। ওর নিজের তো ছেলে মেয়ে নেই। ইচ্ছেগুলো দিয়ে যাওয়ার কথা এভাবে কখনও মনে আসেনি।

ওরা তিনজনের দোতলার টেরেসে বসেছিল। দূরে পাহাড়ের মাথার মেঘের আড়ালে চাঁদ

ভেসে চলেছে। বাগানে কোনও বড় গাছ নেই। বেড়ার পেছনে সামান্য ঢালু জমি। তারপরেই গভীর খাদ নেমে গেছে। পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে জমাট অন্ধকার। অনেক নীচে শহরকে বেড় দিয়ে সমুদ্রের কালো জল। ব্রিজের মাথায় আলোর মুকুট। এতদূর থেকেও অসংখ্য গাড়ির বিন্দু বিন্দু আলো দেখা যাচ্ছে।

সজল ইস্ট কোস্টের বন্ধু-বান্ধবদের খবর নিচ্ছিল। এখানকার চেনাশোনা লোকেদের খবর দিচ্ছিল। পিনাকী জানতে চাওয়ায় নিজের অফিসের কাজকর্মের কথা বলছিল। মানসী আর বসে থাকতে পারছিল না। ক্লান্তিতে প্রায় ঘুমিয়ে পড়ার অবস্থা। শেষে পিনাকী তাড়া দেওয়াতে সজল ওদের নিয়ে গাড়িতে উঠল।

হোটেলে পৌঁছে সজল গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াল। লবি পর্যন্ত ওদের সঙ্গে এল। এলিভেটরের সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল—"কাল দেবজ্যোতিদার বাড়িতে যাচ্ছেন? তাহলে আর দেখা হবে না।"

—"আবার নেকস্ট টাইম যখন আসব...."

—"আপনাদের কথা খুব মনে হয় পিনাকীদা। কত হেলপ করেছিলেন। দেশ থেকে এলাম। চাকরি পাই না। ডলার শেষ হয়ে যাচ্ছে। ঐ ডিফিকাল্ট টাইমে চাকরি জোগাড় করে দিয়েছিলেন। সেখান থেকে এখানে এসে পৌঁছেছি।"

পিনাকী সজলের হাত ঝাঁকিয়ে দিয়ে হাসল—"কথাগুলো অনেকবার বলেছ। আর নয়। কবে আমাদের কাছে আসছ বল?"

—"দেখি, কবে যাওয়া হয়?"

—"অরুণ, প্রসাদ, অঞ্জন সবাই তোমার কথা বলে। এবার গিয়ে গল্প করব।"

—"কী বলবেন? আমি কেমন আছি?"

—"ভালই তো আছ। ডুইং গুড জব। মেকিং গুড অ্যামাউন্ট অফ মানি। আরও যা যা ইচ্ছে ছিল, বাড়ির ছাদে টেলিস্কোপ।"

মানসী শেষ কথা জুড়ে দিল—"সুন্দর বাড়ি। সুন্দর ট্যালেন্টেড বউ। ছেলে তোমার সঙ্গে রাত জেগে চাঁদ, তারা দ্যাখে। সজল, ইউ শ্যুড বি হ্যাপি।"

এলিভেটর এসে গিয়েছিল। পিনাকী মুখ ফিরিয়ে বলল—"ভাল থেকো সজল। দেখা হবে।"

সজল হাত তুলল—"হ্যাভ্ এ সেফ্ ট্রিপ। পিনাকীদা, বউদি, গুডনাইট।"

ওরা এলিভেটরের ওপরে উঠে গেল।

পরদিন পিনাকীরা দেবজ্যোতির বাড়িতে গেল। দেবজ্যোতির ভাইরা নিউজার্সিতে থাকে। এ জন্যে ওদের সঙ্গে বছরে একবার-দু'বার দেখা হয়েই যায়। প্রত্যেক বছর বঙ্গ-সম্মেলনেও দেখা হয়। এবার হাতে সময় কম। তবু স্যানফ্র্যানসিসকোয় এসে পিনাকী দেবজ্যোতির খোঁজ করবে না, এ হয় না। মিত্র ইনস্টিটিউশন, প্রেসিডেন্সি সায়েন্স কলেজ, সম্পর্ক তো আজকের নয়। মাঝে এতগুলো বছর কেটে গেছে। দু'জনে থাকে আমেরিকার দু'প্রান্তে। তাও, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়নি। দেবজ্যেতির বউ মধুশ্রী ডাক্তার। মানসীর ওকে বেশ ভাল লাগে। হয়তো এ জন্যেও পিনাকী আর দেবজ্যোতির বন্ধুত্ব টিকে গেছে। পিনাকী মানসীকে ঠাট্টা করে বলে— তোমাদের ওয়েভ লেংথ না মিললে কবেই আমরা ছিটকে যেতাম।

সেদিন দেবজ্যোতির বাড়িতে আড্ডার ফাঁকে সজলের কথা উঠল। পিনাকীরা ওর বাড়িতে

গিয়েছিল শুনে মধুশ্রী জিজ্ঞেস করল—"সজলের বউকে কেমন লাগল?"

মানসী মাথা নেড়ে বলল—"দেখাই হল না। সে নাকি এল এ-তে প্রোগ্রাম করতে গেছে। বাচ্চাটাকেও দেখতে পেলাম না। আমরাও তো আগে থেকে জানাইনি।"

—"সজল একা আছে জানলে আজ চলে আসতে বলতাম। একবার ফোন করে দেখব?"

দেবজ্যোতির কথায় মধুশ্রী কেন যেন রাজি হল না। তারপরেও সজলের কথা উঠতে হঠাৎ বিরক্ত ভাব দেখিয়ে বলল—"ছেলেটার কোনও ব্যাকবোন নেই! আগে খারাপ লাগত। আজকাল রাগ হয়।"

মধুশ্রীর রাগ রাগ ভাব দেখে দেবজ্যোতি প্রসঙ্গটা ঘোরাতে চেষ্টা করল। মধুশ্রী তখনকার মতো চুপ করল। পরে কিচেনে খাবার গরম করার সময় মানসীকে একা পেয়ে অনেক কথা বলে গেল। মানসীর ঠিক বিশ্বাস হচ্ছিল না। মধুশ্রী বলছে—সজলের বাড়িতে থেকেই তার বউ আসিফ নামে এক তবলচির সঙ্গে লিভ-টুগেদার করে। লোকটা মহমায়ার নাচের স্কুলে আর ওর প্রোগ্রামের সঙ্গে বাজায়। পাকিস্তানের ছেলে। আগে সজলদের বেসমেন্টে থাকত। এখন মহমায়ার সঙ্গে ওপরের বেডরুমে শোয়। বাইরের লোকে এত কথা জানল কী করে বলাতে মধুশ্রী কাঁধ ঝাঁকাল—"বিশ্বাস না হয়, সাহস করে সজলকেই জিজ্ঞেস করো! ও তো শুনলাম মহামায়ার সেই জামাইবাবু না কে, তার সঙ্গে দেখা করেছিল। এক বাড়িতে থেকে পুট-আপ করা যায়? বলো?"

—"পুট-আপ করছেই বা কেন? ওদের মুভ-আউট করে যেতে বলুক। নিজে ছেলের কাস্টডি নিক। এভাবে বিয়ে টিকিয়ে রাখার দরকার কী?"

মধুশ্রী ভুরু কুঁচকে বলল—"বুঝি না। ছেলেটা অদ্ভুত কিন্তু! মহামায়া নাকি চলে যেতে চেয়েছিল। সজলই থাকতে বলেছে! ওর ভয়, মহামায়া বিমানকে নিয়ে চলে যাবে। আসিফের তেমন পয়সাকড়িও নেই। কোথায় থাকবে কীভাবে সংসার চালাবে, সেই অবস্থার মধ্যে সজল ওর ছেলেকে ছাড়তে পারবে না।"

—"মানুষের কত প্রবলেম! বাইরে থেকে বোঝাও যায় না। কাল অতক্ষণ সজলের সঙ্গে থাকলাম, কিছু বুঝতে দিল না। আমাদের তো বলতে পারত মধুশ্রী? এত পিনাকীদা পিনাকীদা করে, অথচ....।"

—"হয়তো ভেবেছে তোমরাও জান। কিছু জিজ্ঞেস করেনি বলে নিজে থেকে তুলতে পারেনি। সেপারেশন হয়ে যেত, সে আলাদা কথা। এখানে সিচুয়েশনটাও অন্যরকম না?"

নিউইয়র্কে ফিরে এসে পিনাকী সজলকে ফোন করল। রিং হয়ে যাওয়ার পর আনসারিং মেশিন মেসেজ রেখে দিল। তারপরেও ক'দিন সজলের ফোন এল না। পিনাকী বুঝতে পারছিল, কিছু একটা ঘটেছে। বোধহয় সজলই অন্য কোথাও চলে গেছে। ফোন করলে কল-ব্যাক করবে না, এরকম তো হয় না। মানসীর কাছে কথাগুলো শোনার পর থেকে মনটা খারাপ হয়ে আছে। এবার সানকারলোস গিয়েও লক্ষ করেছিল সজলের যেন আর আগের মতো উচ্ছ্বাস নেই। হতে পারে বয়স একটা ফ্যাক্টর। চিরকাল মানুষ একরকম থাকে না। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছ্বাস কমে আসে, উত্তেজনা থিতিয়ে যায়। কিন্তু সজলের মধ্যে সেই গাম্ভীর্য নয়, যেন এক উদাসীন বিষণ্ণতার ছায়া দেখেছে পিনাকী। নিজের স্ত্রী সম্পর্কে প্রায় নীরব। তবু, এত যে অশান্তির মধ্যে আছে বুঝতে দেয়নি। মানসীর একটু অভিমান হয়েছে। এক সময় সজল প্রায় বাড়ির লোকের মতোই হয়ে উঠেছিল। এবারেও কতখানি সময় এক সঙ্গে কাটাল। এমন নয় যে

মহামায়ার কথা ওঠেনি। সে যাক, পিনাকী তার জন্যে নিজেদের দূরের লোক বলে ভাবে না। আসলে, এইসব সময়ে কার যে কী ভূমিকা থাকে, অথবা কার কাছে মানুষের কী প্রত্যাশা থাকে, পিনাকী ভাল বুঝে উঠতে পারে না। সজলের লজ্জা, অসম্মান, যদি বা সে অনুমান করতে পারে তার দুঃখকে অনুভব করতে পারে না। মানুষের জীবন সিফিফাসের মতো। একাই নিজের বুকের পাথর বয়ে নিয়ে যায়।

ক্রিসমাসে সজলের কার্ড এল না। জানুয়ারির শেষে দেবজ্যোতি ফোন করল। দু'দিন আগে সজল মারা গেছে। পিনাকীর বিশ্বাসই হচ্ছিল না। ক'মাস আগে দেখে এল! কোনও অসুখ বিসুখের খবরও তো পায়নি। হঠাৎ কী করে মারা গেল? দেবজ্যেতি যা বলল সজলের মৃত্যুও অদ্ভুত। ওর বউ সে সময় বাড়িতে ছিল না। ফিরে এসে অনেকক্ষণ পর্যন্ত সজলকে ঘুমোতে দেখে ডেকে দেওয়ার চেষ্টা করছিল। সাড়া না পেয়ে, ভয় পেয়ে অ্যাম্বুলেন্স ডেকেছে। প্যারামেডিকস এসে দেখেছে সজল বেঁচে নেই। অনেকক্ষণ আগেই মারা গেছে। বোধহয় কনজেসটিভ হার্ট ফেলিয়্যর। করোনারের রিপোর্ট না এলে জানা যাবে না। দেবজ্যোতিরা মহামায়ার ফোন পেয়ে চলে গিয়েছিল। কিন্তু বাড়িতে ঢুকতে পারেনি। আন-ন্যাচরাল ডেথ সন্দেহ করে পুলিস ইনভেস্টিগেশনের জন্যে বাড়ি বন্ধ রেখেছে। মহামায়া ছেলেকে নিয়ে অন্য বাড়িতে আছে। সজলের অটপসী হয়ে গেছে। কাল ফিউনার‍্যাল।

পিনাকী জিজ্ঞেস করেছিল—"তোর কী মনে হয় আমার যাওয়া উচিত? কী করব বল ত? এত তাড়াতাড়ি কি পৌঁছতে পারব?"

—"কী করবি এসে? সজলের ফ্যামিলির জন্যে এ সময়ে যতটা সাপোর্ট দেওয়া যায়, সকলেই দিচ্ছে। অ্যাটলিস্ট কিছুদিন পর্যন্ত চেষ্টা করব। তারপর দেখা যাক ওর বউ কী ডিসাইড করে।"

—"খুব স্যাড ব্যাপার দেবু! দেশে ওর মা এখনও বেঁচে আছেন।"

পিনাকীরা ফ্লোরিস্টের দোকানে ফোন করে সানকারলোসে ফুল পাঠানোর ব্যবস্থা করল। ফুল সোজা ফিউনার‍্যাল হোমে পাঠাতে বলেছে। পিনাকীরা ফিউনার‍্যাল হোমের নাম, ঠিকানা কিছুই জানে না। কোথায় পাঠাতে বলবে?

সজলের মৃত্যু নিয়ে এখানেও আলোচনা শুরু হয়েছে। পুরনো বন্ধু-বান্ধবরা নানারকম সন্দেহ করছে। ক্যালিফোর্নিয়া থেকে চেনাশোনার সূত্রে খবর আসছে। করোনারের রিপোর্ট অনুযায়ী মহামায়া সজলের অফিসের লোকেদের জানিয়েছে হার্ট ফেলিয়্যর। কিন্তু ও আর আসিফ ছাড়া কেউ রিপোর্ট দ্যাখেনি। যদি আত্মহত্যা হয়ে থাকে, করোনারের রিপোর্টে থাকবে। কিন্তু ইমিডিয়েট ফ্যামিলি ছাড়া কেউ জানতে পারবে না। সে সম্ভাবনা থেকেই যাচ্ছে। সজলের ছেলে ঐ সপ্তাহে বয় স্কাউট ট্রিপে গিয়েছিল। তার পক্ষেও কিছু জানা সম্ভব নয়। এমনও শোনা যাচ্ছে, মহামায়া আর আসিফ ওকে অনেকদিন ধরে স্লো-পয়জনিং করছিল। সায়নাইড, আর্সেনিক কিছু একটা দিয়েছে। কোথা থেকে যোগাড় করেছে সেটাই রহস্য। মানসী শুনেছে স্লো আর্সেনিক পয়জনিং-এ শেষকালে হার্ট-ফেলিয়্যর -এর সিম্পটম হতে পারে। হয়তো সবই সন্দেহ। প্রমাণ তো নেই। মানসীর মনে হয় না মহামায়া এত নিষ্ঠুর হতে পারে। বিষয় সম্পত্তির জন্যেই হোক, কিংবা সজলের কাছ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যেই হোক, এভাবে ঠান্ডা মাথায় মানুষ খুন করা সম্ভব?

পুরনো সম্পর্কের একটা টান থাকে। এতদিনের পরেও সজলের কথা ভাবলে মানসীর বড়

দুঃখ হয়। একদিন ও পিনাকীকে বলল—"আমরা সবাই যেন ওকে টেকন-ফর গ্র্যান্টেড ভেবেছিলাম। নিজের আগ্রহে সম্পর্ক গড়েছিল। নিজের চেষ্টাতেই ধরে রেখেছিল। যখন সজলের ফোন এল না, কার্ড এল না, আমরা তো সেভাবে খোঁজ নিলাম না?"

—"অথচ সজল ভাবত আমরা ওর জন্যে কত চিন্তা করি। তোমার মনে আছে মানসী, ও স্যানফ্র্যানসিসকোর আর্থ-কোয়েকের পরে পাবলিক-বুথ থেকে ফোন করল? কোথায় আমরা ওর খবর নেব, সজলই আগে আমাদের নিশ্চিত করতে চাইল।"

মানসীর সব মনে আছে। সজল যখন এখানেই ছিল, ও কত সময় বিরক্ত হয়েছে। উপেক্ষা করেছে। সজল কি বুঝতে পারত না? তবু, হাসি মুখে এসে উপস্থিত হত। আসলে ও রিজেকশনের ব্যাপারটা মানতেই চাইত না। হয়তো সব অপমান, অবহেলা সহ্য হয়ে গিয়েছিল। সংসার ভেঙে যাচ্ছে জেনেও মহামায়াকে ছেড়ে যেতে চায়নি। ওর আশা ছিল ভাঙা সম্পর্ক আবার জোড়া লাগবে? কী যে ঘটেছিল, কিছুই তো জানা গেল না। চলে আসার দিন কতক্ষণ পর্যন্ত হোটেলের লবিতে দাঁড়িয়েছিল। এলিভেটরের দরজা বন্ধ হওয়ার মুহূর্তে সজলের সেই বিষণ্ণ হাসি। ও কি জানত আর কখনও দেখা হবে না?

পিনাকী আর মানসী মাঝে মাঝে সজলের পুরনো গল্পগুলো করে। যারা সজলকে চিনত, তারাও যোগ দেয়। উত্তমকুমারের জামাই হতে চাওয়ার গল্প, আইনস্টাইনের সঙ্গে দেখা না হওয়ার গল্প, ফরচুন-টেলারের ভবিষ্যৎবাণী, সজলের চীনে ছাত্রদের ওপর রাগ, "চেরা-চোখ মিচকেগুলোকে" আমেরিকা থেকে চায়নায় মেরে তাড়ানোর বাসনা...সজলের গল্পের শেষ ছিল না। ওর কলেজের বন্ধু প্রসাদ বলে—"সজল সব চীনেকে কিন্তু ফেরৎ পাঠাতে চায়নি। বলেছিল শুধু শেফগুলোকে রেখে বাকি সব্বাইকে ভাগিয়ে দেওয়া উচিত।"

পিনাকীর মনে পড়ে অ্যালবার্ট সত্যেন। নাকি সত্যেন্দ্রনাথ? সজল প্রথমে কী যেন নাম ভেবেছিল?......বিমান এখন কী পড়ছে? টেলিস্কোপে চোখ রেখে কে ওকে রাতের আকাশ, ছায়াপথ, কালপুরুষ, সপ্তর্ষিমন্ডল চিনিয়ে দেয়? হকিঙ্গের কথা বলে? সজল বলেছিল—আমি শুধু বিমানকে আমার ইচ্ছেগুলো দিয়ে যেতে পারি। পিনাকী সজলের অপূর্ণ ইচ্ছেগুলোর কথা ভাবে।

সজলের বেঁচে থাকার গল্পগুলো যখন পুরনো হয়ে আসছে, সেই সময় হঠাৎই একদিন নতুন গল্প যোগ হল। মানসীই আবিষ্কার করল। "ইন্ডিয়া ট্রিবিউন" কাগজে কয়েক সপ্তাহ ধরে পর পর চিঠি বেরুচ্ছিল। কয়েকজন লোক তাদের অলৌকিক অভিজ্ঞতা নিয়ে লিখছিল।"ইন্ডিয়া ট্রিবিউন" চিঠিগুলো কেটে ছেঁটে ছাপিয়ে দিচ্ছিল। সেখানেই মানসীর চোখে পড়ল ক্যালিফোর্নিয়ার ম্যানহোসে থেকে রাজেশ্বরী রঙ্গরাজন নামে একজন চিঠি লিখেছেন। চিঠিটা বাংলা করলে এরকম দাঁড়ায়—আমার দু'টি ছোট মেয়েকে এই অঞ্চলেরই একটি নাচের স্কুলে দিয়েছিলাম। ইন্ডিয়ান টিচারের বাড়িতে তাঁর নিজস্ব স্কুল। আরও অনেক ছাত্রী ছিল। আমরা প্রত্যেক উইক-এন্ডে সব মায়েরা ড্রাইভ করতাম না। একেক শনি-রবিবার দু-তিনজন মা কার-পুল করে মেয়েদের নিয়ে যেতাম। নাচের টিচারেব বাড়িতেই ক্লাস হত বলে তাঁর স্বামীর সঙ্গেও মাঝে মাঝে দেখা হত। তিনি খুব ভদ্র মানুষ ছিলেন। ছোটদের পছন্দ করতেন। আমার মেয়েরা তাঁর সঙ্গে টেলিসকোপ দেখে খুব আশ্চর্য হয়েছিল। মাঝে একটা উইক-এন্ডে নাচের ক্লাস ক্যানসেলড হয়ে গেল। কারণটা জানতে পারিনি। শুধু আমাদের বন্ধু মালিনী ভার্গবের ফোনে কেউ মেসেজ রেখে দিয়েছিল। ঐ উইক-এন্ডে কেউই যাইনি। পরের উইক-এন্ডে আমার গাড়ি

চালানোর দিন। ভীষণ বৃষ্টি হচ্ছিল। কাছাকাছি শহর থেকে আরও তিনটি মেয়েকে তুলে নিয়ে নাচের স্কুলের দিকে যাচ্ছিলাম। পাহাড়ী রাস্তা। সাবধানে চালাতে হচ্ছিল। ভাবছিলাম এত দুর্যোগের মধ্যে ক্লাস হবে তো?

নাচের স্কুলে পৌঁছে দেখলাম ড্রাইভ-ওয়ে কিংবা আশে পাশে কোনও গাড়ি নেই। তার মানে অন্য দু'জন মা তাদের মেয়েদের নিয়ে এসে পৌঁছয়নি। নাচের টিচারের গাড়ি তো গ্যারাজে থাকে। বৃষ্টির মধ্যেই মেয়েদের নিয়ে নামলাম। মেয়েরা দৌড়ে গিয়ে ডোর-বেল বাজাল। কেউ খুলছে না। ছাতার নীচেও মেয়েগুলো ভিজে যাচ্ছে। তখনই আর একটা গাড়ি এল। পুষ্পা অরোরা মেয়েদের নিয়ে এসেছে। তারাও ভিজতে ভিজতে দৌড়ে এল। আবার ডোর-বেল বাজালাম। ছোট ছোট মেয়েদের নিয়ে ভিজে চান করে যাচ্ছি। প্রচন্ড হাওয়ার দাপটে ছাতা উল্টে যাচ্ছে। যেভাবে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, যে কোনও মুহূর্তে বাজ পড়াতে পারে। আমরা আর একবার ডোর-বেল বাজাতে যাচ্ছি, হঠাৎ দরজাটা খুলে গেল। প্রথমে কাউকে দেখতে পাইনি। মেয়েরা হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকে গিয়েছিল। আমি আর পুষ্পা ভেতরে ঢুকে রেইনকোট আর জুতো খোলার আগে দরজাটা বন্ধ করে দিলাম। সে সময় এক মুহূর্তের জন্যেই ঐ ভদ্রলোককে দেখতে পেলাম। মনে হল পাশের ঘরে চলে গেলেন। কিন্তু আজ একটাও কথা বললেন না দেখে একটু অবাক লাগল। আমরা আর দাঁড়িয়ে না থেকে ছাতা, রেইনকোট, জুতো সব কিছু ওপরে রেখে বেসমেন্টে নেমে গেলাম।

নীচে শুধু বাচ্চারা অপেক্ষা করছিল। নাচের টিচার,তবলা প্লেয়ার কেউ নেই। বুঝতে পারছিলাম না ওঁরা অন্য ফ্লোরে আছেন, নাকি বাড়িতেই নেই? এরকম কখনও হয়নি। ভদ্রমহিলা খুবই রেসপনসিবল ধরনের। দু'জন মেয়েকে ওপরে পাঠালাম। তারা কাউকে খুঁজে পেল না। এমনকি ভদ্রলোককেও দেখতে পায়নি। তিনিও কি তাহলে বেরিয়ে গেলেন? আমাদের দরজা খুলে দেওয়ার জন্যেই বাড়িতে ছিলেন হয়তো। হতে পারে টিচার কোনও কাজে বেরিয়েছে। বৃষ্টির জন্যে ফিরতে দেরি হচ্ছে।

আমরা অপেক্ষা করছিলাম। হঠাৎ ওপরে দরজা খোলার শব্দ হল। মেয়েরা দৌড়ে ওপরে যেতেই টিচারের গলা শুনলাম। উনি তবলার লোকটির সঙ্গে তাড়াতাড়ি বেসমেন্ট নেমে এলেন। বাড়ির ভেতরে আমাদের দেখে খুবই অবাক হয়ে গেছেন। ওঁরা বাজারে গিয়েছিলেন। ফেরার পর বন্ধ বাড়ির সামনে চেনা দুটো গাড়ি দেখে ভাবছিলেন আমরা কোথায় গেছি। চাবি খুলে বাড়ি ঢুকে আরও অবাক। আমরা কী করে ভেতরে এলাম, ওঁরা বুঝতেই পারছেন না। যখন শুনলেন ওঁর স্বামীই দরজা খুলে দিয়েছেন, মহিলা অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে থাকলেন। মনে হল সেই দৃষ্টির মধ্যে শুধু অবিশ্বাস নয়,ভয়ও মিশে আছে। তবলা প্লেয়ার কিছু একটা জিজ্ঞেস করাতে ছোট মেয়েরাও বলে উঠস— আংকেলই তাদের দরজা খুলে দিয়েছিলেন? ওরা যখন বেসমেন্টে নেমে যাচ্ছিল, তখনও উনি দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিলেন। সবাই দেখেছে।

টিচার আর ঐ লোকটি পরস্পরের দিকে তাকালেন? তাঁদের মুখ ভয়ে বির্বণ দেখাচ্ছিল। মহিলা জিজ্ঞেস করলেন, আমরা কিছু শুনেছি কিনা। খবরটা পেয়েছি কিনা। ওঁর স্বামী কয়েকদিন আগে মারা গেছেন। হার্ট-অ্যাটাক হয়েছিল। শুনে আমরা স্তম্ভিত। তাহলে কে আমাদের দরজা খুলে দিলেন? স্পষ্ট তো ঐ ভদ্রলোককেই দেখলাম। শুধু আমরা মায়েরা নয়, এতগুলো মেয়ে তাঁকে দরজার পাশে দেখেছে। এক ঝলক হলেও সবাই ভুল দেখলাম?

পরে এই ঘটনার ব্যাখ্যা খোঁজার চেষ্টা করেছি। আমার বিশ্বাস ঐ বাড়িতে সেদিন লোকটির

আত্মা সত্যিই এসেছিলেন। প্রচন্ড ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে ছোট ছোট মেয়েরা বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। দুর্যোগ দেখে ভয় পাচ্ছে। বাড়িটার ভেতরে ঢুকতে চাইছে। এই অবস্থায় মৃত লোকটির আত্মা শরীর ধারণ করেছিলেন। আমাদের সাহায্য করেই চলে গেছেন। তাই এক মুহূর্ত পরে আর দেখতে পাইনি। জানি না, আরও কিছু ঘটেছে কিনা। নাচের স্কুল বন্ধ হয়ে গেছে। ভদ্রমহিলা বাড়ি বিক্রি করে চলে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। চিঠিতে ওঁদের পরিচয় প্রকাশ করছি না।

শেষ করার আগে রাজেশ্বরী রঙ্গরাজন লিখছেন—আগে এ ধরনের গল্প সহজে বিশ্বাস হত না। ভাবতাম মানুষের মনের ভুল। মৃত মানুষ সম্পর্কে ভয় আর কল্পনা থেকে দৃষ্টিবিভ্রম হতে পারে। কিন্তু ঐ দিনের অভিজ্ঞতার পরে ধারণা বদলে যাচ্ছে। ভদ্রলোক যে হঠাৎ মারা গেছেন, আমরা তা জানতাম না। আগে থেকে ভয় পাওয়ার কথাই ওঠে না। অথচ ঐ দুর্যোগের দিনে তাঁকে স্পষ্ট দেখলাম। বন্ধ বাড়ির দরজা খুলে গেল। এর একটাই ব্যাখ্যা। প্রেতাত্মার অস্তিত্ব বলে হয়তো কিছু আছে। যাঁরা প্রেতাত্মা দেখেছেন বলে লিখেছেন তাঁদের মতো আমিও বিশ্বাস করি আত্মার দেখা পাওয়া অসম্ভব নয়।

রাজেশ্বরী রঙ্গরাজনের চিঠি পড়ে মানসীর রীতিমতো সন্দেহ হল। মহিলা কার কথা লিখছেন? সজলের কথা নয় তো? নাম, ধাম না থাকলেও বেশ বোঝা যাচ্ছে ম্যানহোসের কাছাকাছি কোনও জায়গার ঘটনা। বাড়িতে নাচের স্কুল। বউ নাচ শেখায়। বর হঠাৎ করে মারা গেল। সবই তো মিলে যাচ্ছে। তবলচি মানে নিশ্চয়ই সেই আসিফ? সবচেয়ে অবাক লাগছে এ ভদ্রলোকও টেলিস্কোপ দেখতেন। বাচ্চাদের দেখাতেন। সজল ছাড়া আর কে হবে? মহিলা কী করে এত কথা বানিয়ে লিখবেন?

মানসী পিনাকীকে 'ইন্ডিয়া ট্রিবিউন"-এর লেখাটা দেখাল। ওর ধারণা নিশ্চয়ই এরকম কিছু ঘটেছিল। সজলের মৃত্যু তো স্বাভাবিক নয়। এই কথাই পিনাকীকে বোঝানোর চেষ্টা করছিল। পিনাকী চিঠিটা পড়ার পর অবিশ্বাসের গলায় মন্তব্য করল—" শেষ পর্যন্ত ওর ভূত হওয়াটাই বাকি ছিল! সজল দেখছি মরে গিয়েও গল্পের সাপ্লাই দিয়ে যাচ্ছে!"

মানসী বিরক্ত হল—"ঠাট্টা করার কী আছে? তুমি বিশ্বাস কর না মানেই আর কারুর যে এক্সপিরিয়েন্স হতে পারে না, তা তো নয়?"

—" হতে পারে। কিন্তু একটা চেনা ছেলে ভূত হয়ে ঘুরছে, আর আমরা উইক-এন্ডে সেই গল্প করে বেড়াচ্ছি, জাস্ট তোমাকেই বলেছি।

ভূত ভূত করছ কেন? অতৃপ্ত আত্মার কথা শোনা যায় না? সজল যা কষ্ট পেয়ে গেছে...।"

পিনাকী কাগজটা রেখে দিয়ে বলল—"বললাম তো, সবই হতে পারে। কিন্তু চেনা লোককে যখন মানুষ ভয় পেতে আরম্ভ করে, সেটা দুঃখের না?"

—"আমি মোটেই ভয় পাইনি। এত বাজে কথা বল! সামান্য একটা চিঠি নিয়ে তর্ক শুরু হয়ে গেল!"

মানসী রেগে যাচ্ছে বুঝে পিনাকী আর কথা বাড়াল না। আসলে মানসীর যে খুব ভয়-টয় আছে তা নয়। কিন্তু এ ধরনের গল্প-টল্প বলার ব্যাপারে ভীষণ উৎসাহ। পিনাকী খেয়াল করে দেখেছে গত দু-চার বছরে বেশ ক'জন বাঙালি মরে ভূত হয়ে গেছে। তার মধ্যে অমৃতা কুন্ডুর ভূত সবচেয়ে অ্যাকটিভ। অনেকবার দেখা দিয়েছে। অমৃতা কুন্ডুর ফিউনারাল থেকে ফিরে অবধি অন্তত চারজন মহিলা তাকে জানলার বাইরে ভেসে উঠতে দেখেছে। নিরবলম্ব বায়ুভূক হয়ে সে উঁকি মারছে। অমৃতা ভেসে ভেসে কোথায় না গেছে? মারা গেল ওয়েস্টারে। পিয়ালী

জোয়ারদার তাকে নিউইয়র্কের এলমহার্স্ট হাসপাতালের দশতলার জানলার ওপাশে বসে থাকতে দেখল। আগের দিন পিয়ালীর গলব্লাডার সার্জারি হয়েছে। অমৃতা কুন্ডুর ফিউনার্যালে যেতে পারেনি। এমন কিছু বন্ধুও ছিল না। কিন্তু অমৃতা নিজে এসে দেখা দিয়ে গেল। পিয়ালী আঁতকে উঠেছিল। বেল টিপে দিতে নার্স এসে পড়ল। ততক্ষণে অমৃতার ভূত জানলা ছেড়ে পালিয়েছে।

মানসীর বন্ধু দীপ্তি সাহার গল্প আরও সাংঘাতিক। দীপ্তি সাহা কবি। সমানে কবিতা লেখে। দীপ্তি শুনেছিল অমৃতা বেঁচে থাকতে ভীষণ অসুখী ছিল। বরের কাছে দুর্ব্যবহার পেয়ে ডোমেস্টিক ভায়লেন্সের চার্জ আনতে গিয়েও আনেনি। কিন্তু মারা যাওয়ার পর প্রতিবাদ করল। কবি দীপ্তি সাহা বাগানের আবছা কুয়াশার আড়ালে অমৃতাকে কাঁদতে দেখেছিল। যেন কিছু বলতে চাইছিল। অদৃশ্য পেন হাতে নিয়ে অমৃতার আত্মা কেবলই লিখে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। দীপ্তি সাহা ভয় পেলেও ইঙ্গিত বুঝতে ভুল করেনি। "ছায়ার বেদনা" নামে কবিতা লিখে ফেলেছে।

মানসী প্রত্যেকটা গল্প বিশ্বাস করেছিল। পিনাকী জানে আজ কিছু না বললে ঐ সজলের গল্প বলার জন্যেই মানসী অন্তত দশটা লং ডিসটেন্স ফোন করত। সত্যি মিথ্যে জানার আগে মধুশ্রীকে ফোন করত। ঐ রঙ্গরাজন না কে, তাকে তো ধরা মুশকিল। তবু মধুশ্রী ধরার চেষ্টা করতো। সজল ভূত হয়েছে কিনা জানার জন্যে মানসী আর মধুশ্রীর উৎসাহ কল্পনা করেই পিনাকী মানসীকে দমিয়ে দিয়েছে। যে মানুষটা চলে গেছে, তাকে নিয়ে ভয় পাওয়া, ভয় দেখানো, হাসাহাসি—গোটা ব্যাপারটাই পিনাকীর কাছে এক ধরনের অজ্ঞতা আর নিষ্ঠুরতা বলে মনে হয়।

মানসী কিন্তু আর কোনও কথা তুলল না। চিরকাল লক্ষ করেছে সজলের সম্পর্কে পিনাকী কোনও বাজে কথা পছন্দ করত না। বোধহয় ওর পাগলাটে স্বভাব আর সহজ ব্যবহারের জন্যেই কেমন যেন টান অনুভব করত। হতে পারে, সে জন্যে পিনাকীর এসব কথা শুনতেও ভাল লাগছে না। তাহলেও, এত রাগের কী আছে? ঐ ঘটনা নিয়ে মানসী তো আর লোকেদের কাছে ভূতের গল্প বলতে যায়নি। পরে হয়তো কয়েকজনকে বলত। কিন্তু পিনাকী বিরক্ত হয়েছে বুঝে কাউকে কিছুই বলবে না ঠিক করল।

অথচ মানসী ঘটনাটা ভুলতে পারছিল না। পিনাকী কোপেনহেগেনে কনফারেন্সে গেল। বাড়িতে মানসী একা। সে সময় হঠাৎ হঠাৎ মনে হত যদি সত্যিই কখনও সজলকে দেখতে পায়? মানসী কি ভয় পাবে? আশ্চর্য। রাতে একা শুয়ে শুয়ে এই চিন্তা থেকেও ওর ভয়ের অনুভূতি হত না। মানসী যেন বুঝে গিয়েছিল ওদের কাছে সজল কখনও আসবে না। কোনওদিন ওকে বলার সুযোগ হবে না—তোমার এত দুঃখ ছিল জেনেও আমরা তার খবর নিইনি সজল। কখনও জানতে চাইনি তুমি কেমন আছ।

অনেকদিন মানসী এসব চিন্তা করেছে। কতবার একই প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছে। সত্যি সত্যিই কী ঘটেছিল? কেন মারা গেল সজল? রঙ্গরাজনের চিঠিতে কোথাও সজল আর মহামায়ার নাম ছিল না। কিন্তু ঘটনার এত মিল কী করে সম্ভব? মানসী ইচ্ছে করেই মধুশ্রীকে আর ঐ চিঠির কথা বলেনি। মাঝে দেবজ্যোতিরা নিউজার্সিতে এসেছিল। পিনাকী তখনও কোপেনহেগেন থেকে ফেরেনি। শেষ পর্যন্ত মধুশ্রীরা আর মানসীর সঙ্গে দেখা করার সময় পেল না।

সেপ্টেম্বরে লেবার-ডে-উইক এন্ডে নিউ জার্সিতে মেহেদী হাসানের কনসার্ট ছিল। এডিসনের "আকবর" রেস্টোরেন্টে ডিনারের পরে গজলের প্রোগ্রাম। পিনাকী ম্যনহ্যাটেনের "নগমা হাউস" থেকে দুটো টিকিট কিনে আনল। ওরা আগেও দু-তিনবার মেহেদী হাসানের গজল শুনতে গেছে। পিনাকী বলে এখন আর সে গলা নেই। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে দম কমে আসছে। তবু মানসীর ভীষণ ভাল লাগে। এতবার শোনা গান, তবু সামনে বসে শুনতে ইচ্ছে করে। এ বছর পাকিস্তানী কালাচারাল গ্রুপ "শমমা" মেহেদী হাসানের সঙ্গে ওঁর ছেলে কামরানকে এনেছে। ছেলেটা ভাল গাইছে। মানসীই সব খবর-টবর নিয়ে পিনাকীকে টিকিট কাটতে পাঠিয়েছিল।

"আকবরে" পৌঁছে ওরা ডাঃ গুহ ছাড়া একজন বাঙালিকেও দেখতে পেল না। এখানে গজলের প্রোগ্রামে বাঙালিরা তেমন আসে না। ডিনার শুদ্ধ টিকিটের দাম একটু বেশি করেছে বলে ভারতীয় ছাত্ররাও আসেনি। পাকিস্তানী ডাক্তারদের একটা বড় দল সামনের দিকে বসেছে। পিনাকীরা তার পেছনের সারিতে জায়গা পেল। কাছাকাছি ক'জন পরিচিত মুখ। মহারাজ আর মোহিনী কওল ওদের কাশ্মিরী বন্ধু-বান্ধবের নিয়ে এসেছে। মানসীকে দেখে শীলা শর্মা হাত নাড়ল। জিতেন্দ্র আর মেধা দেশপান্ডে পিনাকীর পাশে এসে বসল। ওদের সঙ্গে মাঝে মাঝে ক্ল্যাসিক্যাল প্রোগ্রামে দেখা হয়।

গান শুরু হবার পর প্রায় সব চেয়ারই ভরে গেল। পাকিস্তানী ডাক্তারদের লাইনে দু-চারটে জায়গা তখনও খালি। বোধহয় আর্টিস্টদের চেনা-শোনাদের জন্যে রাখা আছে। মানসী ধারের দিকে সিট নিয়ে বসেছে।

মেহেদী হাসান পাকিস্তানী সিনেমার গীত দিয়ে শুরু করলেন—"পেয়ার ভরে দো শর্মিলি ন্যায়ন....."

মানসীর প্রিয় গান। পুরনো দিনের বাংলা গানের মতো সুর। শুনলেই মনে হয় জগন্ময় মিত্রের কোনও হারিয়ে যাওয়া গান। মানসী মন দিয়ে শুনছিল। ওর পাশ দিয়ে দু'জন স্টেজের সামনে চলে গেল। মেহেদী হাসানকে আদাব করে একেবারে সামনের দিকে গিয়ে বসল। লোকটি একবার পেছনে ফিরে চেনাশোনা কয়েকজনকে দেখে কপালে হাত ছোঁয়াল। তামাটে ফর্সা গায়ের রং। ঘন ভুরুর নীচে গভীর কালো চোখ। পার্ম করা ঢেউ খেলান চুল কাঁধ ছুঁয়ে আছে। লোকটি যতবার মুখ ফেরাল, মানসীর মনে হল তার দৃষ্টি, হাসি আর গঠিত চিবুকের রেখায় প্রচ্ছন্ন অহংকার ধরা পড়ছে।

পিনাকী নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল—" মেহেদী হাসানের ছেলে ?"

—" না, না। ছেলেকে তো প্রথমেই ইনট্রোডিউস করাল। ঐ যে, সিনথেসাইজার বাজাচ্ছে।"

গানের ফাঁকে ফাঁকে মেহেদী হাসান কথা বলছেন। ঐ লোকটির পরিচয় দিয়ে বললেন—মশুর কলাকার আসিফ আলী। ইন্টারমিসনের পরে ওঁর সঙ্গে তবলা বাজাবে।

তখনও মানসী নামটা খেয়াল করেনি। লোকটির পাশাপাশি মেয়েটি যখন উঠে দাঁড়াল, পেছনে ঘুরে তাকাল, তার ওড়না জড়ানো মুখ দেখে মানসী কয়েক মুহূর্ত কিছু ভাবতে চেষ্টা করল। এই মুখ তার পরিচিত। কোথায় যেন দেখেছিল একবার। কিন্তু মনে পড়েছিল না। কালো শিফনের ওপর জরির জারদোসী কাজ করা ল্যাহঙ্গা চোলী পরে এসেছে। সর্বাঙ্গে ঝলমলে গয়না। লম্বা বিনুনী ঘিরে সলমা, চুমকি বসানো পাতলা কালো ওড়না। ঠিক এই সাজে নয়, তবু

এরকমই মোহময়ী ভঙ্গিতে সে দাঁড়িয়েছিল। কোথায়? কোথায় দেখেছে একে মানসী?

মেহেদী হাসান গাইছেন। মানসীর গানে মন নেই। বারবার ভাবছে ওকে এত দেখা দেখা মনে হচ্ছে কেন? কোথাও কি নাচতে দেখেছিল? চেহারাটা সেরকমই লাগছে।

পিনাকীকে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল—"মেয়েটাকে কোথায় দেখেছি বল তো? এত ফেমিলিয়র লাগছে!"

—"দেখে থাকবে কোথাও। কত জায়গায় যাও।"

—"নামটা খেয়াল করেছিলে? ওর নামটাও কি বলেছিল?"

—"শুনিনি। আর কথা বোলো না। গান শোনো।"

মানসী থেমে গেল। গান শুনতে শুনতে কয়েকবার মেয়েটিকে লক্ষ করল। কিন্তু সে আর পেছনে ফিরছে না। ইন্টারমিশনে চা খেতে খেতে ডাঃ আজীজের সঙ্গে পিনাকীর কথা হচ্ছিল। মানসী ওঁর স্ত্রী নাজমাকে জিজ্ঞেস করল—"ঐ যে কালো ল্যাহঙ্গা পরা মহিলা বসে আছেন, কে বলুন তো? কোনও প্রোগ্রামে কি ওঁকে আগে দেখেছি?"

—"দেখেছেন হয়তো। আসিফ আলীর সঙ্গে আসেন। নিজেও ভাল নাচেন। ইনফ্যাক্ট, এ জন্যেই ওঁদের বিয়েটা হয়েছে শুনেছি।" নাজমা হাসলেন।

হঠাৎ মানসীর মনে পড়ল কোথায় ও মেয়েটির ছবি দেখেছিল। মালা সিনহার মতো মুখ। কপালে টিকলি । নাকে নথ। দুরন্ত চক্করের মুহূর্তে পেশোয়াজ , ওড়না, জরির বিনুনী থমকে আছে।

মানসী নাজমাকে জিজ্ঞেস করল—ওঁর নামটা জানেন?"

—"মাহ্‌জবীন্।"

মানসীর একবার ইচ্ছে হল উঠে যায়। কালো ওড়নার আবরণ সরিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করে—তুমিই মহামায়া? আমরা সজলের বন্ধু ছিলাম। ওর পিনাকীদা আর মানসী বউদি...।

মানসী মাহ্‌জবীনের কাছে উঠে গেল না। এত বছর পরে সজলের বউকে প্রথম দেখল। অথচ বলার মতো সত্যিই কোনও কথা খুঁজে পেল না। সজল নেই। সেই সম্পর্কই শেষ হয়ে গেছে। শুধু কৌতূহলের জন্যে পরিচয় দিয়ে কী হবে? সজলের কথা ছাড়া মাহ্‌জীবনের কাছে আর কী-ই বা তাদের বলার আছে? পিনাকী হয়তো সজলের ছেলের খবর জানতে চাইত। মানসীর কিছুই জানার তাগিদ নেই। মহামায়া সম্পর্কেও সে যেন আগের মতো বিরূপ ভাব অনুভব করছিল না। মানসী ভাবছিল—মানুষ মানুষের সম্পর্কে কতটুকু জানে? শুধু অনুমান আর শোনা কথার ওপর নির্ভর করে আমরা ইচ্ছে মতো ধারণা গড়ে নিই। মহামায়ার নিজের কথা তো শোনার সুযোগই হয়নি, কে জানে? হয়তো কোনওদিনই ও সজলের বোধের জগতে পৌঁছতে পারেনি। সজলের ভাবনা-চিন্তার নাগাল পাওয়া সহজ ছিল না। এ মুহূর্তে কত তুচ্ছ কারণে মাতামাতি করছে। সেখানেও কোনও ভারসাম্য নেই। পর মুহূর্তে পার্থিব ভাবনার উর্ধ্বে এক অন্য মানুষ। পিনাকী যতই পছন্দ করুক, মানসী তো কত সময় বিরক্ত হত। তবু ওরা ছিল বাইরের লোক। সজলের সঙ্গে সামান্যই সময় কাটিয়েছে। মহামায়ার কী অভিজ্ঞতা হয়েছিল, কেন যে সে সজলকে ছেড়ে যেতে চেয়েছিল, আজ এতদিন পরে মানসী আর তার কারণ খোঁজার চেষ্টা করল না। সজল কিভাবে মারা গেছে সে তো সত্যিই জানে না।

গানের শেষ পর্বে আসিফ আলী মেহেদী হাসানের সঙ্গে বাজাতে বসেছেন। রাত বেশি হয়ে যাওয়ার কিছু লোক চলে গেছে। সামনের দিকে অনেক জায়গা খালি। কয়েকজন এগিয়ে গিয়ে

বসল। নাজমা হাত তুলে ডাকলেন। পিনাকী উঠতে চাইল না। মানসী সামনে চলে গেল। দুটো চেয়ার পরেই মাহ্‌জবীন। স্বচ্ছ ওড়নার আড়ালে তার সুন্দর মুখ দেখা যাচ্ছে। কালো চুলের অন্ধকারে, সল্‌মা, চুমকির ছোট ছোট চাঁদ, তারা। হাসি নেই, উচ্ছ্বাস নেই। মেহেদির কারুকার্যে রঙিন দুই হাত কোলের ওপর রেখে শান্তভাবে বসে আছে।

মেহেদী হাসান গাইছেন— মুঝে তুম্‌ নজরসে
গিরা তো রহে হো।
মুঝে তুম কভী ভী ভুলানা সকো গে
ন জানে মুঝে কিউ ইয়াকিন হো চলা হ্যায়
মেরে পেয়ার কো তুম্‌ মিটা না সকো গে
মুঝে তুম নজর সে.....

অনেক পুরনো গীত। মানসী চোখ বন্ধ করে শুনছিল। চুড়ির আওয়াজে তাকিয়ে দেখল মেহেদির কারুকার্য আকা হাত কালো ওড়নার প্রান্ত ধরে আছে। সন্তর্পণে চোখের জল মুছে নিচ্ছে। মানসী আসিফকে দেখল। সঙ্গতের ঝোঁকেও সে মাহ্‌জবীনকে লক্ষ করেছিল। মাহ্‌জবীন ওডনায় মুখ ঢাকল। সমস্ত ঘর জুড়ে সুরের মূর্চ্ছনা। প্রত্যাখ্যানের বেদনার এই গান যেন মাহ্‌জবীনের নিঃশব্দ কান্নার মধ্যে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। মেহেদী হাসানের পরে তাঁর ছেলে কামরান গাইছে—

কভী নাম বাতোঁ মে আয়া যো মেরা
তো বে চ্যায়ন হো কে দিল্‌ থাম্‌ লো গে
নিগাহোঁমে ছায়ী হ্যায় গমকা অন্ধেরা
কিসিনে যো পুছা সবব্‌ আঁসুওঁ কা
বাতনা ভী চাহো, বতা না সকো গে
মুঝে তুম্‌ নজরসে......

কাচের চুড়ির শব্দ উঠল। অশ্রুসজল এক বিষণ্ণ সুন্দর মুখ। কালো চুলের অন্ধকারে, সলমা, চুমকির ছোট ছোট চাঁদ, তারা। যেন রাতের আকাশ দেখে মুগ্ধ হয়ে যেত, এমন একজনকে সে মনে রেখেছে। মানসী খেয়াল করেনি পিনাকী কখন পাশে এসে বসেছে। মানসী জানে না পিনাকী কখন আজীজের কাছে আসিফ আর মাহ্‌জবীনের পরিচয় জেনেছে। মানসীর মতো পিনাকীও ভাবছিল—এই মেয়ে সজলকে এত কষ্ট দিয়েছিল? শুধু আসিফের জন্যে তাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছিল?

মানসীর মতো তারও যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না। পিনাকী মানসীকে বলল—"ওই তো সজলের বউ। আসিফকে বিয়ে করেছে। এক মিনিট কথা বলবে? ছেলেটার খবর নিতাম"।

মানসী মাথা নাড়ল। বিশ্বাস অবিশ্বাসের সীমারেখায় দাঁড়িয়ে অপরিচয়ের দূরত্ব পার হতে চাইল না।